অশোক জাতক

অশোক জাতক

আলপনা ঘোষ

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৭১

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র, ৫/১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : সুনীল গুহ

ছেপেছেন : অশোককুমার ঘোষ, নিউ শশী প্রেস, ১৬, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৬

হিতেন-কে

এক

তিনপাটি ব্ল্যাক শ্যু

১। উতার বাঁ পায়ে একপাটি জুতো—ফিতে ছাড়া।

২। অশ্‌কার দুপায়ে দুমাপের দুপাটি জুতো—ফিতে সমেত।

৩। পলার হাতে একটা সরু লাঠি। সে ওদের দুজনের সামনে—হাঁটু গেড়ে।

সময় সকাল দশটা। ওদের ঘিরে আরো কয়েকজন। ঠিকঠাক গুনলে এগারজন।

খানিক আগে, বোজকার মত রোডের ধারের এই দোতলা বাড়িটার পাশে আর পেছনে ঘোরাঘুরি করতে করতে ওরা এই তিনপাটি জুতো পেয়ে যায়। রোজই ওরা এই বাড়িটার আশেপাশে ঘোরে। ওদের পাড়ার আরো অন্য ছেলেমেয়েরাও আরো অন্যসব বাড়ির আশেপাশে ঘোরে, বিশেষ করে যেসব বাড়ির ঠিক লাগোয়া খানিকটা অন্যের জমি আছে। নিজের বাড়ির আবর্জনা বাবুঘরের লোকে অন্যের ফাঁকা জায়গায় ফেলে এটা ওরা জানে। পাঁচ-ছয় থেকে দশ-বার জনের এক-একটা দলে ভাগ হয়ে ওরা সকালবেলায় বেরিয়ে পড়ে। এক দলের কেউ অন্যের জায়গায় পারতপক্ষে ঢোকে না।

তেমনি এই দলটা।

রোজই ওরা কিছু-না-কিছু পায়—খালি শিশি, পলিথিনের ছেঁড়া ব্যাগ, ভাঙা পুতুল, চিকচিকি, কৌটোর ঢাকা, দেশলাইয়ের বাক্স, সিগারেটের প্যাকেট, চকলেটের মোড়ক, রাংতা, ছেঁড়া ক্যালেন্ডার মায় প্যাকেট-করা ব্যবহৃত স্যানিটারি ন্যাপকিনও। এখন ওরা সতর্ক হয়ে গেছে। প্যাকেট পেলে আগে কাঠি নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে। এই ব্যবহৃত তুলো-গজও হয়ত বিক্রি হয়, কাজে লাগে, কিন্তু বাউরি ত, তারও তার মত করে একটা জাত আছে। ওঠা-বসা আছে। বিয়া-শাদি, জন্ম-মৃত্যু আছে।

তিনপাটি জুতোর দুপাটি পায় অশ্‌কা, একপাটি উতা। চতুর্থ পাটি জুতোটা ওরা অনেক খুঁজেও পেল না। এই জায়গাটা চার ফ্ল্যাটের রান্নাঘর আর বাথরুমের জলে কাদা হয়ে রয়েছে। এই সাত কাঠা জমিটারও মালিক এই দোতলা বাড়ির বাড়িওআলা গগন মাজি। কাদা আর পাঁকে তারই দুটো মোষ গা ডুবিয়ে থাকে সারা দুপুর।

দুপায়ে দুপাটি বেঢপ জুতো পরে অশ্‌কা একটু বুক চিতিয়ে দাঁড়ায় ওর বাবা মৃত বনমালীর একটি বিখ্যাত ভঙ্গিমায়। অশ্‌কা নিজেও জানে না কতখানি ওর এই স্মৃতি উজ্জীবিত ভঙ্গি।

অশ্‌কার ঠিক পেছনে লক্ষ্মী। ওর পরনে একটি হলদে আধময়লা টেরিকটের

ফ্রক—পিঠের বোতাম না থাকাতে তার শিরদাঁড়া উঁচু হওয়া পিঠখানা সম্পূর্ণ খোলা। লক্ষ্মীর হাতে চার্লির একটি খালি শিশি। মাঝে মাঝে নাকের কাছে এনে সে এক-একটা এমনই লম্বা শ্বাস নিচ্ছিল যে তার ফোলা পেট আরো ফুলে উঠছিল গল্পের ব্যাঙের মতই।

—'আহ্, সেনের কী বাস বেরাইচেঁ মাইরি!' সাত বছরের লক্ষ্মী উদ্ভাসিত মুখে বলে।

টিলি, বছর দশেক বয়সের পক্ষে বেশ ডাঁটো; বলে, 'অশ্‌কারে, তর ডান পায়ের জুতাটো ফাটা ব্যটে!'

ঘাড় দুলিয়ে বাক্যটা শেষ করে ও। সেই দোলানিতে ওর উঁচু করে গোড়ায় গোলাপি ফিতে বাঁধা লালচে রঙের বিঘৎখানেক পনিটেল দোলে। কানে ঝোলা দুল চিকচিকায়, দুলের নিচের দিকে গোলাপি পাথরও দুলে ওঠে। ও বাবুঘরে কাজে যায় প্রায় বছর দুয়েক—ফিতে ও দুল নিজের শ্রমের পয়সায় কেঁদুয়াড়ি মেলা থেকে কেনে পুজোর সময়।

টিলির কথায় অশ্‌কা, পায়ের দিকেই তাকিয়েছিল এতক্ষণ, এবারে ডানপাটি তোলে। একটু ঝুঁকে দেখে নেয় জুতোর তলার দিক, তারপর বাঁ পায়ে দু-তিনবার লাফিয়ে পলার সামনে ডানপাটি বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। পলা সেরকম উবু হয়ে বসেই লাঠির সরু দিকটা জুতোর ফাটা অংশে ঢুকিয়ে গম্ভীর মুখে বলে, 'ফাটা লয়, সিলাই খুল্যে গিইচে।' টিলি দমে না। হি-হি হাসিতে নুয়ে পড়ে সামনের দিকে। হিল্লোলিত ডান বাহুটি বাতাসে এধার-ওধার দুলিয়ে দেয়। পাঁচ আঙুল ছড়ানো মুদ্রায় করতল নাচিয়ে বলে, 'ইম্‌মা! বাঁ পায়ের জুতাটো কিমন পায়ে বইসচ্যে, ইদিকে ডান পায়েরটো ঢলঢলাইচেঁ্য!'

টিলির কথায় আর চোখমুখের ভঙ্গিতে সবাই হেসে ওঠে, অশ্‌কা ছাড়া । ডান পায়ের জুতোটা খুলে অশ্‌কা পলার দিকে ঠেলে দিয়ে বলে, 'লে তুই পর।' উতা বলে, 'আমাকে দে। আমার ত জুতা আছে এট্টা।' সবার নীরব সমর্থনে পা দিয়ে জুতোটা উতার দিকে ঠেলে দেয় অশ্‌কা।

উতার পায়ের পাতাটা এত চ্যাটাল যে পা ঢুকলেও আঙুলগুলো চেপে যায়। বাঁ পায়েও ব্যথা লাগছিল ওর। দুপায়ে জুতো পরে, সে তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আটটা পদক্ষেপ হেঁটে যায় একটু খুঁড়িয়ে। তারপর ধুলোর মধ্যে ধপ করে বসে পড়ে। একটা একটা করে দুপাটি জুতোই খুলে ফেলে ও। পা দুখানা ছড়িয়ে দেয় যেন ত্রিভুজের দুই বাহু। হাত দুটো পিছনে মাটিতে রাখে শরীরের ভার সামলাতে—শরীরও হেলে যায় একটু পেছনে।

'তুই-ই পর পলা, আমার পা দুট্যায় বাইজচে।' উতা বলে। 'হল্যেই হল—যার পায়ে হবেক উয়ারই জুতা।' পেছন থেকে শঙ্করা বলে। শঙ্করার বয়স বার-তের। বাসন মেজে মেজে দুহাতের নখই ক্ষয়ে গেছে। শঙ্করা চায়ের দোকানে কাজ করত তিন-চারদিন আগেও। এখন গরু চরায়। একটা পেছনে তাপ্পি দেওয়া কালো হাফপ্যান্ট আর বুকের কাছে 'লাভ মী' ছাপমারা লাল গোলগলা সিন্থেটিক গেঞ্জি পরনে। গেঞ্জিটা হাঁটুর একটু

ওপর পর্যন্ত নেমে আসাতে প্যান্টের কোমরে দড়িবাঁধা ব্যাপারটা ঢাকা থাকে। কথাটা বলে ও নিজের ধুলোমাখা পায়ের পাতা দুটি দেখে। পা দুটো ওর এত ফেটে গেছে যে ওপর থেকেই দেখা যায় ফাটা গোড়ালি আর হাজায় শাদা হওয়া আঙুল। ওর সংগ্রহে দুটি প্যাকেট—একটি ঢাকনাসমেত গোল, লম্বা, শক্ত ধূপকাঠির প্যাকেট, অন্যটি হলদে রঙের কডলিভার অয়েল ক্যাপসুলের। ধূপকাঠির প্যাকেটের ভিতর একটা আস্ত কাঠি আছে ও চকিতে দেখে নিয়েছে। অশ্‌কা ইতিমধ্যে বাঁ পায়ের জুতোটা খুলে মাঝখানে রাখে।

তিনপাটি ব্ল্যাক শ্যু, তিন সাইজের, এগারজন ছেলেমেয়ের মাঝখানে থাকে। জুতোগুলোকে ফেলে ওরা যেতে পারছে না।

শঙ্করা এগিয়ে ওর পা দুখানি একে একে জুতোয় ঢোকায়। সব জুতোই ওর পায়ে বড় হয়। তবু ও দুপায়ে জুতো পরে হাঁটে। দশজোড়া চোখের সামনে দিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে হাঁটে। হাঁটার সময় গোড়ালি দুটো উঠে উঠে যায় বলে সাবধানে পা ফেলে। সাবধানে পা তোলে। নিচু হয়ে ফিতে বাঁধে। ফিতে বাঁধতে বাঁধতেই তার সিদ্ধান্তটি সঙ্গীদের জানিয়ে দেয়—'ইয়াতেই হব্যাক। দুটি কানি গুঁজ্যা দিব।' কথাটা বলে উঠে দাঁড়ায়। কারো দিকে না তাকিয়ে একটু চেঁচিয়ে বলে, 'আমি লিলাম।' এমন আকস্মিক ঘোষণায় বাকিরা চুপ। টিলি খপ করে তৃতীয় জুতোটি বাঁ হাতে তোলে। তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মাথা দিয়ে আলতো করে জুতোর একপাশটা ধরে, তারপর ছুঁড়ে দেয় শঙ্করার গায়ে। চেঁচিয়ে বলে, 'ইটও লে, তর আর এট্টা পা গজাবেক!'

দুপায়ে দুমাপের ঢলঢলে জুতো, শঙ্করা বোঝে দৌড়ে সে টিলির সাথে পারবে না। ফলে জুতোর বাড়ি খেয়েও সে পালটা মারতে ছোটে না। সেও চেঁচিয়ে বলে, 'শালী, পরের জুতায় ফুটানি দেখাইচিস?'

টিলি সহজে রাগে না। ওর সবটাতেই হাসি। এমন হাসি যে মনে হয় হাসির টুকরোগুলো দুহাতের মুঠোয় ধরা যাবে। তেমনি চূর্ণ হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলে, 'দ্যাখরে, উতা, অশ্‌কা, সুবইলা, হারামির কতা শুন। আমার কুন বুনটাকে বিয়া কল্লি যে তর শালী হলুম? অ্যাঁ?'

ওরা এবার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মাঠে যাবে। ছেলেরা কেউ বাগালি করবে। কেউ কেউ মেয়েদের সঙ্গে ঝুড়ি নিয়ে গোবর আর কাঠ কুড়োবে দুপুর পর্যন্ত। টিলি পড়ে থাকা ঝুড়িটা কাঁকালে নিয়ে সবাইকে ডাকে, 'আয়রে।'

ওর ডাক যেন ছানাপোনা নিয়ে চলা মা-হাঁসের ডাক। দশ বছরের টিলি কাঁকালে ঝুড়ি, গলায় লাল পুঁতির মালা, হাঁটুর নিচ পর্যন্ত লাল রঙের একখানা আস্ত ফ্রক, পায়ে চাঁদির মল বাজিয়ে সাথীদের ডেকে নিয়ে চলে—

'আয়রে, আয়রে।'

রাস্তা পেরিয়ে দলটা মাঠে নামে।

দুই
বনমালীর কিষ্টো বেটা

একটু দলছুট হয়ে অশ্‌কা দাঁড়িয়েছিল একটা মহুয়াগাছের নিচে। গাছটার গায়ে একটা অশ্বত্থগাছ—দুটো গাছই এমন জড়াজড়ি করে উঠেছে যে এই দুপুরেও ঘন ছায়া। রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা নিচে নিচু নিচু ঝোপ দিয়ে তিনদিক ঘেরা জায়গাটা ওর ভারি ভাল লাগে। আবার ধানখেতগুলোর চাইতে একটু উঁচু হওয়াতে গাছতলায় দাঁড়িয়ে অনেকদূর দেখা যায়, দিগন্তরেখা পর্যন্ত।

বাপের কাঁধে চড়ে এই মহুলতলায় অশ্‌কা আগেও এসেছে। মাঝে মাঝে ছেলেকে নিয়ে বনমালী এই গাছতলায় এসে গামছা বিছিয়ে ঘুমত। এমনই ঘুম ঘুমত যেন অনন্তশয্যায় শুয়েছে সে।

অশ্‌কার হাতে একটা লাঠি। বাপ মরেছে বছরও পেরয় নি; ও গরু চরায়। বাগালদিগের ওই ধব গরু আর এট্রা এঁড়ে একটু দূরে ঘাস খায়। নতুন চুল গজানো মাথাটা হালকা লাগে অশ্‌কার। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল ছিল ওর। বনমালী কাটতে দিত না। বলত, 'কিষ্টো ঠাকুরের পারা মুখখান গড়ন আমার অশ্‌কার। ঠাকুরের পারা কেশ হবেক উয়ার।'

জুতোজোড়া না হওয়াতে অশ্‌কার বাবার কথা মনে পড়ে। 'বাবু কাল জুতা কিন্যে দিবে।' বিড়বিড় করে এই পাঁচটি শব্দ ও ভাসিয়ে দেয় বাতাসে। বলবার সময় দুহাতের পাতা গোল করে ওর মায়া মুখখানি একটু তুলে ধরে আকাশের দিকে, যেন বাপের বুকের কাছে দাঁড়িয়ে, এমন সমর্পণে। সে প্রার্থনা তার বাপের কাছে পৌঁছয় কিনা তা ও জানে না। বাপের শরীরটা ত সে দেখতে পায় না। কিন্তু সেই শরীরের ওপরে ওর নিশ্চিন্ত নির্ভর যেন এখনো যায় নি। শরীর না থাকুক স্মৃতি আছে। শরীরের স্মৃতি। সেই স্মরণে ওর বাপ আকাশ জুড়ে থাকে।

বনমালীর কিষ্টো বেটা রাখালরাজা ধেনু চরায়, বনমালী দেখতে পায় না। বনমালীর কিষ্টো বেটা রাখালরাজা বাপের কাছে জুতো চায়, বনমালী শুনতে পায় না। বনমালীর কিষ্টো বেটা রাখালরাজা মহুলতলায় বসে কী ভাবে, আকাশপানে কী ভালে বনমালী জানতেও পারে না।

তিন
নামকরণ

অশ্‌কার ভাল নাম অশোককুমার বাউরি। বাউরিপাড়ায় এহেন নাম দুর্লভ নয়। চিত্তরঞ্জন-আসানসোল যাবার মেন রোডের ধারে যদি বাউরিপাড়া থাকে আর সেই পাড়ার ইধারে-উধারে যদি বাবুদের দালানকোঠা থাকে, গাঁয়ে ঢুকতে গেলে যদি

বাউরিদের যেমন-তেমন মাটি কি বেড়ার দেয়ালের পাশ দিয়ে যেতে হয়, তাহলে ত বাবুদের পারা নামও বাউরিদের হতে পারে। বাবুদের পারা নামটুকুই ত—বাবুদের 'জামাপ্যান', 'জুতামুজা', 'লিখাপড়ি' এইসব বাহুল্যবর্জিত শুধুই নাম। আর যাই হোক সভ্যদেশের মানবসন্তানের মত বেড়ে ওঠে না এরা। অযত্ন, গালমন্দ, ঠেঙানি আর এর পরেও যতটুকু ভালবাসা, মায়া-মমতা বেঁচে থাকে শেষ পর্যন্ত এমন জীবনযাপনে সেটুকু শুষেই এরা বড় হয়। শরীরে-স্বাস্থ্যে বড় বেশিরভাগই হয় না। যারা হয় তারা ততটুকু বড় হতেই যেন ক্ষয়ে যায়। নিঃশেষে ক্ষয়ে যায়। বাউরিপাড়ায় দাদু-দিদিমা কি ঠাকুরদা-ঠাকুমার সংখ্যা কম। যারা আছে তারাও এমন কিছু বয়স্ক নয়। এমন খাঁ-খাঁ শৈশববিহীন বাল্যকাল কাটিয়ে কৈশোরেই যেন ঝড়ের মত যৌবন আসে এদের। আর সে যৌবন ত বল্গাবিহীন অপচয়ের কাল—ফলে প্রৌঢ়ত্বেই বার্ধক্যের করাঘাত শোনা যায়। বাউরির জীবনযৌবন বড় এ্যাল্প হে, বড়ই এ্যাল্প ব্যটে!

তা, বাবুদিগের পারা নাম দিলেই ত হয় না, নামগুলোকে ভদ্রলোকের মত যত্ন-আত্তি ত করা চাই। কিন্তু যে নাম ইশকুলের খাতায় ওঠে না, কিংবা ক্বচিৎ উঠলেও দুই, তিন কি বড়জোর চার বছর—সে নাম ত এদেরই জিভ, ঠোঁট, তালু, দাঁত আর মূর্ধার অশিক্ষিত সংযোগে আর ভদ্রলোকের পরিশীলিত তাচ্ছিল্যে বদলে যায়, বিবর্তিত হয়। সে নিয়ম কিংবা বেনিয়মের ব্যাকরণ কোনো পাঠ্যপুস্তকে থাকে না।

'অশোককুমার'ও এমনিতর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমে 'অশ্‌কা'য় থিতু হয়।

অশ্‌কা যেদিন জন্মায়, ঘোরা রজনী সেদিন। বাপ বনমালী টিপিটিপি বৃষ্টির মধ্যে ওর ঘরের ঠিক পাশেই ভাদুমণির মদের ঠেকে সেঁধিয়েছিল। ভাদু ওর সম্পর্কে বউদি, দিনে সে দুবাড়ি বাসন মাজে ঘরদোর ঝাড়মোছ করে। রাত্তিরে সে তার দুই ছেলেব বউ আর মেয়ের সাহায্যে মদের ঠেকটি চালায়।

এমনিতে উঠনেই খাওয়া হয়। সেখানে তিন-চারখানা বেঞ্চি আর ছোট খাটিয়া গোটাদুয়েক পাতাই থাকে, সন্ধে থেকেই মুনিষ-মজুরদের ভিড়। একটু রাত হলে গাঁয়ের দু-চারজন বাবুলোকও এদিক-ওদিক তাকিয়ে সাঁৎ করে ঢুকে পড়ে। ঢুকে পড়াটাই ত লজ্জার ব্যাপার, কেননা কিছু পরে প্রচুর কালিপড়া লণ্ঠনের আলোয় মানুষগুলোকে আলাদা করে চেনা যায় না—যেন মুখহীন শরীরী অবয়ব কতকগুলো। এই ঠেকটার বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে মদ আছে, মাতলামিও আছে 'কিন্তুক চিচ্যামিচ্যি লাই।'

ঠেকের মধ্যমণি ভাদু বেশ দাপিয়ে বলে কথাটা। বলে, 'হুজ্জোত কইরলে বেবসা চইলবেক? মামাদিগ্‌কে সামহালবে তুমরা?' মামা মানে পুলিশ। তা থানা ছোট হলেও সেপাই-দারোগার দাপট ছোট নয়, বরং কিছু বেশি। দারোগাবাবুটি একমাত্রিক মানুষ—ছ-ফুটের মত দীর্ঘ—পুলিশি ইউনিফর্ম তাঁর গায়ে পতাকার মত লটপটায়। হেড কনেস্টবলটির উরুর মাপ তাঁর ফোলানো ছাতির মাপ। হেড কনেস্টবল রামসহায় বাউরিপাড়ায় মাঝে মাঝে পায়ের ধুলো দিলেও দারোগা চট করে আসেন না। তিনি এখানে আসার মাস তিনেক পরে ওয়াগান থেকে কিছু কাপড় লুট হয়। রামসহায়ের সঙ্গে

সেই প্রথম তিনি বাউরিপাড়ায় আসেন। তখনি তিনি টের পেয়েছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতা বেশি নয়। শেষরাতে খবর পান দু-গাঁটরি মাল হাতে হাতে গ্রামে বাউরিদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে। তিনজন সেপাই, পাঁচটা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ, চারটে লাঠি, নিজের ব্যাটন, রামসহায়ের রাইফেল আর নিজের সার্ভিস রিভলভারসমেত তিনি বাউরিপাড়ায় যখন পৌঁছলেন তখন আকাশে শেষরাতের ভাঙা চাঁদ, অল্প মেঘ, আর বৈশাখের হাওয়া। খাটিয়া পেতে অনেকেই বাড়ির সামনে শুয়ে। নতুন বলেই হয়ত দারোগাবাবু একটু দোনামনা করছিলেন শেষরাতের ঘুম ভাঙাতে। রামসহায় প্রথমেই যার মুখে আলো ফেলল সে একটি ভরভরন্ত যুবতী—ঘুমের মধ্যেও যে তার শিশুকে স্তন্যপান করাচ্ছিল। আলো পড়তেই সে একলাফে উঠে পড়ে এবং আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে এমন চিৎকাব দেয় বাকি লোকগুলো ত উঠে পড়লই, দারোগার মনে হল কবরের মড়াও উঠে পড়বে। সে অভিজ্ঞতা যখন হচ্ছিল তখন দারোগা বসন্ত রায় টের পান নি। কিন্তু পরে বুঝেছিলেন এই গোলমালের মধ্যে কাপড়গুলোর অন্য ব্যবস্থা হয়ে গেল। রামসহায় অবশ্য খানপনের কাপড় উদ্ধার করেছিল শেষ পর্যন্ত। সেই থেকে তিনি এদিকে বিশেষ আসেন না বরং রামসহায়ই অনেকটা সামলায়। বসন্ত দারোগা স্বাস্থ্যের অজুহাতে বদলির চেষ্টা করছেন এমন একটা কথা শোনা যাচ্ছে ইদানীং।

ঝুপঝুপ বৃষ্টির মধ্যে উঠন ফাঁকা। খদ্দের কমতি নেই, ভাদুদের বারান্দা আর ঘরে ঘেঁষাঘেঁষি করে খাওয়া চলছে। ভাদু একথালা পেঁয়াজি, আলুর চপ আর পাঁঠার নাড়িভুঁড়ির ঝাল নামিয়ে দরজার আড়ালে দাঁড়ায়। ঘোমটার নিচ থেকে মৃদু কণ্ঠে বলে, 'অ দ্যাওর, ঘরকে যাও—তুমার পরিবারের বেটা হইচ্যে।'

দরজার গোড়ায় বসেছিল বনমালী। তখনো তার নেশা জমে নি, সবে একপাত্র পেটে পড়েছে। থালা থেকে একটা আলুর চপ তুলে নেয় ও। বলে, 'তালে ত দমে খাত্যে হবেক আজ। বেটা হইচ্যে আমার। দাও গঁ বউদিদি, আজ গেদ্যে খাব। হুঁঃ!'

বনমালীর বড়মেয়ে পারুল বা পারি তখন পাড়ার বউ-ঝিদের সাথে সিনেমা দেখে এসেছে। আঁতুড়ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সে দাইয়ের কোলে লালচে রঙের পুতুলের মত ভাই দেখে। তার চোখে তখনো ফিল্মের নায়কের মুখখানি, নিরুপম, ভাসে। পারি কপাটের দুধারে দুই হাত রেখে একটু ঝুঁকে ঘরের ভেতরে মাথা ঢোকায়। ঘাড় ঈষৎ হেলিয়ে মাকে বলে, 'কী সোন্দর ভাই হইচ্যে গঁ মা! ঠিক অশককুমারের পারা। উয়ার নাম হবেক অশককুমার।'

আট বছরের দিদির দেওয়া নামটি টিকে যাবার কথা নয়। কিন্তু ওই নামটি সুখীর পছন্দ। বনমালীও মাথা নেড়ে সমর্থন জানায়। বনমালী নিজে খুব একটা সিনেমা দেখে না। সুখীও তাই। যাত্রা হলে সন্ধেরাতে খেয়েদেয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে দেখতে যায়। যাত্রায় অশোককুমার নেই। তেমন কোনো নামও মনে রাখে না ওরা, তাই 'সোন্দর' আর 'অশককুমার'-এর একীকরণে এই নামটাই টেকে।

চার

অশোককুমারের পারিবারিক ইতিহাস

অশ্‌কার বাপ বনমালী মুক্তপুরুষ। নিয়ম করে কোনো কিছু করা তার ধাতে নেই। এমনিতে এটা তার জাতিগত বৈশিষ্ট্যই বলা চলে, নিয়মশৃঙ্খলা বা ধারাবাহিকতা শব্দদুটোই সম্পূর্ণ বেমানান বাউরিদের ক্ষেত্রে। সম্পূর্ণ আলগা দুটো শব্দ—যেন বাউরিজীবনের গায়ে লাগিয়ে দিলেও লাগে না। খসে যায়, খালি খালি খসে যায়। কাজে কাজেই বনমালী যে নিয়মশৃঙ্খলা বহির্ভূত মানুষ সে-কথাটাই যেন ঠিক। তবে যেটা বেঠিক তা হল বনমালী মাঝে-মধ্যে নিষ্ঠা নিয়ে কোনো কোনো কাজ বেশ একটানা করে যায় নিজের খুশিতে। নিজের খেয়ালে। কিন্তু তারপরই হঠাৎ বউয়ের সাথে ঝগড়া করে বাড়ি ছাড়ে। বাড়ি ছেড়ে বেশি দূর যায় না অবিশ্যি, আশেপাশেই থাকে। বিজয় পালের দোকানে ধারে খায় আর রাতে কারো বাড়ির বারান্দায় নয়ত ভাদুমণির দাওয়ায় চিৎ হয়ে পড়ে মোষের ঘুম ঘুমায়। ভাদু সম্পর্কে বউদি হলেও মদ খাওয়াতে যতটা জানে, তার চেয়ে বেশি জানে মদের পয়সা আদায় করতে। ফলে বনমালীর পরিবার সুখীর সঙ্গে প্রায়ই তার হয় তুমুল ঝগড়া, নয়ত কথা বন্ধ থাকে।

বনমালী আর সুখীর বিয়ের গল্পটা কোনো গল্পই নয়। বনমালীর বাপ রাখুবাউরি সুখীদের গাঁয়ে যায় মুনিষ খাটতে। ধান কাটতে কাটতে ভাবী পুত্রবধূটিকে ছেঁড়া ময়লা ফ্রক পরে গোবর কুড়াতে দেখে তার ভারি পছন্দ হয়।

'কাদের বিটি ব্যটে?' পাশের মুনিষকে শুধোয় ও। কাস্তের পোঁচে একগোছা ধানের শীষ গাছ থেকে আলগা করে বাঁ হাতের মুঠোয় উঁচু করে তুলে মুনিষটি উত্তর দেয়, 'উ ত সুকি—আমাদের গেরামের মায়ার বিটি ব্যটে। উয়াকে কলে লিয়েই রাঢ় হইচ্যে উয়ার মা। কেনে?'

'কিচ্ছু লয়।' ধানের রাশির মাঝখান দিয়ে আলে আলে হেঁটে যাওয়া বালিকার দিকে তাকিয়ে রাখু আনমনে বলে, 'বনাটার বিয়া দিব ভাবচি।'

'সি ত ভাল কতা। ঘরে তুমার পরিবার নাই। বেটাই বল, বিটিই বল ওই বনা। সুকিরও বাপ নাই, কিন্তুক বড় লক্ষ্মীমন্ত মেয়্যা—কয়লা কুড়ায়, ধান সিজতে জানে, আর বন্নটি ময়লা ব্যটে কিন্তুক উয়ার পারা চুল ই গেরামে নাই, বাবুঘরেও নাই।'

তা চুল বটে সুখীর। রূপকথার কেশবতী রাজকন্যার মতই হাঁটু পর্যন্ত বড় বড় ঢেউ খেলানো কুচকুচে কালো চুল ওর। বাউরিদের মধ্যে এ অতি আশ্চর্য ও দুর্লভ জিনিশ। তামাটে বা লালচে কাঁধ বরাবর বড়জোর কোমর-ছোঁয়া চুলের মাঝে সুখীর এই বিপুল কেশরাশি এক বিস্ময়।

বনমালী নিজে তার ভাবী কনেটিকে দেখে মুক্তাইচণ্ডীর মেলায়। বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে বলে তের বছরের সুখী সেদিন লাল ফুলতোলা শাড়ি জড়িয়ে হাঁটু গেড়ে দুহাত ভরে লাল-হলুদ কাচের চুড়ি পরছিল ওর দিদি আর বোনঝির সঙ্গে।

'সুকি, উই দ্যাক বুন তুর বর।' দিদি বলে।

একটু লজ্জা পেলেও সুখী ঘাড় ঘুরিয়ে চৌখুপী শার্ট আর কালো প্যান্ট পরা তার হবু বরটিকে দেখে। বনমালীও তাকিয়েছিল তার দিকে। ওর পাশে ওদেরই গ্রামের ভুবনবাউরি, সুখীর জামাইদাদার 'ফুল'। বনমালী অবাক চোখে বালিকার খোঁপাটি দেখছিল—সুখী মুখ ফেরালে খোঁপাটি চালচিত্রের মত মুখের দুপাশে আর মাথার ওপরে থাকে।

'কঠিন চুল ব্যটে মেয়্যাটোর।' বনমালী ভাবে।

কয়েক মাস বাদে আঠার বছরের বনমালীর বিয়ে হয় চোদ্দ বছরের সুখীর সাথে।

তা বাউরি-ঘরে এ আর এমন কি!

শ্বশুরবাড়ি এসে সুখী দেখল যেমন বাপ তেমনি বেটা। শ্বশুর গাঁয়ের চৌকিদার, কিন্তু তার হাঁপের টান। এ চাকরি তার থাকার কথা নয়, বনমালী মাঝে মাঝে বাপের হয়ে 'ডিব্‌টি' করে তাই রক্ষে। ঘর একটা আছে, সেটা বেটা আর বেটার বউকে ছেড়ে দিয়ে রাখুবাউরি বারান্দা ঘিরে শোবার জায়গা করে নিল।

গ্রামের ঘরগুলো এ ওর গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ানো। দুটো বাড়ির মধ্যে খুবই সামান্য জায়গা—চওড়া নালির মত। তবে প্রায় সব বাড়ির সামনেই যেমন তেমন একটু উঠন মত আছে, তার পরে কাঁচা নর্দমার ওপারে বাস রাস্তা চলে গেছে আসানসোলের দিকে। প্রথম কদিন সুখীর ঘরদোর নিকিয়ে পুঁছে সাফসুতরো করতেই লাগল। সুখীর মা মেয়ের সংসার গুছতে এসে মাসখানেক থেকে গেল।

বারান্দার একদিকে রাখুর শোওয়ার জায়গাটা মায়াকে দিতে গেলে সে ভারি লজ্জা পায়। বলে, 'না বিয়াই, আমি এই ভুঁয়েই বিছানা পাড়ি।'

কিন্তু মেয়ের বাড়িতে ত চিরকাল থাকা যায় না। তাই মাসখানেক বাদে সুখীব মা ছলছল চোখে বিদায় নেয়। এই একমাসেই সে বুঝে গেছে তার মেয়ের বর্তমান কি। বুঝে গেছে তার মেয়ের ভবিষ্যৎ কি। সেই লিপি পাঠ করতেই যেন সে এসেছিল। পঠন শেষে তার সব জানা হয়ে যায়। কিন্তু সেই জানাব ভার সে তার কচি মেয়ের ওপর চাপায় না। শুধু বলে যায়, 'তর মা রইল সুকি—কিন্তুক ই তর স্বামীর ঘর ব্যটে, তর শ্বশুরঘরও বটে। ই'ই তর লিজের ঘর তর আপুন ঘর। ই ঘর ছাড়িস নেরে মা।'

ষোল বছরে সুখী জননী। ষোল বছরের বাউরিজননী ত মোহিনী। শীতের দুপুরে মেয়ে কোলে চুল শুকোয় সুখী। শ্বশুর কাজে যায়। বনমালীও হাজরির কাজ করে। মাইন্দারি করে সরাকদের বাড়ি। একবছর কাটে। দুবছর কাটে।

রাখু এক শীতের সন্ধেয় বিছানায় পড়ল। একে তার হাঁপের টান, তায় কাশি। কাশি হলে পর টোটকা করে। হোমিপ্যাথি বড়ি নেয় মলয়ডাক্তারের ডিস্পেনসারি গিয়ে। মলয় হিন্দুস্থান কেবলস-এর চাকরি করতে করতে ডাকযোগে হোমিওপ্যাথ। এক টাকায় চার পুরিয়া ওষুধ। দর্শনী একটাকা। তেমন গরিব হলে শুধু ওষুধের দামটি। ডাবরমোড়ে জানলাবিহীন ছোট ঘরে রুগী আঁটে না। মলয়ের ছেলেপিলে নেই। এত লোকের অসুখ

সারায় কিন্তু বউয়ের পায়ের ফোলা কমাতে মাদ্রাজ যেতে হয়। মলয় ওষুধ দিয়ে বলে, 'রাখু, মদ খাওয়াটা ছাড়ো। ঝাল খাও নাকি খুব?' পেট টিপতে রাখু বলে, 'বাবা গঁ।'

'ঝাল খাবে না। টক খাবে না। পিপা খাত্যে হবেক, বুঝেছ? ঠাণ্ডা দুধ খাবে। সাতদিন পরে আবার এসো।'

সাতদিন পরে বনমালী এল মেয়ে কোলে নিয়ে। 'তোর বাবা কেমন আছে রে? পাঁঠাই দিবি আজ।'

'কাকে পাঠাই দিব ডাগতরবাবু—বাবা নাই!' মেয়ে কোলে বনমালী কেঁদে ওঠে।

মলয়ডাক্তার অবাক হন। এত তাড়াতাড়ি রাখু মরবে এটা তিনিও বোঝেন নি।

'কবে?'

'এজ্ঞে, গেল মঙগলবার রেতের বেলিতে। কাশতে কাশতে মুকি রকত উঠ্যা গেল!'

শ্বশুর মারা যাবার পর সুখী দেখল শ্বশুর কতখানি জুড়ে ছিল। বারান্দা কি উঠনে আড়াই বাই পাঁচ ফুট চারপায়াতে দিনের বেশির ভাগ সময় আর রাত দশটা বাজতে না বাজতে টর্চ নিয়ে, লাঠি নিয়ে কেডস পায়ে হাঁকে ডাকে রাখুর পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির শরীরটা যেন দ্বিগুণ হয়ে যেত। কী গলায় জোর ছিল ওর 'গেরামের এ মুড়ো থিক্যা হাঁকাইলে হুই ডাবুরমোড় তক্ শুন্যাত।' সুখী কেঁদে কেঁদে বলে। শ্বশুর গেল ত শ্বশুরের মাস মাইনের টাকাটাও গেল। মেয়ে কোলে সুখী বাবুঘরে কাজে ঢুকল।

বাউরিঘরে এ তেমন কিছু নয় যে কোলে বাচ্চা নিয়ে সুখী বাবুঘরে বাসন মাজে আর বনমালী সেই পয়সা মদ আর জুয়োয় উড়িয়ে দেয়। সুখী মায়ের কাছে মায়ের দেওয়া রুপোর বিছাহারটি, হাতের ছ-গাছা রুপোর চুড়ি, কানের সোনার ফুল আর সবুজ পাথর বসানো নাকছাবিটি রেখে আসে। ষোল কি সতের বছরেই সুখী এভাবেই স্বামীকে আর নিজেকে চিনে নেয়। কিংবা চিনে নিতে শুরু করে। স্বামীর ওপরে ত তার সর্বস্বনির্ভরতা নেই। তার জীবনযাপনে বনমালী যতখানি আবশ্যক তার জীবনধারণে ততখানি নয়। বনমালীকে ঘিরে তার কোনো স্বপ্নরচনা নেই। বনমালীকে নিয়ে তার শুধু দিনযাপন আছে।

কিন্তু বাবুঘরেও ত কাজ করার বিপদ আছে। সে বিপদ যে কোনদিক দিয়ে আসে সেটা ঠাহর করা যায় না। যেটা ঠাহর করা যায় তা হল বিপদের কারণ। যৌবন বড় সর্বনাশা। মেয়েমানুষের শরীরই তার শরীরের বিপদ ডেকে আনে। কদিন বনমালী কাজে যায় নি। কেন যায় নি সুখী জানে না, বনমালী নিজেও হয়ত জানে না। সুখী জিগ্যেস করলে বলে, 'অম্‌মোও নি।' তারপর একটু ভেবে বলে, 'মাথাটো ঘুরাইচ্যে।'

বনমালী কাজে যায় না ত সুখী যায়। চৌধুরীর বাড়ি মাঠের মধ্যে। ধানখেত ডাইনে বাঁয়ে। ধানখেত বাড়ির পিছন দিকেও অনেকখানি—প্রায় দিগন্ত পর্যন্ত। সুখী চৌধুরীকাকীমার কাছে শুনেছে এইসব জমিও নাকি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। বিক্রি হয়ে যাবে। রূপনারায়ণপুর নাকি মস্ত শহরবাজার হবে। আসামসুলের পারা। কিন্তু সুখী ভাবে তাহলে

এত ধানী জমিন কমে গেলে মানুষে খাবে কি? চৌধুরীকাকীমা বলে কি নাকি পাঞ্জাব, দিল্লি থেকে ট্রাকে করে চাল আসছে। আসবে। মানুষজনের বসত বাড়লে চালগমের আমদানিও নাকি বাড়বে। আরো রোড হবে, দোকান হবে। 'ধানের জমি রইবেক না তালে?' সুখী ব্যাকুল শুধোয়। 'রইবে কিছু, তবে এখন এক জমিতে ত তিনবার ফলন, তা বাদে ধর পতিত জমিও রইবে না।' চৌধুরীগিন্নি বলেন। সুখী আর তেমন কী জানে! ধানের জমি যদি না থাকে তাহলে মাঠের কাজ রইবেক না। ধান রোয়া রইবেক না। নিড়ান রইবেক না। ধান কাটা রইবেক না। ধান ঠেঙানো রইবেক না। ধান সিজান রইবেক না। কিন্তুক খিদাটি রইবেক। নিজের পেটের খিদা। সন্তানের পেটের খিদা। বনমালীর পেটের খিদা। ই সকল খিদার কী হবেক? বাবুদের পারা চাকরি ত নাই! কাকীমা বলে, 'কেন? এই ত তুই চাকরি করছিস। মাস পুরোলে মাইনে পাস। তখন আরো বাড়িতে কাজ করবি। আরো পয়সা পাবি। বছরকার শাড়ি-ব্লাউজ-শায়া পাবি। আমাদেরই কোনো মাইনে নেইরে।'

তা সুখী ত মনে করে সেও চাকরি করে। মাস গেলে কুড়ি টাকা! তা বাদে চা-রুটি। কাপড় কাচলে সেদিন একথালা ভাত। কাকীমার মনটো ভাল। ভালমন্দ রান্না করলে সুখীকে দেয়। পরবে বকশিশ, সিনিমা দেখার পয়সাও খুঁজলে মাঝে মধ্যে দেয়। কাকীমা নিজেও খুব সিনিমা দেখে।

কাজ সেরে সুখী রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়ায়। চৌধুরীগিন্নি বলেন, 'কীরে সুখী, কিছু বলবি?'

'উয়ার শরীল খারাপ, কাজে যাই নাই।' বলে একটু থেমে বলে, 'পাঁচ টাকা পয়সা খুঁইজ্‌ল।'

'এই ত তোদের মুশকিল—মাস না পুরোতেই টাকা। এখন ত নেই। দুপুরে নিস।'

দুপুরে বাসন মেজে ভেতরে, রান্নাঘরের সামনে উপুড় করে রাখে সুখী। ভেজানো দরজা ঠেলে ও ঢুকেছে। কাকীমা শুয়ে থাকে এসময়, বই পড়ে নয়ত কাগজ। এক-একদিন ঘুমিয়েও থাকে। ও আস্তে আস্তে পরদার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারে, 'কা-কী-ই-মা?' ডেকেই ও লজ্জা পায়—বিছানায় চৌধুরী নিজেই শুয়ে। ও পেছন ফিরে চলে যাচ্ছিল, চৌধুরী ডাকে, 'কে রে? সুখী?'

'হ। কাকীমা ঘরে নাই?'

'নারে, সিনেমায় গেছে। তুই টাকা চেয়েছিলি?'

নিঃশব্দে ঘাড় কাত করে ও। 'শোন, এদিকে আয়।' চৌধুরী হাতছানি দিয়ে ডাকে ওকে। ও তবু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। চৌধুরী ওঠে না। শুয়ে শুয়েই কাশে দু-তিনবার। গলা খাঁকারি দেয়। তার চিৎ হওয়া অবস্থাতেই যেন ঘুমের ঘোরে বা স্বপ্নজড়ানো একটু আবছা গলায় থেমে থেমে বলে, 'পাঁচ টাকা নয়, তোকে দশ টাকা দেব, তোর কাকীমা ত পারে না; আমার আবার বাতের ব্যথা। গা-হাত-পাগুলো বড় কনকনায়রে। তুই আমার হল গে মেয়ের মত, একটু হাত-পা টিপে দিতিস যদি। আয়

না, ঘরে আয়, নিয়ে যা টাকাটা।' বালিশের তলা থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে চৌধুরী। ডান হাতখানা উঁচু করে, আঙুলে ধরা সরকারি শীলমোহর মারা কাগজখানা দোলায়। শূন্যে। রোমশ হাতখানার ওপরে নোটটা সুখীর মনে এক বিপরীত ক্রিয়া করে। ও একবার পেছনে তাকায়—সারা বাড়ি শুনশান, জনমিনিষ্যি নেই। চৌধুরীর দুই ছেলে দুজনেই বাইরে থাকে। একজন সদ্য চাকরি পেয়েছে, সে দিল্লি গেছে মাস তিনেক। অন্যজন বছর তিনেক কলকাতায়, নাকি পড়াশুনা শেষ হতে আরো দুবছর বাকি। চৌধুরী হাতখানা নামিয়ে কাত হয়। ওই হাতখানাই বাড়িয়ে বলে, 'কীরে ভেতরে আয়, লজ্জা কি? কেউ জানবে না।'

'কেউ জানবে না' শব্দদুটো যেন ধাক্কা দেয় সুখীকে। ঘোমটাটা আর একটু টেনে দেয় বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের উলটোপিঠ দিয়ে। বলে, 'কাকু, বাপের পারাই বইলল্যে ব্যটে কথাটো! তা আমি বাউরি ব্যটে কিন্তুক অত শস্তা লই। তুমার কাছকে আইস্‌ব ত দশ টাকাপয়সায় হব্যাক? জমিন দাও, গয়না দাও, ঘর দাও, তবেই না? আর কাকীমাকে আমার বরের কাছকে পাঠাই দাও। গতর খাটাই খাই কাকু, গতর বেচ্যি না। তুমাকে টাকা দিতে হবেক নাই।' ও দুমদাম পেছন ফেরে। চৌধুরী উঠে বসে বিছানায়, 'শোনরে সুখী, ঠাট্টা করছিলাম, মাইরি, কাউরে বলিস না। টাকাটা নিয়ে যা, তোকে কিছু করতে হবে না।'

তা সুখী কাউকে বলে নি। মাকেও নয়। তিনদিন ওকে বাড়িতে বসে থাকতে দেখে বনমালী বলে, 'কীরে, পাট কইরত্যে যাস না যে?' ও সংক্ষেপে বলে, 'উয়াদের কাজ কইরব না, অন্য বাড়ি ধইরব। রূপনারানপুরে ঢের বাড়ি হবেক।'

সুখীর কাজের অভাব হয় নি। রূপনারায়ণপুরে বাড়ির পর বাড়ি উঠেছে, কেবলস্‌-এর কারখানা লম্বা-চওড়ায় না বাড়লেও কারখানার লোকসংখ্যা বেড়েছে। ক্লাশ এইট পাশ করলেই ডিপেন্ডেন্ট কোটায় বাপের চাকরি ছেলেতে বর্তায় এমন শিল্প উদ্যোগে শিল্পের কতখানি উন্নতি হয় তা কেবলস্‌-এর ডিউটির সময় শ্রমিকদের ফিটফাট চেহারা আর পোশাক দেখলেই বোঝা যায়। হিন্দুস্থান কেবলস্‌-এর লোকেরাই কোআর্টার আর বাড়ি সমান্তরালে ভাড়া দেয়। কোনোমতে একতলা করে, ভাড়াটের অ্যাডভান্সের টাকায় দোতলার জানলা-দরজা মোজেইক হয়। চিত্তরঞ্জনের লোকেরাও ধানখেতের জমিতে দোতলা তিনতলা ক্রমাগত বানিয়ে ফেলে। এত বাড়ি আর এত লোক বেড়ে গেলে আনুষঙ্গিক অনেক কিছুই বেড়ে যায়। এতসব বেড়ে গেলে সুখীর কাজ পাওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। আর শুধু সুখী কেন, গোটা বাউরিপাড়ার মেয়েরাই বাড়ি বাড়ি কাজে লেগে যায়।

•

বনমালী বাপের চাকরিটা পায় না। কেন পায় না ও বোঝে না, ওর ধারণা ছিল মরে যাওয়া বাপের জুতোজোড়া ওর পায়ে যেমন ফিট করত, মরে যাওয়া বাপের হাতের লাঠি যেমন ওর জোয়ান হাতের মুঠোতে এঁটে যেত, তেমনি মরে যাওয়া বাপের

চাকরিতেও ও ফিট করবে। এঁটে যাবে। সেই চাকরির জন্য ধরাধরি, ঘোরাঘুরি করতে করতে ও বি ডি ও অফিসে কাজ পায়। জল আনা, অফিস ঝাঁট দেওয়া এইসব দুবেলার কাজ। মাস গেলে সুখী, দ্বিতীয়বার গর্ভবতী তখন, বনমালীকে পাঠায় মাইনে আনতে। গতরাতে হাঁড়ি চড়ে নি। সকালে উনুন ধরে নি। সুখী খালিপেটে মেয়ে-কোলে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। বেলা গড়িয়ে গেলে ও দুকদম হেঁটে অফিসের বেয়ারা রামশরণের ঘরে যায়। রামশরণ তখন চারপায়াতে বসে বাঁহাতের চেটোয় ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে চুনের সাথে তামাকপাতা ডলছিল, চোখ দুটো বেশ ঘন হয়ে নেমে এসেছিল নিজেরই হাতের তালুর ওপর, সুখীর কথা শুনে সেই চোখই কপালে তুলে বলে, 'আবি তক ঘর নহী লৌটা?' সুখী কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'না দাদা, কাল থিক্যা প্যাটে ভাত নাই। উ বেতন আইনবেক তবে গ্যে চাল সয়দা কইরবেক।' খইনি মুখে ফেলে সশব্দে দুহাতের তালু ঝাড়ে রামশরণ। বলে, 'উ শালা লোক জুয়া খেলতে গেছে। চল।'

মাইনের পুরো টাকাটাই হেরে মেজাজ খিচড়ে ছিল বনমালীর। ভরদুপুরে বউয়ের চিৎকারে তার মাথায় আগুন জ্বলে।

'মরণ নাই তুমার? খাত্যে দিথে লাইরছ, জুয়া খেইলচ কীসকে? গলায় দড়ি দাও। লাইনে মাতা দাও। লইজ্জা নাই তুমার?'

সুখী থামে না, চিৎকার করতে করতে মেয়েকে ঠেলে দেয় বাপের দিকে। বলে, 'ভালো, ছিল্যাটর দিক্যে ভালো—কী খাত্যে দিব উয়াকে বলো? বলি আমি আপিস ঝিঁটাই নাই? কুয়া থিক্যা জল তুলি নাই? না তুই একাই মাসভর কর‍্যাচিস? উ টাকা তুর একার ব্যটে?'

রামশরণ বলে, 'বহুকে আধা মাহিনা দিস নাই? ছি!'

বনমালী এতক্ষণ কোনো কথা বলে নি। রামশরণের কথা যেন তার ভেতরের পুরুষমানুষকে জাগিয়ে তোলে। যেন টাকা হারানোর শোক ভুলতেই সে এগিয়ে এসে সপাটে একটা চড় কষায় বউয়ের গালে। 'উঃ! মা গঁ' বলে সুখী মাটিতে বসে পড়ে। এতেও বনমালীর রাগ পড়ে না। এই প্রথম সে বউয়ের গায়ে হাত তোলে। মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা বাউরিপাড়ায় নতুন কিছু নয়। বউ থাকলেই পুরুষমানুষ একটু-আধটু মারধোর করবে। আদরসোহাগ খাওয়ার মত এটাও স্বাভাবিক। এমন স্বাভাবিকতায় যেতে পেরে বনমালীর কোনো অনুশোচনা ত হয়ই না উলটে ও যেন এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে সুখীর একশভাগ স্বামী হয়ে ওঠে, আর সেই সদ্যলব্ধ স্বামীত্বের অধিকারে সে বউকে সবার চোখের সামনে দিয়ে চুল ধরে নিয়ে যায়, সুখীর পিঠভরা কালো ঢেউ খেলানো চুলের গোছা দিয়ে সুখীর গোটা শরীরটাই টেনে নিয়ে যায়, পেটে বাচ্চাসমেত ওর উপোসী রমণী শরীর।

বাড়ি এসেও বনমালীর রাগ পড়ে না। ভাদুমণি এসে সুখীকে ছাড়িয়ে নেয়। বলে, 'তুমার কি আককেল নাই? গায়ে সন্তান, অমনি মারে?' সুখীকে বলে, 'উ রাককোশকে

খেপ্যাস না বুন। উ মানুষ লয়।' সুখী অস্ফুটে শুধু বলে, 'মায়ের কাছকে এট্টা খবর দাও দিদি।'

সুখীর মার খেয়ে ফুলে ওঠা ঠোঁটে, কালশিটে পড়া মুখে মমতার হাত বুলতে বুলতে ওর মা জামাইকে গালাগালি দেয়। বনমালী উঠনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। শাশুড়ির শেষ বাক্যটি পর্যন্ত সে বাধ্য ছেলের মত বিনীত, শোনে। বাপ মরে যাবার পরে শাশুড়ি ছাড়া আর কে আছে তাকে এমনভাবে বকাবকি করার? মায়া বলে, 'তুমার না পুষায় কি তুমি অপারক হল্যে পঞ্চেত বসাও, পাঁচজনের সাইমনে বলো, কি তুমি লাইরছ না আমার বিটির কুন দষ আচে। আমি মেয়্যা লিয়ে চল্যে যাব, হুঃ।'

কিন্তু সুখীই যেতে চাইল না। মায়ের কোলে মাথাটা রাখে। রাত গভীর হয়। সেই গভীর থেকে যেন এই কিশোরীর কণ্ঠ শোনা যায়, এমনই গাঢ় সে আওয়াজ।

'মা তুই আছিস তাই বইলছিস। কাল তুমি রইবে না, তখন ত ঘুর‍্যা ইখানকেই আইসতে হব্যাক। পারিটা ছটো, আর একটি আইসছে, কুথা যাব বল? সইজ্জ কইরথ্যে লারলে গলায় দড়ি দিব, লাইনে মাথা দিব।'

'আমি তকে আবার বিয়া দিব।' মায়া বলে।

'সি ত সাঙা। তা বাদে সিখানেও মারে যদি। মরদমানুষ ত অমনি মা। মদ খাবেক, আর মেয়্যাছিল্যার গায়ে হাত উঠাবেক। তুই চল্যা যা। মরি ত ইখানকেই মইরব।'

মায়াকে, তার এমনিতর বিয়াআলা বিটির মরণ হেনেছে বারবার। বড় বিটিটকে জামাই খুন কর‍্যা লাইনে শোওয়াই দিল। মেজটাকে দুষ্টু লকে পারা খাওয়াইন দিল। সব্ব অঙ্গে বেথা আর পারার ঘা লিয়ে বিটিটি ছটফটাই মল। ই রববারে বিটি ত ফিরে রববারে লাতিনটো। মায়া মায়ের মহিমা পায় যেন কোনো দৈবী প্রেরণায়। বলে, 'সুকিরে, ঝেবন বারেবারে আসে না মা। মুদলে আঁকি, সকল ফাঁকি। মইরলে কারোর কিছু লয়। তা জামাই যদি ঝাঁ্যাটালাতি মারে আত্মঘাতী হোসনে। বাবুঘরে গতর খাটাস, চাষাঘরে গতর খাটাস, তবু মরিসনে। তুই মইরলে তুই-ই মইরবি অন্যে লয়।'

গর্ভধারিণীর কথাটি সুখী রেখেছে। পাঁচ-পাঁচটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে। দিনে দিনে খর হয়েছে জীবন। খরতর জিহ্বা। বনমালীর চাকরি ছিল মোটে একবছর। সেই চাকরিই তার জীবনেব প্রথম ও শেষ চাকরি। কয়েক বছর পর একটি সাইকেল ভ্যানের আধামালিক হয় বনমালী। ভাদুমণির মদবেচা পয়সায় কেনা ভ্যানের হোলটাইম ড্রাইভার হয় বনমালী। ভাদুর বর রসিক রিকশা চালায়। সে রিকশায় মানুষ যায়। সিমেন্টের বস্তার জন্য ত ভ্যানই লাগে। আলু-পেঁয়াজের বস্তা গুদাম থেকে বাজারে পৌঁছবার জন্যও ভ্যান লাগে। তাছাড়া রূপনারায়ণপুরে এখন সমাজভিত্তিক বনসৃজন প্রকল্পের অফিস হয়েছে। বনবিভাগের বীজের বস্তা আর চারাগাছ বিলি করার জন্য বনমালীকেই ভ্যান চালাতে হয়। সেদিন বড় ফূর্তিতে থাকে ও। মাথাভরা কোঁকড়া চুলে পাক আর জট। গালে খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি। বনমালী মহানন্দে প্যাডেল করে আর ভাবে, 'শালা

শায়েব, চাকরিট দিলেক নাই।'

সমাজভিত্তিক বনসৃজন প্রকল্পের বীট অফিসার কিরীটি খান এস সি/ এস টি কোটায় চাকরিপ্রাপ্ত। ট্রেনিং দার্জিলিঙে—প্রথম কর্মস্থল বাঁকুড়া। রূপনারায়ণপুরে বছর তিন সাড়ে তিনবছর চাকরির মধ্যেই চিত্তরঞ্জন, রূপনারায়ণপুর হয়ে দেন্দুয়া পর্যন্ত রাস্তার দুধারে ইউক্যালিপটাসের কৃত্রিম অরণ্য বানিয়ে ফেলেছে। এই প্রকল্প চালু হবার পরে স্থানীয় কিছু সাঁওতাল, ডোম, বাউরিদের অস্থায়ী শ্রমিকের কাজ হয়। বনমালী দিনকতক হাঁটাহাঁটি করেও ওর এই উদোম স্বভাবের জন্য চাকরি পায় না। চাকরি পায় কাশী, বনমালীর খুড়তুতো ভাই। বয়সে সে বনমালীর চাইতে বেশ কয়েক বছরের ছোট হলেও তার চুলে শাদার ভাগই বেশি, দড়িপাকানো চেহারায় খাটবার শক্তি বিস্ময়কর, তবে সে শক্তি শরীরেরই শক্তি না শরীরেরই অভ্যাস বা অভ্যাসের শক্তি, শারীরিক অভ্যাসের শক্তি তা ওর ভাঙাচোরা, আঁকিবুকি লেখা মুখ দেখে বোঝা যায় না। আন্দাজ করা যায় মাত্র। কাশী বনবিভাগের দেওয়া খাকি প্যান্ট-শার্ট পরে বনবিভাগের বস্তা নামায়। বস্তা তোলে। সারের বস্তা। বীজের বস্তা। ময়লা জামা-প্যান্ট ওর রোগা শরীরে ঢলঢল করে। পিঠ বেঁকিয়ে একটা জন্তুর মত ও যখন বস্তাগুলোকে ভ্যান থেকে নামিয়ে গুদামে নিয়ে যায় কি গুদাম থেকে এনে ভ্যানে চাপায় তখন বস্তার নিচে কাশীকে প্রায় দেখাই যায় না, এমনই মিলিয়ে থাকে ওর রোগা ছোটখাট শরীরটা। তুলনায় বস্তাগুলোকে এত বেশি করে চোখে পড়ে যে মনে হয় বস্তাগুলোই যেন জ্যান্ত। জ্যান্ত বস্তাগুলো যেন জোর করে কাশীর পিঠে সওয়ার হয়ে ওকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বনমালী খুব একটা হাত লাগায় না। মিটিমিটি ধূর্ত চোখে তাকিয়ে বেশ মৌজ করে বিড়ি খেয়ে যায়। কিরীটি থাকলে একটু আধটু সাহায্য করে কাশীকে বস্তা ওঠাতে নামাতে, নইলে পা দুটো একটু ফাঁক করে বাঁ হাত কোমরে, ডান হাতের আঙুলে বিড়ি, মুখ নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে। অন্য লোকগুলোকে হুকুম করে, 'ধরো ধরো টুকদু বোস্তাটো, ফেলাইন দিও না, গরমেন্টোর মাল ব্যাটে।'

বাড়ি এসে বউকে বলে, 'গরমেন্টোর চাকরিতে শালো বিকাই গিঁইচ্যে। এই শায়েবের উঠান ঝাড়ু দিছ্যে, জল তুইলচ্যে, লক্ষ্মীবারে আমের শাকা ভাইঙচ্যে, বাজার কইরচ্যে, হারামজাদার পেসটিজ লাই! গরমেন্টের চাকরি লয়, শায়েবের চাকর হইচ্যে শালো!'

পাঁচ

পারি ও টুসু পরব

বনমালীর বড়মেয়ে পারুল, অবিশ্যি 'পারুল' বলে তাকে কস্মিনকালেও কেউ ডাকে না, সে হলগে 'পারি', শুধুই 'পারি'। বাউরিঘরের আর সব মেয়েদের মত সেও আট বছর বয়স থেকেই বাবুঘরে পাট কইরথে যায়। তার স্বাস্থ্য ভাল, চুল কোঁকড়ানো, মোটা আর ছোট—স্প্রীং-এর মত গুটিয়ে থাকে। তার আব অশ্কার মাঝখানে আরো তিন

বোন—যথাক্রমে শাটি, ববিতা ও জবা। দুই সন্তানের মাঝে ঠিক দুবছরের ব্যবধান। এ ব্যবধান ইচ্ছাকৃত নয়, নিতান্ত জৈবিক কারণেই এমনটি হয়। পারি দুবছরের, শাটি হল, শাটি দুবছবের ববিতা এল। এভাবেই জবা আর অশ্‌কাও জন্মায়। ববিতা পর্যন্ত মায়া জীবিত থাকাতে সুখী তার বাবুঘরের চাকরি বজায় রেখেই তিনবার জননী হয়। কিন্তু জবার বেলায় সুখীর মাতৃদশা চলছিল। বারবার সন্তানধারণ, ঠিকমত যত্ন-আত্তি না হওয়া নাকি মাতৃশোকের যে-কোনোটাই ত কারণ হতে পারে জবার স্বাস্থ্যহীনতার। সুখীর যৌবন ঝরে যাওয়ারও এই সবই কারণ। কোলে রুগ্‌ণ মেয়ে নিয়ে সুখীর পঞ্চমগর্ভে পুত্রসন্তান—অশ্‌কা। অশ্‌কারও পরে সে বারদুয়েক গর্ভবতী হয়। কিন্তু দুবারই তার সন্তান তিন-চার দিনের বেশি বাঁচে না।

পারির বয়স এখন এগার। চার বছর বয়স থেকেই সে শিশুপালনে অভ্যস্ত। আট বছর থেকে পরের ঘরে বাসন মেজে পয়সা কামায়। এগার বছরেই সে যেন তার ভাইবোনদের ছোট এক জননী হয়ে ওঠে।

পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন শাটি বলে, 'দিদি তর সাথে যাব।' সংক্রান্তির দিন টুসুর ভাসান। গোটা পৌষমাস ওরা টুসুর গান গেয়েছে। ফুল বাতাসা কলা দিয়ে প্রসাদ পেয়েছে। প্রতিবার আঁধার থাকতে উঠে পারি একাই ফুল জোগাড় করে নিয়ে আসে। ন বছরের শাটি তাই বলে কথাটা। সন্ধেবেলায় ওদের রাঁধাবাড়া হয়ে যায়। উনুনের শেষ-আঁচের ধারে ওরা তিনজনে জড়াজড়ি করে বসে। অশ্‌কাকে শুইয়ে দিয়ে সুখীও উনানশালে বসে। বনমালী ঘরে নেই আজ। সারাদিনই নেই। বনমালীর ভাত বেড়ে উনুনের ধারে উঁচু জায়গাটায় ঢাকা দিয়ে রাখে পারি। বলে, 'বাবু এখনো আলো নাই মা?'

'দ্যাখ গে কোন ঠেকে পড়্যা আছো।' সুখী বলে। উনুনের আগুনের তাপ ও আলো ওদের সংলগ্ন করে রাখে। ববিতা বলে, 'আমি বড় হল্যা চাকরি কইরব। মাকে খাইটতে দিব না।' পারি হাসে, 'পঢ়ালিখ্যা জানিস তবে ত চাকরি!' 'মেয়্যাছেল্যার পঢ়ালিখা শিখলে দষ হব্যাক।' সুখী বলে।

'কেনে?' ববিতা বলে।

'লোকে নিন্দা কইরবেক। বিয়া হবেক নাই।'

'আহাহা, লকে নিন্দা কইরবেক? দিদিমণিগুন্যা লিখাপড়া করে্য নাই?'

'উয়ারা হল ভদ্দরলক। আমরা বাউরে ব্যটি!'

'ভাই ইশকুলে পইড়ব্যাক।' পারি বলে। আর সে বলাটার মধ্যে এমন এক আকাঙ্ক্ষা ও তীব্র ইচ্ছা মিশে যায় যে শাটি, ববিতা দুজনেই হাততালি দিয়ে ওঠে।

'আমাদের ভাই পইড়বেক। ইশকুলে যাবেক। চাকরি কইরবেক বাবুদের ছিল্যার পারা।' সুখী একটা মস্ত হাই তুলে বলে, 'শুয়্যা পড়, ভুরে উইঠতে হব্যাক।'

রাতে বারে বাবে ঘুম ভেঙে যায় পারির। ও কান খাড়া করে থাকে ফ্যাক্টরিতে পাঁচটার

সিটি বাজে কিনা শুনতে। শেষ-পৌষের রাত কখন যে ফুরয়, কখন যে ভোর হয় বুঝা যায় না। কেমন হিম পড়ে। ওদের ঘরের মাটির দেওয়ালে কী যেন একটা সরসর করে চলে বেড়ায়। এই ঠাণ্ডায় ত ইঁদুর, টিকটিকি, আরশোলারাও গর্তে ঢুকে থাকে, তবে দেওয়ালে কী হাঁটে?

হঠাৎ ঘুমের মধ্যে অশ্‌কা কেঁদে উঠতেই পারি উঠে পড়ে। হাত বাড়িয়ে মাথার কাছ থেকে একটা কৌটো নেয়। অন্ধকারেই কৌটো খুলে একটা বাতাসা বের করে। অশ্‌কাকে তুলে ঘরের কোনায় রাখা একটা মাটির হাঁড়িতে পেচ্ছাব করায়। বাতাসা হাতে দিয়ে ওকে শুইয়ে দেয়। আস্তে আস্তে পিঠ চাপড়ে দেয়। 'চারইটা বাইজল তালে।' অশ্‌কার শেষ-রাতের ঘুম ভাঙা, পেচ্ছাব করা ও বাতাসা খাওয়ার সময়টা ত পারিরই জানা।

ভাই ঘুমিয়ে পড়লে ও উঠে পড়ে। বালিশের তলা থেকে দেশলাই নিয়ে হ্যারিকেন জ্বালে। লণ্ঠনের লালচে আলোয় দেখে কখন যেন বনমালী এসে শুয়েছে।

'কয়টা বাজল পারি?' ঘুম জড়ানো গলায় সুখী জিগ্যেস করে। 'চারটে হব্যাক।' পারি উঠে মণ্ডলকাকীমার দেওয়া সোয়েটার পরে। অসওআল ছাপ মারা নেভি-ব্লু রঙের কার্ডিগান। ফুলহাতা। হাতাদুটো সোয়েটারের তুলনায় লম্বা বলে গুটিয়ে পরতে হয়। কেবলস্ স্কুলের বিনি পয়সার ইউনিফর্ম। একশ পার্সেন্টি উল লেখা থাকলেও ওর জাড় লাগে। মায়ের চাদরটা নেয়। দরজা খুলে বাইরে যাবার আগে মাকে বলে, 'শাটিরে উঠাও।'

একটু পরে দুবোনে ঝুড়ি নিয়ে বেরয়। অন্ধকারে আবছা আবছা আরো মূর্তি দেখা যায়। গোটা বাউরিপাড়ার ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে পড়েছে ফুল জোগাড় করতে। আজ টুসুর ভাসান। হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে ওরা এগয়। শেষরাতের অন্ধকার আর শীত যেন ওদের ঘিরে ধরে। এমনিতেই এই রুখু মাটিতে গাছগাছালি হওয়া মুশকিল; ইদানীং কিছু নতুন নতুন বাড়ি আর বাড়ির সামনে বাগান হয়েছে। রূপনারায়ণপুরে মানুষজনের বসবাস বাড়ছে বলেই এসবও বাড়ছে। কিন্তু বাবুরা টুসুকে ফুল দিবেক নাই। কোনো কোনো বাড়িতে বাগান জুড়ে ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা আর গোলাপ। ইসকল ফুল টুসুর লেগ্যে লয়। মা সরস্বোতীর লেগ্যে। বাউরিপরবে ফুল দিবেক কে? টুসুর লেগ্যে আমরা বাবুদের বাগান থিক্যা ফুল চুরি কইরব। ওরা নিঃশব্দে পাঁচিল টপকে, কোথাও তালাবিহীন গেট খুলে বাগানে ঢোকে। টপাটপ ফুল ছেঁড়ে। ভয়ে। নির্মমতায়। মাটিতে স্খলিত পাপড়ি, পাতা ও ফুল পড়ে থাকে সেই ভয় আর নির্মমতার প্রতীক যেন। ঝুড়ি বোঝাই ফুল নিয়ে ওরা গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফেরে। 'আমার টুসু সিনাই এল/ পইরতে দিব কি?/ বাস্কে আচে ঢাকাই শাড়ি/ বাইর কর্যা দি।'

অনেক গায়েনের মধ্যে এ-গায়েনটাও ওরা সন্ধ্যাবেলা গাইবে, টুসুকে নিয়ে গাইবে। যে-যার টুসু নিয়ে একসঙ্গে গাইবে।

ছয়

চলে বাবা বনমালী

বিকেলে বনমালী পারিকে বলে, 'অশ্‌কাকে ত্যাল কাজল দে রোড ধারে ঘুরাই আনি।' ছ-বছরের অশ্‌কা ওদের ছোট উঠনে ছুটোছুটি করে। পারি আজ আলো থাকতেই ঘরে ফিরেছে। সে ভেবেছিল সিনেমা দেখতে যাবে 'শ্রীমতী'তে, কিন্তু এখন চিত্তরঞ্জন গেলে সে টিকিট পাবে না। মনোজের আজ চব্বিশ নম্বরে দাঁড়াবার কথা! ওকে না পেলে ঠিক যমুনার সাথে যাবে। যমুনারও যাওয়ার কথা। কাজ সেরে ফেরার পথে ও যমুনাদের ঘরে যায়। ওর মা বলে মেয়ে নাকি মেটিনিতে সিন্‌মা দেইখতে গিইচ্যে!

চোদ্দ বছরের পারির ভরভরন্ত শক্ত আঠারর শরীর। তার স্প্রীং-এর মত চুলগুলো এত ঠাসা আর ছন্দে গাঁথা যে মনে হয় কোনো সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞর হাতের কাজ। পারির ছোট নাক আর বাপের মত তীক্ষ্ণ ছোট চোখ, সেদিকে চাইলে নাগিনীর উপমা মনে আসে, সে দৃষ্টির হনন থেকে আত্মরক্ষা করা কঠিন। নবীনতায় ওর কালো রঙ ঘামতেল মাখা কালীমূর্তির মত মনে হয়। বাউরিঘরে এমন বয়সের আগেই বিয়্যা বসে। কিন্তু পারি জানে তার বাপ তার বিয়্যা দিব্যাক নাই। তার মা পয়সা খুঁইজছে চাষাঘরে, যেখানে বনমালী মাইন্দার আর সুখী কামিন। সারা বছরের নয়, ধান পোঁতা আর তোলার সময়কার বাঁধা মাহিন্দর। বাঁধা কামিন। তা সেখান থেকেই ত দু-চারশ টাকা ধার পাওয়া যেতে পারে মেয়ের বিয়ের জন্য। আজকাল বাউরিছেলেরাও বাবুদের পারা ইট উটো চায়। সাইকেল। ঘড়ি। রেডিয়া। টেরিকটের পাঞ্জাবি-পাজামা।

সিনেমায় যেতে না পেরে পারির মেজাজ ভাল ছিল না— 'মণ্ডলকাকীমাট আচ্ছা হারামি মেয়াছেল্যা, খালি কাজ বাড়াইন দ্যায়, মনজাটা ঠিক যমুনাকে চা-ঘুগুনি খাওয়াবেক।' ও শাটিকে বলে, 'দে না ভাইকে সাঁজায়ে। আমি এই আলুম, এট্টু বসি।' শাটিও কাজ করে এসেছে, তবে খানিক আগে। সে অশ্‌কাকে ডাকে, 'আয় ভাই, আয়। অশ্‌কা থমকে দাঁড়ায়। বাবার দিকে একবার তাকায়, তারপর দিদির দুই বাহুর মমতাভরা প্রসারতায় ছুটে আসে।

একটু পরে ছেলে নিয়ে বনমালী বেরয়। অশ্‌কার রোগা পাতলা গড়নেও বেশ একটা গোলগাল ভাব আছে। বয়সের তুলনায় ওকে বেশ ছোট দেখায়। একমাথা কোঁকড়া কালো চুল ওর মায়ের মত, বড় বড় পাতার ঘেরে বিশাল দুটো কালো চোখ, মাঝারি নাক আর ছোট গোল পুরন্ত ঠোঁটের ভাঁজের করুণ বিষণ্ণতায় ওকে কেমন অপরিচিত মনে হয়। বেমানান মনে হয়। বনমালী তার ছেলেটিকে ঠিক বাপের মতই ভালবাসে। বনমালীর মত মানুষের পক্ষে সন্তানকে যতখানি ভালবাসা সম্ভব হয়ত তার চেয়েও বেশি। সেই সাধ্যাতীত ভালবাসায় সে ছেলেকে কোলে নেয়, ছেলে দৌড়তে পারলেও কোলে নেয়। প্রথমে বাঁ হাতের ঘেরে কোলে নেয়। ডান হাতের আঙুলগুলো যেন মন্ত্র পড়ছে এমন বিড়বিড় করতে করতে ছেলের মাথা থেকে ঘাড় বেয়ে সারা পিঠে বুলায়।

বাপের কোলে চেপে অশ্‌কা খুশিতে মাথা উঁচু করে এদিক-ওদিক তাকায়।

কিছুটা এগবার পর জুত হচ্ছে না দেখে, বনমালী ছেলেকে কাঁধের ওপর তুলে নেয়। প্রথমে এক কাঁধে, তাতে ছেলে টলমল করছে দেখে ছেলের দুই পা নিজের দুই কাঁধের ওপর দিয়ে বুকেব ওপর ঝুলিয়ে দেয়। হাঁটু দুটো দুহাতের পাঞ্জায় ধরে। অশ্‌কা একটু ঝুঁকে বাপের রুক্ষ কাঁচা-পাকা চুলের গোছা ওর দুই কচি মুঠিতে ধরে।

আজ দুপুরে ভাদুর ঘরে গিয়েছিল বনমালী, ভ্যান রাখতে। 'বসো গঁ দ্যাওর,' ভাদু রঙ্গিলা হয। বলে, 'ভাল মাল আচে, টুকদু টেস করো।' এ যেন পাকা শিকারীর টোপ ফেলা। বনমালীর ট্যাকে আজকের উপার্জন যেন বনমালীর জন্য নয়। এ যেন ভাদুমণির মদের পয়সা। এ টাকা বনমালী বহন করে, সাধ্য কি? এ যেন পরের গচ্ছিত ধন, ভাদুমণির চোখের ধারে এ কথাই চমকায়। কিন্তু আজ বনমালী বেশি খায় না। ততটুকুই খায় যতটুকু খেলে টালমাটাল পায়ে ছেলে কোলে সে বাবা হয়ে উঠতে পারে তার নিজের ধরনেই—বাবা বনমালী। তার কাঁধে তার কিষ্টোবেটা বাপের চলনে দোলে।

হেলেদুলে বনমালী বিজয়ের চা-তেলেভাজার গুমটি দোকানে আসে। ছেলেকে নামিয়ে দাঁড করিয়ে দেয় দোকানের সামনে পাতা বেঞ্চির ওপর। ট্যাক থেকে একটি পাঁচ টাকার ও একটি ময়লা দুটাকার নোট বের করে। এ তার মেয়ের পয়সা, পারির সিনেমা দেখার পয়সা। বিজয়ের দিকে টাকাটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'লাও তুমার চা পাঁরুটি জিলাবির দাম শধ!' বিজয় পাল হাসি মুখে বলে, 'এত তাড়া কিসের? তুমার বেটা? বেশ ছিরিছাদের হইচোঁ ছিল্যাটো—নাম কি ব্যটে বাবা?' বলতে বলতেই ক্যাশবাক্সের ডালা খুলে টাকাটা রাখে। 'উয়ার নাম অশককুমার। বল বেটা নাম বল?' একটু সলজ্জ অথচ গর্বিত সুরে টেনে টেনে বলে অশ্‌কার বাবা। ছেলের মাথায় হাত বুলতে বুলতে।

'চা খাবেক? ভাল চপ ভেজেঁছ্যি।' বিজয় গুমটি থেকে নামে। 'নাহ চা খাব নাই আজ। অশ্‌কাকে এট্রা চপ দাও।'

'কী হল, বনমালী আজ চা-চপ খাবেক নাই?' বাউরি-টানে কথাগুলো বলে কাটোয়ার ছেলে সমীর। দোকানের পেছনে অনেকখানি ঘেরা জায়গা, সেখানে ইটের গাঁথনির প্লাস্টারবিহীন দেওয়ালের ওপর অ্যাসবেস্টেসের ছাউনির নিচে ফোল্ডিং খাট, লোহার চেয়ার, গ্যাসের সিলিন্ডার নিয়ে সমীর, চিনু আর ইয়াসিনদের ছোট গ্যারেজ। ওরা এই দোকানে সকাল-বিকেল চা খায়। আড্ডা দেয়। ইয়াসিন দোকানের যে অংশটা দরমার বেড়া আর খড়ের চালা দিয়ে খানিকটা পথের ধারের হোটেল বা ধাবার মত, সেখানে বসে চা খাচ্ছিল। ওখান থেকেই বিহারি-টানে চেঁচায়, 'বনমালীভি আজ বাবা বন গিয়া! উ ভি আজ চা-চপ খাবেক নাই?'

'আলবাৎ বাবা হইচ্যি।'—বনমালী আবার ছেলেকে কোলে নেয়। মেয়েদের মত কিংবা মায়েদের মত করে কাঁকালে নেয় হাতে আধখাওয়া চপ সমেত অশ্‌কাকে। পা দুটো আড়াআড়ি ফেলে তাতে ওর পেছনটা মেয়েদের মতই দুলে ওঠে। দু-পা এগয় ও।

একই ভঙ্গিতে। পুরুষের এমন চলনে পেছনে হো-হো হাসির আওয়াজ ওঠে। বনমালী মুখ না ফিরিয়েই চেঁচায়, 'তুমাদের বাপ হই নাই হে, আমার বেটার বাপ হইচ্যি।'

'আমাদের বাপ হতে হব্যাক নাই, চা খেইয়েঁ যাও ছিল্যার বাবা বনমালী।' সমীরের খোঁচাটুকু বনমালী যেন গায়েই মাখে না। টলমল পায়ে ও রাস্তা পেরয়। যেখানে পা ফেলতে চায় পা সেখানে পড়ে না। ছেলে কোলে ও একবার টালমাটাল রাস্তার ওপারে যায় আর একবার এপারে।

বিজয়ের দোকান থেকে খানিকটা এগিয়ে রাস্তার ওপারে মহাদেবের দোকান। মহাদেব ঘোষ একজন প্রাক্তন আনন্দমার্গী। অন্তত লোকে তাই বলে। বিয়ের পর পরই সে বাড়ি ছেড়ে পালায়। সে যে সন্ন্যাসী হবে এমনতরো ইঙ্গিত অবশ্য তার চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এমনকি সে নিরুদ্দেশ হবার পরেও বছর তিনেক ধরে তার বাবা মাধব বাজারে, দোকানে মহাদেবের দেনা শোধ করে। এত টাকা বা জিনিশ ও যে কী করত সে রহস্য এখনো অনুদ্‌ঘাটিত। যেমন অনুদ্‌ঘাটিত তার দশ বছরের স্বেচ্ছানির্বাসনের জীবনযাপন। তার চেহারায় কোনো উদাসীনতা কিংবা আসক্তি নেই। বেশ হাশিখুশি দাড়িগোঁপ কামানো নিরীহ এবং বিনীত চেহারা। অন্তত তার চেহারায় বা চলনে-বলনে কোনো কাগুজে আনন্দমার্গীর ছাপ নেই। নিজের অতীত জীবন, তার এই নিরুদ্দেশের দশবছর সম্পর্কে সে এক রহস্যজনক নীরবতা পালন করে। যেন এই দশটা বছর তার স্মৃতি থেকে মুছে গেছে। যেন কোনো দক্ষ সার্জেন নিপুণ হাতে নিখুঁত ভাবে এই দশটা বছর তার জীবনেতিহাস থেকে কেটে তুলে নিয়েছে। বেশি কৌতূহল দেখালে একটু হেসে বলে, 'এই এখানে ওখানে ঘুরতে ঘুরতে একটা ইংলিশ মিডিআম বাচ্চাদের স্কুলে পড়ানোর কাজ পেয়ে তাই করছিলাম।'

ছেলে ফিরলে বাপের বাড়ি থেকে ছেলের বউও ফেরে। মাধব ভেবেচিন্তে ছেলেকে এই পাকা দোকানঘরটা করে দেয়। তাতে ওই একচিলতে জমি জ্ঞাতিদের দখল থেকে রেহাই পেল, এটা হল এক নম্বর কথা। দুনম্বর হল মহাদেব, এগার ক্লাশ পাশ মহাদেব তার অশিক্ষিত বউ নিয়ে নিজের জোরেই বাড়িতে থাকুক এটা মাধব একান্তে চায়। মহাদেবের মা ননীবালাও চায়। বড়বউ সুধারানী লেখাপড়া না জানলে কি হবে গেরস্তালি কাজে খুব দড়। মেজছেলের বউ ভাগলপুরের বি এসসি, সংগীতে হাওড়ার ডিপ্লোমা ও ভারি মিষ্টি করে বাঁকা টানে বাংলা বললেও গরুর জাব দেওয়া, কি মুনিষ-কামিনদের মুড়ি দেওয়া বা সোডা সিদ্ধ কাচতে পারে না। ক্লাশ ফোর পাশ মাধবের বংশে মেজছেলে বীরেনের মত শিক্ষিত ছেলে নেই। সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এসসি, ডি ভি সি-তে ভাল মাইনেয় চাকরি করে। কোয়ার্টার পেয়েও যে সে গ্রামে নিজেদের বাড়িতে থেকে কষ্ট করে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে, এতেই ননীবালা যেন মরমে মরে থাকে। বীরেন এখনো মায়ের রান্না পোস্তর বড়া আর বিউলির ডাল খেতে ভালবাসে। দীপালিকে রান্নাঘরে দেখলে বলে, 'বউদি কই? মা-র কি শরীর খারাপ? তুমি এসব পারো না, সব কেলো করবে।'

ননীবালা খুশি মনে মশলা বাটতে থাকে।

মহাদেব দিয়েছে ভাতের হোটেল। রান্নার ছেলেটির গেঞ্জির ফাঁক দিয়ে পইতের গোছা দেখা যায়। মহাদেব ওকে 'ঠাকুর' বলেই ডাকে। ঠাকুরের নাম ও পদবী জানা যায় না। দোকানের সামনে বাঁদিক ঘেঁষে একটা গুমটি দোকানে কতকগুলো টায়ার ঝোলানো। একটি সতের-আঠার বছরের ছেলে তার সাইকেলের পেছনের চাকায় হাওয়া ভরছে। তার শরীরের উঠানামার তালে তালে পুরনো পাম্পার থেকে আওয়াজ উঠছে, 'ইককো উককো'।

ছেলে নিয়ে বনমালী আরতি নাচের মত হেলেদুলে নাচে। 'ইককো' 'উককো', 'বাবা লাচে', 'বেটা লাচে', 'হেই মা গড় করি', মুখে এই সব বলে আর ছেলে নিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচে। কখনো-বা এক ঠ্যাং তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে নাচে। অশ্‌কা বলে, 'বাবু আমাকে লামাইন দ্যাও, আমিও লাইচব।' ছেলেটি বিরক্ত চোখে তাকায়। মহাদেব, কাঁধে গামছা, এগিয়ে আসে। বনমালী নাচ থামিয়ে বলে, 'জয় বাবা মহাদেবের জয়।'

'কোথায় চললে বনমালী?' মহাদেব বলে।

'আমার কিষ্টোবেটাকে বিন্দাবন ঘুর্‌যাই আনি।'

'পড়ে যাবে যে, বাড়ি যাও।'

'পইড়ব কেনে? আমি কি মাতাল ব্যাটি?' ছেলে নিয়ে ও রাস্তায় নামে। তখুনি একটা কয়লা ভরতি ডাম্পার ব্রেক কষে। কয়লার স্তূপের ওপরে কিছু মেয়েপুরুষ মাথায় গামছা জড়িয়ে বসা। আচমকা গাড়ি থামাতে তারা টাল খায়। এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে হেসে ওঠে। এক মরদ এই সুযোগে মোটা গলায় চলতি ফিল্‌মের গানের এক কলি গেয়ে ওঠে। ড্রাইভার মুখ বের করে বলে, 'এ্যাই বে বনো, উল্লু কোথাকার! মাল খেয়ে ছেলেটাকে নিয়ে বের্‌যাচিস, মইরবি যে।'

গাড়ি বেরিয়ে যায় কিশোরকুমারের গানের সুরে।

বনমালী পিট্‌পিট করে ছেলের মুখ দেখে। অশ্‌কা বলে, 'বাবু জল খাব।' মহাদেব একটা কাচের গ্লাশে জল দেয়। বনমালী ছেলেকে খাওয়ায়। পুরো গ্লাশ জল অশ্‌কা খায় না, খানিকটা বাকি থাকে। সেটুকু বনমালী নিজের গলায় ঢালে। তারপর ঠক করে গ্লাশটা বেঞ্চির ওপরে রাখে। মহাদেব গ্লাশটা তুলে নেয়। বলে, 'বাড়ি যাও বনমালী।' ছেলেকে কোলে তুলে নেয় বনমালী। তারপর একটু সুর করে বলে, 'আমি বিন্দাবনে যাব হে-এ-এ-এ।'

ওর গলার সঙ্গে অশ্‌কার কচি গলা মিলে যায়, 'বিন্দাবনে যাব হে।'

একটু পরে সুখী দোকানগুলোর সামনে দিয়ে চিৎকার করতে করতে যায়। বনমালীকে গাল পাড়তে পাড়তে যায। 'অমন স্বামীর মুকে ঝ্যাঁটা মাইরথে হয়। ঘরে ঢুইকতে দিব না। ছিল্যাট লিছিস কীসকে? বাপ হইনছে? অমন বাপের মুকে ঝ্যাঁটার বাড়ি! কেনে আজ গম আইনথে পার নাই?'

সুখী গিয়েছিল জি আর-এর গম আনতে। বাড়ি ফিরে ছেলে নিয়ে বনমালী বেরিয়েছে

শুনে তার মাথায় আগুন জ্বলে। কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করেও তাকে শূন্য থলি নিয়ে ফিরতে হয়েছে। পারি কাজের বাড়ি থেকে আনা চা গরম করতে যাচ্ছিল, ও বলে ফিরে এসে খাবে। বনমালী, ছেলে নিয়ে কোথায় যেতে পারে, কতদূর যেতে পারে তার একটা আন্দাজ ওই করতে পারে তাই মেয়েদের না পাঠিয়ে ওই বেরিয়ে পড়ে।

মাতাল বাপের কাছ থেকে ছেলে উদ্ধার করতে সুখীর লাগে পাক্কা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ঘোমটা টেনে ছেলে কোলে সুখী হনহন হাঁটে। একটি শব্দও তার মুখ থেকে বেরয় না। তার হাত দশেক তফাতে বনমালী চলে। টলোমলো পায়ে চলে। চলতে চলতে সে একবার ডান হাত তোলে। তোলে আর চ্যাঁচায়, 'এ্যাই হারামজাদী ছিল্যাটো ফেলবি যে।' বাক্যটা শেষ হতে না হতেই ধপ করে হাতটা পড়ে যায়, যেন প্রাণ নেই তাতে। সে অনুরূপ বাঁ হাত তোলে। তার বেঁটে, রোমশ ও স্থূল তর্জনী তুলে বলে, 'ছিল্যা কলে চলা সোজা লয় হে। ঠিকসে চল সুকি।' বলতে বলতে বাঁ হাতও উদ্যত তর্জনীসমেত পড়ে যায়। অসহায় ঝোলে।

এইভাবে নিজেরই দুই হাত ও দুই পা নিজেরই বশে আনতে অক্ষম বনমালী হাত, পা, মুখ ও পায়ের স্খলিত সংযোগে আপন পিতৃত্ব পায়। তার নিজেরই এক একান্ত নিজস্ব এবং মৌলিক এক অধিকার ও অভিমানবোধে পায়।

সাত

পারির বিবাহ ও পুনর্বাসন

মনোজ বাউরির বয়স কুড়ি। লম্বা চুল। হাতে স্টীলের বালা, গলায় রুপোর চেন, তাতে রেখার নিটোল ও কৃত্রিম আইল্যাশের ছায়ায় বিশাল চোখ। মনোজের বুকের ওপরে লকেটে রেখা দোলেন। মনোজের বুকের ভেতরে পারির কিশোরী শরীরের স্মৃতি ঘন হয়ে থাকে।

পারি জানে বাবু তাকে বিয়্যা বসাবেক না। মনোজ জানে পারির সাথে তার বিয়া হবার লয়। হবার লয় কারণ মনোজের বাবা কলিয়ারির লুহার টুপিআলা লেবর, আর তার মাইনের টৌকেন মুদি দকানের মালিকের কাছে জমা থাকে। মনোজ বাড়ির ছোটছেলে। সাত ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট। কাজেই সে কী করে জানবে যে তার জন্মের আগেই তার বাবা মেয়ের বিয়ের জন্য ধার নিয়েছিল? সেই ধারের আসল এখনো 'শধ' হয় নাই। সেই দুঃখু ভুইলথে তার বাবা মদ খায়? মদ খায় বলে মাইনের টাকা জলদি ফুরয়। ফুরয় বলে পেটের খিদা ত ফুরয় না। মরে না। তাই সয়দাপাতি কইরথে সেই রুজের দোকানকেই ধার কইরথে হয়। এভাবেই চলে। আবার এভাবে ত চলেও না। তাই দোকানের মালিক একদিন তার টৌকেনটা নিয়ে নিল। এখন ওই বেতন তোলে সেখান থেকে সুদ আর ধারের টাকা কেটে নিয়ে যা দেয় তাতে ওর সংসার চলে না। মদ খাওয়া ত চলেই না। কিন্তু মদ না খেলেও ত চলে না। ফলে ব্যাপারটা চক্রাকারে চলতে

থাকে। ধার শোধ আর ধার করা আর ঋণ বেড়ে যাওয়া এসবই ত একটার সঙ্গে আর একটা জড়িয়ে থাকে। আর সেই জট কিছুতেই খোলা যায় না। যারা সেই জটিলতায় থাকে, জটের মধ্যে জড়িয়ে থাকে তাদের সেইখানে থাকতেই হয়। নিরুপায়। কাজে কাজেই মনোজের বাপ শুধু শরীরটি সম্বল, এমন মেয়েকে ছেলের বউ করবে কেন? তার ছেলের বয়স আর শরীর স্বাস্থ্য এমন যে সাইকেল, ঘড়ি, রেডিআ দিবার মেয়ের বাপের অভাব হবেক নাই। বাউরি মরদের গতরই ত সবচেয়ে বড় যোগ্যতা। চাকরি আর কজন করে?

প্রায় তিন বছরের মেলামেশা মনোজকুমার ও পারুলের। এই তিন বছরে তারা প্রায় পঁচিশটি পিকচার দেখেছে। মনোজের কাঁধে পারির হাত, মনোজের চোখে আসানসোলের হকার্স কর্নার থেকে কেনা লালচে ঢাউস সানগ্লাস, এইভাবে একটা ফোটোও তোলে রূপনারায়ণপুরের নতুন স্টুডিওতে। মাইথনের বাগানে উঁচু-নিচু গাছগাছালির এধার-ওধার দিয়ে হাত ধরাধরি করে পাঁচ-সাতটা শীতের দুপুর কাটায় ওরা যে যার কাজে ফাঁকি দিয়ে।

চন্দ্রচূড়ের মন্দির লাগোয়া শিবের মেলা নীলগাজন মিলিয়ে। সেই মেলায় বাবার থানের সামনে পারির সিঁথিতে সিঁদুর দেয় মনোজ। কাঁপা কাঁপা আঙুলে পারির চুলের মাঝখানটিতে সিঁদুর, সিঁথির রেখা উপচিয়ে ঘন চূর্ণ কুণ্ডলে গুঁড়ো গুঁড়ো ছড়ায়।

সামডি রোডের ধারে ঘর নেয় মনোজ। পারি নতুন বাড়িতে কাজ ধরে। মনোজ পড়ে মুশকিলে। খাদানে নামা বাপের বেটা। ও লাঙল ধরতে জানে না। ধান রুইতে জানে না। সাইকেল নেই ত কয়লার বিজনেস কইরথে লারে। কলিয়ারির দিকে গেলে বাপে নাকি ঠ্যাং ভেঙে দেবে তাই ও কাজের খোঁজে ডাবরমোড়েই আসে। শ্বশুরঘরে একদিনও যায় নি। পারি যেতে দেয় নি। তাছাড়া শ্বশুরকে ও ভাল মত চেনেই না। ডাবরমোড়ের এদিক-ওদিক ঘুরলে কিছু কাজ মেলে। কাজের ত অভাব নেই। কাজ করার লোকেরই অভাব। বাইরে থেকে মিস্ত্রিরা আসে। মুর্শিদাবাদের রাজমিস্ত্রি। বিহারের লেপ-তোষকের কারিগরা, পাঞ্জাবি ড্রাইভার আর সাইকেলের দোকান। কত নতুন নতুন বাড়ি হচ্ছে। তাদের কোনোটাই বসত কোনোটায় দোকান। 'পার্মেন্টি' কাজ না পেলেও কাজের অভাব হয় না মনোজের। তবে সে লক্ষ করে দেখেছে যে, ঠিকাদাররা বাইরের লোকই পছন্দ করে বেশি। বাউরি মানুষজনও যেন কমে গেছে ওর মনে হয়। ছোটবেলায় এদিকে আসত মাঝে মাঝে, তখন আঁধার হলেই সামডি রোড ধরে একলা ফিরতে ভয় করত। এখন ভয়গুলোও যেন এই সাঁওতাল-বাউরিদের মতই কোনো কোণে গিয়ে ঠেকেছে।

দুপুরবেলা বাড়ি ফিরবে ভেবেছিল মনোজ। আজ কাজ হয় নি। কন্টাক্টরবাবু ঘরকে গেছে বলে আজ কাজ বন্ধ। ও ভেবেছিল পারির জন্য খাবার নিয়ে যাবে। 'ছ-মাসের বাচ্চা কোলে বউ, ঘরে অন্য মানুষ নাই।' সাতটা নাগাদ ও ডাবরমোড়ে এল। পকেটে পয়সা নেই যে কিছু কিনবে। রতনের সাথে দেখা হল অনেকদিন পরে। মাল খেয়ে আর

জুয়োয় হেরে রতনের কাছেই ধার করা টাকাটা গেল। রতনের বাড়ি বাসন্তী মন্দিরের কাছে, সে আর উঠতে পারে নি, ফলে মনোজ খালি হাতেই ওর ঘর থেকে বেরয়।

ডাবরমোড়ে এসে ওর কেমন জানি ধাঁধা লাগে। অসময়ে দোকানপাট বন্ধ দেখে ও একটু অবাক হল। রাস্তাঘাটে লোক নেই, শুধু গাড়ির পর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে গাড়িগুলোকে কেমন ভূতুড়ে মনে হয়। এত গাড়ি এমন সময়ে ডাবরমোড়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে যে মনে হয় কেউ শুধু 'তিষ্ঠ' শব্দটা উচ্চারণ করেই এই ব্যাপারটা ঘটিয়ে দিয়েছে। মনোজ এগয়। রাস্তার দুধারে উঁচু উঁচু ভারী ট্রাক। দুটো ট্রাকের মাঝখানের অন্ধকার দিয়ে যাবার সময় দুপাশের কালো উঁচু জমাট অন্ধকার আরো একটু গাঢ় মনে হয় আর সেই জমাট অন্ধকারের অতিকায় অবয়ব দুটো যেন চাপ দিয়ে দেবে মাঝখানের মানুষটাকে।

মনোজ এতসব ভাবে না, শুধু ওর অস্বস্তি লাগে। আর ঠিক সেই সময়, যেন ওর অস্বস্তি আর ভয় কাটাবার জন্য অন্ধকারের মধ্যে এক নারীকণ্ঠ ধাতব ঝংকারে বেজে ওঠে, 'চন্দন খবরটা তাহলে সত্যি? আমি ত বিশ্বাসই করতে পারছি না। দুপুরে খবর শোনবার পর থেকে সব কেমন গোলমাল লাগছে।'

উত্তরে পুরুষকণ্ঠে শোনা যায়, 'তখনই সব শেষ, কিন্তু অ্যানাউন্স করে নি। করা ত সম্ভবও নয়।'

মনোজ ঠিক বুঝতে পারে না এরা কী বলছে, কিন্তু ও নড়তেও পারে না। ও জানে এইখানে, বাস স্ট্যান্ডের লাগোয়া কংগ্রেস অফিস। লোকগুলো তাহলে কংগেরেসেরই ব্যাটে? ও একপা-দুপা করে খানিকটা পেছিয়ে আসে। দুটো গাড়ির মাঝখানের ফাঁকটুকু দিয়ে গলে বেরিয়ে আসে। যুব কংগ্রেসের ছোট ঘরখানার সামনের বারান্দায় কোনো আলো নেই। পাতলা অন্ধকারের মধ্যে মানুষগুলোর ছায়াশরীর। ঘরের ভেতরে বোধহয় মোম জ্বলছে। বারান্দা পর্যন্ত সে আলো পৌঁছয় না। রাস্তাতেও আলো নেই। মনোজ সাহস করে বারান্দার কাছে এল। কেউ একটা কথাও বলছে না। এত লোক তবু একট শব্দও শোনা যায় না। নিশ্বাসপতনও যেন নিয়ন্ত্রিত, শোনা যায় না। নিশ্বাস আটকে দমচাপা গলায় মনোজ কোনোক্রমে বলে ফেলে, 'কী হইচ্যে আজ্ঞে?'

প্রথমে কেউ উত্তর দেয় না। প্রশ্নটার আঘাতে নৈঃশব্দ্য ও অন্ধকার যেন একই সঙ্গে ভাঙে—একটু পরে কেউ একজন বলে, 'প্রধানমন্ত্রী মারা গেছেন।' আরো একজন বলে, 'ইন্দিরা গান্ধি মারা গেছেন।'

দ্বিতীয় বাক্যটা শোনার আগেই মনোজ দ্রুত রাস্তায় নেমে এল।

সেই রাতে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফেরে মনোজ। পারিকে বলে, 'কংগিরেসের পোধান মইরল আজ। তাঁথেই বাস বনদ, টেরাক বনদ, দকান বাজার সব বনদ। লাইট নাই। বাবুরা চুপ কর‍্যা ডাঁড়াইন আছে। রা কাড়ে না।'

উত্তরে পারি বলে, 'খাবে কি? ঘরে কিছু নাই। পোধান মরেচ্যে ত দকান বইনদ কইরলে চইলবেক? লাও, দুটি মুড়ি চিবায়ে শুয়্যা থাকো। হঃ!'

আট

বনমালীর মেজাজ

রোডে কাজ করছে বনমালী। এ সময়টা প্রতিবছরই রাস্তা মেরামতি চলে। পি ডাবলিউ ডি-এর রাস্তা হলেও চলে, পঞ্চায়েতের রাস্তা হলে ত চলেই। মেন রোড পি ডাবলি ডি-এর, গ্রামের রাস্তা পঞ্চায়েতের। চাষের জমির ওপরে যে নতুন বসতি গড়ে উঠছে বা উঠেছে সেখানকার রাস্তাও পঞ্চায়েতের। সে-সব রাস্তায় অবশ্য এখনো পাথরকুচি বা পীচের আস্তরণ পড়ে নি। সে-সব রাস্তার দুধারে কাঁচা নর্দমা কোথাও কোথাও থাকলেও পাকা ড্রেন এখনো হয় নি। পঞ্চায়েতের বয়স ত বেশি নয়। তবু পঞ্চায়েত কথাটার মধ্যেই যেন এক প্রাচীনতা আছে। সামাজিকতা আছে। দায়দায়িত্ব, কর্তব্য এসবও যেন আছে। এমন এক প্রাচীনতা আছে যে শব্দে সেই শব্দের আধুনিক প্রয়োগও যেন প্রাচীন হয়ে যায় অল্প সময়েই। ফলে পঞ্চায়েত যেন রূপনারায়ণপুরের নবীন বসতি ও পুরনো মানুষজনের এক এমন নির্ভর হয়ে দাঁড়ায় যে সে-নির্ভরতা যেন বহু পুরনো সংস্কারের মত উঠে আসে আবার তারই সঙ্গে আধুনিক রীতিনীতিও জড়িয়ে থাকে এক নতুন সামাজিকতার।

রোডের কাজে স্থায়ী মজুর আছে, ঠিকা শ্রমিকও আছে বনমালীর মত। স্থায়ী শ্রমিকরা সবই পি ডাবলিউ ডি-র। পঞ্চায়েত হাজিরাতে লোক লাগায়। শ্রমিকরা সাঁওতাল, বাউরি, ডোম, কুর্মি এইসব লোক। তারা অনেকেই জানে না এই যে মাইলের পর মাইল ধানখেত; এই যে ধানখেতের পর ধানখেত আর উঁচু-নিচু জমির ওপর এই বসতি তৈরি হচ্ছে সেখানে তাদেরই পূর্বপুরুষরা তাদের মত করে দিনযাপন করত। সাঁওতালরা সরে গেছে আশেপাশের গাঁয়ে-গঞ্জে—বাউরি-কাহাররা কিছু রয়ে গেছে এখানেই।

এখন এই এত বছর পরে, হিন্দুস্থান কেবলস কিংবা চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন তৈরির কারখানা তৈরি হবার এতগুলো বছর পরে সেই মাটির মানুষজনের উত্তরপুরুষরা টাকার বিনিময়ে শ্রম বেচতে আসে তাদেরই নিজেদের ছেড়ে যাওয়া ভূমিতে। এমনকি এই সময়টার জন্য তাদের এক অপেক্ষা থাকে। এ-সময়ে মাঠের কাজ থাকে না। মাঠের কাজ ত কমেও গেছে। এ-সময়ে গেরস্তর ধানকাটা, ঝাড়া, ধান ঠেঙানো, সিদ্ধ, শুকনো, কলে দেওয়া বা দুচার বস্তায় ঢেঁকির পাড় দেওয়া—সব কাজ শেষ। মাঠে যেতে সেই আষাঢ়। দামোদরের পরিস্রুত জল এখানে রাস্তার নিচ দিয়ে মোটা মোটা পাইপের ভেতর দিয়ে কলের জল হিশেবে আসে। সে জলে রান্না-খাওয়া ছাড়া, কাচাকুচি, বাসন মাজা, চান এমনকি গাড়ি ধোওয়া পর্যন্ত চলে, কিন্তু মাঠের তৃষ্ণা মেটাতে ত স্যালো চাই, ক্যানাল চাই। এই অঞ্চলটা বিহারের সংলগ্ন। একটা গেট পেরলেই সাঁওতাল পরগনা। দামোদরের যে জল পরিকল্পনা দিয়ে বাঁধা হয়েছে সে জলও ত পরিকল্পনা করে ছাড়তে হয়। সেই পরিকল্পিতভাবে ছাড়া জলও ত অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। অসময়ে, সঞ্চিত জল,

অসময়ের জন্য সঞ্চিত জল ছাড়া হলে তা দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বা বাধ্যতামূলক দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সেই বিপুল জলরাশির উলটোপিঠে এই উচ্চভূমি। এতদূর পর্যন্ত কোনো প্রকল্প, পরিকল্পনা এসে পৌঁছয় নি। মাটি রুক্ষ, বালি-কাঁকর ভরা। এখানে ওখানে অতিকায় পাথর। পাথুরে টিবি। ধানখেতের শুরু যেখানে, সেখানে দাঁড়ালে দিগন্তরেখা পর্যন্ত কখনোই এক সমতলে দেখা যায় না। এক আল থেকে অন্য জমিতে নামতে গেলে রয়েসয়ে লাফ দিতে হয়।

আগে, যখন কারখানা আর কারখানার যান্ত্রিক শব্দ ধোঁয়া আর নতুন নতুন মানুষজন ছিল না, তখনো এই রুক্ষ ভূমি ছিল। কিন্তু সে রুক্ষতাব মাঝে প্রাচীন বনস্পতির দল ছিল। শাল, পিয়াল, করজা, মহুয়া, শিমুল, পলাশ, মন্দার, কেঁদ, এইসব প্রাচীন বৃক্ষ দিয়ে আগলানো এক প্রকৃতি ছিল। এখন রূপনারায়ণপুরের শুরু থেকে চিত্তরঞ্জনের শুরু পর্যন্ত যদি সোজা হেঁটে যাওয়া যায়, তেমন কোনো শাল-মহুয়ার গাছ চোখে পড়বে না যার ডালে ডালে পাখির বাসা। তেমন কোনো বনস্পতি চোখে পড়বে না যার গা বেয়ে উঠে যাচ্ছে হলুদ-খয়েরি ছোপ দেওয়া সোনা ঢ্যামনা সাপ, পাখির বাচ্চা খাবার জন্য।

অপরিকল্পিতভাবে বেড়ে ওঠা রূপনারায়ণপুরের বেষ্টনীর বাইরে ক্রমে সরে যাওয়া ফসল খেতের জন্য কোনো আধুনিক ব্যবস্থা নেই, বৃষ্টি পড়লে মুনিষ-কামিন গা ঝাড়া দেয় হাল দেওয়া বলদের মত। হাতে পায়ে ছাঁচিতেল নেয়। মাথায় দেবার বস্তা কি চিকচিকি ঝেড়েঝুড়ে নেয়। কদিন হাজরি পাবে। দুপুরে ভাত নয়ত মুড়ি তরকারি। ধান লাগানোর পরে থেকে না পাকা পর্যন্ত খেত নিড়াতে হয় মাঝে মাঝে। ধান পেকে উঠলে ওদের গা চনমন করে ওঠে। কাস্তেতে শান পড়ে। হাজরি বা ভাতমুড়ি ছাড়াও কয়েক কেজি ধান পাওয়া যায় সরাক কিংবা চাষা ঘরে। সেই নতুন ধান সিদ্ধ হবে বাড়িতে। শুকাবে ওদের গোবর-লেপা উঠনে। ওই টুকচা ধান ত কলে দেওয়া যায় না—ঢেঁকিতেই কুটে নেয়। এ ভাতের স্বাদই 'আলেদা' মাটির গন্ধ, শরীরের গন্ধ লেগে থাকে যেন ভাতের গরাসে।

কিন্তু এখন কাজ বলতে কেউ বাঁধা আছে গগন মাজির পাথরকুচি মেশিনে, কেউ ইঁটা ছাড়ায় ইটভাটায় কেউ টুকটাক কাজ করে যখন যেমন জোটে।

রাস্তা সারানোর সময় গোটা এলাকাটা কেমন ভরে ওঠে। রাস্তার ধারে ইটপাতা উনুনে পীচ গরম হয়। বড় বড় কানাছাড়া চ্যাপ্টা কড়াইতে পাথরকুচি আর পীচের মিশ্রণ মাথায় মাথায় চলে যায় খোয়া ওঠা রাস্তার গর্ত বোজাতে। কাঠ, টায়ার আর কাঁচাকয়লার আগুনে চৈত্র মাসের বাতাস আরো গরম আর হালকা হয়ে ওপর আকাশে উঠে যায়। মেয়েরা চুল বাঁচাতে মাথা ঢেকে রাখে বড় গামছায়। তার ওপরে শক্ত করে পাক দেওয়া চটের বিঁড়ে। দশ বার বছরের মেয়েরাও আছে ঝুড়ি বইতে, ঝাঁট দিতে। চৈত্রের রুক্ষ বাতাসে, আগুনের তাপে, খোলা আকাশের নিচে ওদের সকাল দুপুর বিকেল কেটে যায় একঘেয়ে শ্রমে। এই শ্রমে কোনো আনন্দ নেই। কাজের ভারটুকুই

আছে। তবু বয়সের চাপল্যে, যৌবনের উচ্ছ্বাসে কোনো রমণী দুপুর কাঁপিয়ে হেসে ওঠে, সেই হাসির উচ্ছলতায় মাথার ঝুড়ি টলে যায়। তাতে আরো দু-চারজনও বাতাস বিহ্বল করা হাসিতে মুহূর্তের ভ্রান্তি আনে যেন এই শ্রম কোনো বিক্রিত পণ্য নয় আনন্দের উৎস মাত্র। তেমন ভ্রান্তি ঘটে যায় আবারও যখন কোনো কিশোরী তার নবীন বাহু দুটি উত্তোলিত করে চিরকালের মেয়েলি লাবণ্যে চুলের খোঁপা ঠিক করে নেয় আর সেই দৃশ্যে বিদ্ধ হয়ে থাকে কোনো জোয়ান মরদ তার হৃৎপিণ্ডের শব্দে, শ্বাসরোধকারী আনন্দ ও বিস্ময়ে। যেন কয়েক মুহূর্তের সত্যই মিথ্যে করে দেয় ওদের নিরানন্দ ও কুশ্রী দৈনন্দিনগুলো।

আজকাল বনমালীর হাঁপ ধরে। দু-চারবার গাঁইতি চালালেই তার বুকে ধকধক শব্দ হয়। নাকের দুই ফুটো দিয়ে যতটুকু হাওয়া ঢোকে তাতে যেন তার ফুসফুস ভরে না। কুকুরের মত জিভ বের করে খানিকক্ষণ থাকলে যেন এই অবস্থাটা কাটে এমন মনে হয়। কিন্তু তেমনভাবে মানুষ ত শ্বাসপ্রশ্বাস চালাতে পারে না তাই সে মাঝে মাঝে ভুস করে মুখ দিয়ে অনেকখানি বাতাস বের করে দেয়। পরক্ষণেই মুখ-নাক দিয়ে যতটা পারে বাতাস নিয়ে নেয়। তাতে আরো দু-চারবার গাঁইতি চালানো যায়। সকালে নাস্তা করেছে চা-পাউরুটি। বিজয় পালের দোকানে আরো কুলিকামিনদের সাথে। দুপুরে ঘরে গিয়ে ভাত তরকারি খায় কোনোদিন। কোনোদিন মায় ভাত। বিকেলে কোদাল, গাঁইতি, ঝুড়ি, শাবল জমা দেয় পঞ্চায়েত অফিসে। বাড়ি গিয়ে জল পেলে চান করে, নইলে হাতে-পায়ে জল দিয়ে চা-মুড়ি খায়। এখন কদিন দুবেলা ভরপেট ভাত জোটে। এমন খাওয়া তার তিনশ পঁয়ষট্টি দিন জোটে না তাই এমন খাওয়া খেয়ে তার মেজাজ বেশ উঁচু সুরে বাঁধা থাকে। ইদানীং শরীরের তারগুলো যেন ঢিলা হয়ে গেছে। যেন সুরে থাকতে চাইছে না। বারে বারে সুর নেমে যায়। এক পরদা দুপরদা সুর নেমে যায় যেন শরীরেরই কোনো অচেনা অভিমানে। সেই সুর বাঁধতে ওকে ভাদুর ঘরের দাওয়া কি উঠনে বসতে হয় হপ্তা শেষে।

দ্বিতীয় হপ্তার টাকা পেয়ে বনমালী যায় জেমারির হাট। লুঙি কেনে একটি। লাল-হলুদ বাটিক ছাপ। কালো-লালে মিশেল একটি মুরগি। আনাজপাতি। মশলা। ডাল। ছেলের জন্য নীল হাওয়াই চপ্পল। বউকে বলে, 'বেশ ঝাল ঝাল মোরগাটা রাঁধ দিকি।' সুখী শঙ্কিত মুখে জিগ্যেস করে, 'হপ্তার পয়সাট সব খচ্চা কইরলে?' 'লে।' বলে একটা দশ টাকার নোট সুখীর দিকে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দেয়। এক বোতল মহুয়া রাখে ঘরের সামনে। 'কী হবেক দশ টাকাপয়সায়? বতলটো আইনলে কীসকে?' 'বতলটোই ভাইলচিস খালি? এতগুলান সয়দা কইরলুম উটো দেইখতে লারছিস?' বনমালী বোতলটা তুলে নেয়। 'অশ্‌কা?' 'ইসময় অশ্‌কা ঘরকে থাকে? খেইলচ্যে দেখ কেলাব ঘরের সাইমনে।' সুখী জিনিশগুলো তোলে।

বনমালী শিস দিতে দিতে বেরিয়ে যায়। বোতলটি বগলে নিয়ে।

রাঁধতে রাঁধতে সুখীর পারির কথা মনে পড়ে। ওর কালো শক্তসমর্থ শরীর আর ওর

চুপ করে কাজ করে যাওয়া মনে পড়ে। বনমালী জামাই-এর খোঁজ করে নি। পারিও আসে নি। ববিতা খুঁজে খুঁজে নাকি একদিন গিয়েছিল। পারির ছেলে হয়েছে। সেই ছেলে নিয়ে পারি কাজ করতে যায় বাবুঘর। সারা দুপুর ধু-ধু ডাঙাল নয়ত মাঠে মাঠে ঘুরে কাঠ আর গোবর কুড়ায়। মনোজ তার বাপের ঘরে ফিরে গেছে। বাপ তাকে চাকরি পাইয়ে দেবে। সাঙা করবে মনোজ।

'দিদির সি চ্যাহারা নাই গঁ মা। এই কাঠি হয়্যা গেছে শরীলট। ছিল্যাট দুষ্ট হইচ্যে খুব। দিদির খুব কষ্ট।'

গেল ফাগুনে বিয়ে হয়েছে শাটির। জামাই রিকশা চালায়। সুখীই চেয়েচিন্তে বিয়ে দিয়েছে। তেমন কিছু দিতে পারে নি। ওর নিজের গয়নাগাটি বলতে মায়েব দেওয়া রুপোর বিছেহারটাই আছে। ওটা ও অশ্কার বউকে দেবে। বাবুঘরের শাশুড়িদের মত। তা জামাই ভাল। মেয়েকে মারধর করে না। স্বাস্থ্য ভাল। কাজকাম করে। পরব ছাড়া মদ খায় না। শাটিকে কাজ করতে দেয় না। নিজের ঘর আছে। ভাই আছে একটি। বাপ নেই মা আছে। বিয়াআলা বোন আছে তিনটি। এমন পাত্র জোটাতে সুখীকে কম হ্যাপা পোয়াতে হয় নি। চিতলডাঙায় ওর মাসির বাড়ি, মাসিই সম্বন্ধ আনে, ছেলের বাড়ি বৃন্দাবনী।

মেয়ের বিয়েতে বনমালী নেমন্তন্ন খায়। মাংস, কুমড়োর ঝাল, কয়েক থাবা বোঁদে আর মদ খেয়ে সে কোমর বেঁকিয়ে নাচতে শুরু করলে সুখী ওকে বের করে দেয়। সেদিন বনমালীর বড়ই অপমান হয়। মেয়ে-জামাই থাকতে সে সামলে ছিল. কিন্তু শাটি শ্বশুরঘর যেতেই সেও উধাও হয়। ভাদুর ঘরেও যায় নি। কাঁজি খেয়েছিল হুই মাজিবাবুর পুখর ধারের ঠেকে। রাতে বিজয়ের দোকানের উলটোদিকে জগন্মাতা ভাণ্ডারের চওড়া রোয়াকের একশ পাওয়ারের বাল্বের নিচে শুয়েছিল। তিনটি নেড়ি কুকুর ও দুজন ভিখিরিসহ। এমনিতে এখানে ও শুতে চায় না, কেননা দোকানের মালিক শ্যামাপদ তাকে দেখলে ঠেঙিয়ে সত্যি সত্যিই 'বিন্দাবন' দেখাবে। শ্যামাপদর দুর্গসদৃশ বাড়ি, উশকোমুশকো চার জোয়ান ছেলে। বড়টি কলিয়ারিতে একটি মুদিখানা কাম রেশন শপ চালায়। মেজটি এই দোকানে বসে। তৃতীয়টি হিন্দুস্থান কেবলস, কনিষ্ঠটি একটু দলছুট। তার ঘাড় অবদি লম্বা চুল, গলায় সোনার হার। সকাল বিকেল কাইনেটিক হোন্ডায় চেপে সে তার টিভি-র দোকানে যাতায়াত করে।

এও যথেষ্ট নয়—বনমালী জানে শ্যামাপদর দরকারের চাইতে অনেক বেশি টাকা আছে এবং সেই টাকা রক্ষা করবার জন্য তাকে মাঝে মাঝে বন্দুক নিয়ে ছাদে পাহারা দিতে হয়। আগে বনমালী ভয়ে ভয়ে এখানে শুত। কেননা বিজয়ের দোকানে জায়গা ছিল না—এখন বিজয়ের দোকানের পাশে অনেকগুলো দোকানঘর হয়েছে। ঘরগুলো এখনো ভাড়া হয় নি। সেই ঘরগুলোর সামনের টানা বারান্দায় সে তার ক্রুদ্ধ, অভিমানী, অকালে জীর্ণ শরীরটা রাতভর ফেলে রাখতে পারে। কিন্তু তাতেও ভয়। দোতলা বাড়ির কারো চোখে পড়লে পরের দিন বিজয়ই তাকে ধমকাবে। ধার দেবে না। বাকি পয়সা

শোধ করতে বলবে।

এত অপমান আর অভিমান ছাপিয়ে ভয়টাই যেন বনমালীকে পেয়ে বসে। নিছক এক শারীরিক ভয়।

অশ্‌কা আর জবাকে ভাত আর মাংস দেয় সুখী। অশ্‌কা, ছোট তখন, মাংসকে বলত 'চী'। বাবুঘর থেকে রইব্‌বাবে মাংস আইনলেই বইলথ, 'চী দে।' দুজনের পাতে দুটো ঠ্যাং দেয় সুখী। জবা এক দু গ্রাস খেয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকে।

'কী হল? খা?' সুখী বলে।

'আব খাব নাই। ইখানট বাইজছে গঁ মা।' জবা হাত দিয়ে ঘাড় দেখায়। পা দেখায়, সুখী দেখল দুটো পাই ফুলেছে ওর। বয়স আন্দাজে তেমন বাড়ে নি মেয়েটা! কেমন জানি শুকনো শুকনো দেখায় ওকে। মেয়ের পাতের ছড়ানো ভাতগুলো দেখে সুখীর মন খারাপ হয়ে যায়। 'লষ্ট কইরলি ভাতগুলান? কীসকে খাবি না শুনি? শরীল রইবেক?'

জবা ভয়ে ভয়ে এক গ্রাস মুখে দেয়। অনিচ্ছা ওর সমস্ত মুখ ছেয়ে থাকে। সেদিকে তাকিযে সুখী বলে, 'থাক্‌ খাত্যে হব্যাক নাই। বিছনা পেড়ে দি। শুয়্যা পড়।'

ছেলেমেয়েকে শুইয়ে সে আর ববিতা খায়। স্বামীর ভাত আর মাংসের বাটি ঝুড়ি চাপা দিযে বেখে ওরাও শুয়ে পড়ে। ববিতা সন্ধেবেলাতেই একঘুম ঘুমিয়ে নেয়। ঘুম-চোখে ভাত খেয়ে সে আবার ঘুমায়।

কত রাত কে জানে বনমালীর ভাঙা গলার স্খলিত চিৎকার আর অসহিষ্ণু দরজা ধাক্কানোর আওযাজে সুখীর ঘুম ভাঙে। ঘুম চোখে, এতদিনের অভ্যাসেই ও দুয়ার খোলে। দরজা খোলার সাথে সাথে চৈতালি বাতাসে ধেনোর তীব্র ও কটু গন্ধ ঘরে ঢুকে পড়ে। বাউরি মরদ মদ খেয়েছে, বাউরি নারী তাকে সামলাতে পারে, কিন্তু বনমালীকে ধরবার আগেই সে ধপাস করে আলগা একটা বস্তার মত ভারী শব্দে পড়ে যায়। তার পায়ের ধাক্কায জল ভরতি প্লাস্টিকের বালতি উলটে বিছানা ভেজে।

'মরণ তুমার, ছিল্যাগুল্যান ভিজা গেল্য যে!' সুখী দুহাতে স্বামীকে ঠেলে দেয়। বনমালী ওপাশে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। অশ্‌কা ঘুমের মধ্যে কঁকিয়ে ওঠে। মেয়ে দুটি অভ্যাসেই আধো ঘুমে ওপাশ ফিরে ঘুমে তলিয়ে যায়। রমণী ত এখন জননী, বিছানা ঠিক করে। টেনে টেনে ভিজা কাঁথা বদলে দেয়। নিপুণ হাতে ছেলেমেয়েদের শুকনো ধারে এনে ওদিকের কাঁথা পালটে আবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুইয়ে দেয়। দরজা খোলা আছে দেখেই যেন বাইরে যায়। হালকা হয়ে এসে দরজা এঁটে দেখে ওর বালিশে বনমালী শুয়ে। ও দেয়ালের দিকে মুখ করে বিনা বালিশেই শোয়।

একটু পরে ও স্বামীর শরীরের কাছে আসে। বনমালী আধো ঘুমে ওকে নিজের শরীরের নিচে নিয়ে নেয়। জননী এখন রমণী হয়ে ওঠে আর রমণী হতে হতে টের পায় তার শরীরে এখনো কত তৃষ্ণা। তবু তৃষ্ণা মেটানোতেও তার ভয় লাগে। শরীরেব ভয়। শরীরেব জন্য ভয়। শরীরে সুখ আর ভয় নিয়ে সে স্বামীর কানের কাছে মুখটি নিয়ে

বলে, 'অশ্কার বাপ, ভাত খাবেক নাই?'

সকালে সুখী বলে, 'ডোলটো ভাইঙলে লিশা কর‍্যা!'

বনমালী ঘুম থেকে উঠে দোকান থেকে চা এনে খাচ্ছিল। বউয়ের কথার জবাবে বেশ মেজাজেই বলে, 'বাবুঘরেব টেরিকটেব প্যান নাই? কিনে লিস আর একটো।

বনমালীর নাম করে সুখী শার্ট প্যান্ট গেঞ্জি আনে কাজের বাড়ি থেকে। সেগুলো দিযে এটা ওটা কেনে। তাও অনেকগুলো জমলে তবে ত কেনা। আর অনেকগুলো জমা হতেও ত অনেকদিন লাগে। আজকাল বাবুদের বউরাও সেযানা হয়েছে। চট করে কিছু দিতে চায় না। নিজেরাই কেনে বাসনপত্র, ঝুড়ি, কুলো এইসব। যেগুলো দেয় সেগুলো একেবারেই বাতিল জামাকাপড়। কাজেই স্বামীর খোঁচা দেওয়া কথায় সুখী রেগে যায়, 'আমার বাপের ঘরের জিনিশ ব্যটে? কিন্যে দিথ্যে লারো ত ভাঙ্গিলে কীসকে?'

'তুর কুন নাগরের ডোল ব্যটে? ভেঙেচ্যি বেশ কর‍্যাচি। হারামজাদী খানকী মেয়েছেল্যা।' কালকেও বনমালী জুয়ায় হেরেছে।

'ব্যটে, আমি লাগব জোটাই? কুন লাগরের সাতে রা কেড়েচ্যি বলো?'

'ভদ্দরলোকের মাগীদের পারা সতী হচ্যিস? ঢলানী ব্যটে তুই।' কী যেন হয় সুখীর—উঠনের কোণ থেকে ঝাঁটা তুলে আনে। বলে, 'ফের ও কতা বলেচ্য কি ঝ্যাটা মাইরব। য্যাখন গতর ছিল ভদ্দরলকের বউদেব চেয়্যা ঢের সতী ছিলুম। গতর বেঁচে খাই নি কুনদিন তুমার বউদিদির পারা।'

'কী বইললি?' ঝাঁটাটা কেড়ে নিতে যায় বনমালী। সুখীর আঁচল টেনে ধরে। ঝাঁটাটা কেড়েও নেয়। টানাটানিতে সুখীর কাপড় খুলে যায়। শুধু ছোট একটা শায়া পরনে উদোম বুকে চুল ছড়িয়ে ও শ্মশানের বিলাপে কাঁদে। বনমালী ওকে এলোপাথাড়ি ঝাঁটা দিয়ে মারে। সুখী মাটিতে পড়ে গেলেও মারে। লাথি মারে ওর উপুড় হওয়া নগ্ন পিঠে। পাছায়। জবা আর অশ্কা ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দোরগোড়ায়। ববিতা দৌড়ে এসে ঝাঁটাটা কেড়ে নিয়ে বাপের পিঠে বসিয়ে দেয়। 'লইজ্জা নাই তুমার? বাবা হইচ্য? মাকে মার কীসকে? খবরদার, আর মারো যদি!'

মেয়ের হাতে মার খেয়ে বনমালীর নেশার অবশেষটুকুও ছুটে যায়। ববিতা দাঁড়িয়ে থাকে, অপমানিত ভূলুণ্ঠিত মায়ের শরীরের পাশে। ববিতার চোখদুটো বিশাল আর চোখের শাদা অংশটুকুতে রক্তাভ শিরা। তার মাঝখানে ওর খয়েরি মণি দুটো জ্বলে। নাকের পাটায় লাল পাথরের নাকছাবিও জ্বলে। ওর পরনে ম্যাক্সি তার নীচে ওর উদ্ধত কিশোরী শরীরটি যেন প্রতিবাদ আর প্রতিরোধে টানটান হয়ে থাকে।

বনমালী বেরিয়ে যেতে যেতে বলে, 'যাহ; আজ ছেড়্যা দিলম।'

নয়

একটি গাছ, একটি প্রাণ

কদিন থেকেই কিরীটের দৌড়োদৌড়ি চলছে। অফিসের সামনে দুপুর থেকেই বিস্তর ছেলেমেয়ে। বেশির ভাগই প্রাইমারি স্কুলের। সবার ইউনিফর্ম নেই—এক এক জনের এক এক রকম জামাপ্যান্ট, ফ্রক, স্কার্ট। কারো কারো পায়ে কেড্‌স্, কারো হাওয়াই চটি, কেউ ধুলো পায়ে। বাউরিপাড়ায় কিছু কয়লা কুড়নো বাচ্চাও স্বতঃস্ফূর্ত জুটে যায় কেননা মিছিল 'ঘুর‍্যা আলে শায়েব পাঁরুটি লজেন দিব্যে।'

সমাজভিত্তিক বনসৃজন প্রকল্পের বয়স ত বেশি না। কিরীটের দুই ছেলেমেয়ের কনিষ্ঠটি কন্যা—তার বয়স এই প্রকল্পের চাইতে বছরখানেক বেশি। দার্জিলিং-এ কিরীটের ট্রেনিং পর্ব। সেই কথা মনে রেখে মেয়ের নাম তিস্তা। তিস্তার সারা শরীরে যেমন শৈশবের সজীবতা ছড়িয়ে থাকে এই প্রকল্পের শরীরেও তেমনি টাটকা ও নতুন গন্ধ।

কিরীট নিজের ছেলেকে দাঁড় করায় সবার আগে। তার হাতে একটি হাতেলেখা পোস্টার ধরিয়ে দেয়। এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার পেয়ে বাপ্পা যেন আরো ইঞ্চিখানেক লম্বা হয়ে ওঠে। তার সমস্ত শরীরে ঝলমল করছে আলো আর আনন্দ। বাপ্পা খুব প্রাণবন্ত ছেলে, স্বাস্থ্যে শক্তিতে সে স্কুলের সেরা। তার কচি হাতের মুঠোয় দৃঢ়ভাবে ধরা থাকে 'একটি গাছ, একটি প্রাণ' শ্লোগানটি। কয়েক দিন ধরেই তার বাবা আর মা-র সঙ্গে বসে বসে সে এই সব ফেস্টুন আর ব্যানার লেখায় হাত লাগিয়েছে। তার হাতের লেখা ভাল বলে মায়ের সুপারিশে সে কাজটা করার অনুমতি পায়। ঠাকুমা আঠা বানিয়ে দিয়েছেন। বাবা আর নরেশকাকু কাঠির সঙ্গে কাগজগুলো সেঁটেছেন। এখন শাদা শার্ট আর প্যান্ট পায়ে শাদা মোজা শাদা কেডস বাপ্পা শাদার ওপর সবুজ রঙে লেখা ফেস্টুন নিয়ে লম্বা লাইনটার প্রথমে দাঁড়িয়ে।

বাপ্পা তিস্তার বাবা ফরেস্ট বীট অফিসার কিরীট খান মেদিনীপুরের ছেলে। যদিও সে এস সি. এস টি কোটায় চাকরি পেয়েছে, কিন্তু তা না পেলেও সে এমনিতেই চাকরিটা পেত। মেদিনীপুরের কুটির শিল্প নাকি লেখাপড়া এমন একটা কথা কিরীটের বাবাই বলতেন। পড়াশুনায় কিরীটের কৃতিত্ব বেশি না খেলাধুলায় এটা ঠিক করা শক্ত। তার বুকের ছাতি এতই চওড়া যে পাঁচ ফুট ন ইঞ্চিতেও তাকে মাঝারি উচ্চতার মানুষ মনে হয়। তার হাতের থাবায় যেন একটা মোষের গর্দান ধরা যায়। অমন চওড়া কবজিতে যেন ঘড়ির ব্যান্ড আঁটে না। কিরীটের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই সাধারণের চাইতে তীক্ষ্ণ। তার চোখ, কান, নাক আর সর্বাঙ্গ দিয়ে সে তার কর্তব্য করে বলেই হয়ত সে আসার পরে চিত্তরঞ্জন থেকে সামডি কলিয়ারি, ওদিকে দেন্দুলাও ছাড়িয়ে, এধারে বৃন্দাবনী, সব জায়গায় বিনবিভাগের লাগানো গাছের কৃত্রিম অরণ্য তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু এইসব গাছপালা লাগাতে আর তা রক্ষা করতে গিয়ে সে এক আশ্চর্য সত্য আবিষ্কার করে।

এখানকার রুক্ষ মাটির মত মানুষজনের মনেও সজীবতার অভাব। এত প্রকৃতিবিমুখ মানুষজন সে কোনোদিন দেখে নি। কী নির্মমতায় এরা গাছপালা কেটে নেয় প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে তা নিজের চোখে না দেখলে ওর বিশ্বাস হত না। ও ত উত্তরবঙ্গের অরণ্যে চাকরি করেছে। সেখানেও কাঠের জন্য নির্মমভাবে গাছ কাটা হত কিন্তু সে ত ছিল চোরাকাঠ চালান দেবার ব্যবসায়ীদের ব্যাপার। কিন্তু এখানে সাধারণ মানুষ যেখানে প্রকৃতিকে নষ্ট করে, ভাবে না এই ধ্বংসের পরিণতি কী তা কিরীট আগে দেখে নি। সে ত জানে এবং জানিয়েও দেয় প্রচারে, ঘোষণায়, সামাজিকতায়, মেলামেশায় যে এই শিল্পাঞ্চলের পরিবেশ সুস্থ রাখতে অরণ্যের কতখানি প্রয়োজন। সবুজ গাছপালাই ত নীলকণ্ঠের মত এই বিষ শুষে মানুষের জন্য বাতাস নির্মল করতে পারে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বীজ আর চারাগাছ দেবার হিশেব তার জানা। কিন্তু সে হিশেবের চাইতে জরুরি হয়ে পড়ে তারই তত্ত্বাবধানে বনবিভাগের লাগানো গাছপালার হিশেব। কেননা ব্যক্তিগতভাবে যারা চারা বা বীজ নেয় তার মরণবাঁচনও ব্যক্তির দায়িত্বে থাকে। কিন্তু সরকারি গাছপালার হিশেব আর গাছ মরে যাবার কৈফিয়ত সরকারি অফিসারকেই দিতে হয়।

কিরীট লাইন ঠিক করে। এতই শৃঙ্খলাহীন বাচ্চাগুলো যে বারে বারে লাইন বেঁকে যায়। ভেঙে যায়। ঠেলাঠেলি হয়। কথা বলে সবাই। কিছু বাচ্চা মাইথনের ব্যাক ওয়াটারের গায়ে লাগানো গ্রামগুলো থেকে এসেছে। ওখানে বনসৃজন প্রকল্পের লাগানো সাতাশ হাজার চারা কোমর সমান উঁচু হয়েছে। তার খানিকটা আগে এন টি পি সি-র এক কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। ওখানে নাকি কলোনিও হবে। কিরীট ওর বউ তপতীকে বলে, 'আমরা খেটেখুটে গাছ লাগালাম আর এন টি পি সি-র বাবুরা হাওয়া খাবেন।' বাপ্পা বলে, 'ওরা পরিবেশ নষ্ট করবে কারখানা করে।' সাধারণত ইউক্যালিপটাশই বেশি লাগানো হয়। বনবিভাগ ত যেখানে যেখানে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ বা আরো নানা জ্যামিতিক ক্ষেত্র জুড়ে ঠাসা গাছ লাগায় বা রাস্তার দুধারে সার বেঁধে দাঁড়াবে বলেও লাগায় তার প্রায় সবই ত ইউক্যালিপটাশ। কিন্তু এই সাতাশ হাজারে পলাশ আছে। গোলমোহর, কৃষ্ণচূড়া, বাদাম, আকাশমণি, মদারি, শাল, মহুয়াও আছে।

পঞ্চাশ ষাট জনের লাইনটা ঠিক হলে কিরীট হাঁক দেয়, 'গিরিধারী, শ্লোগান দাও।'

রিকশায় মাইক ও গিরিধারী মাজি। গিরিধারী গগনের ভাইপো, সম্প্রতি বনবিভাগের কর্মী। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ। গগনের দোতলা বাড়ির নিচতলায় রাস্তার দিকের ফ্ল্যাটে কিরীটের অফিস আর সংসার। সেই সুবাদেই গিরিধারীর চাকরি এমন একটা কথা গাঁয়ের কেউ কেউ বলে থাকে।

তা যেভাবেই চাকরি পাক না কেন গিরিধারী কাজের ছেলে। বনবিভাগের লাগানো গাছপালা দেখভাল করায় গিরিধারী এক নম্বর। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে চারাগাছ বিলি করা একরকম কাজ আর বনবিভাগ থেকে সরকারি দায়িত্বে রাস্তার ধারে নয়ত ডাঙাল জমিতে গাছ লাগানো আর একরকম কাজ। এতে যেন ভালবাসার মতই, ভালবাসা

বাঁচিয়ে রাখার মতই সযত্ন লালনের নিশ্চয়তা দরকার। ভালবাসা ত ঘটে যেতে পারে কোনো আবেগের অপ্রস্তুত আকস্মিকতায়, তেমনি কোনো আবেগের আঘাতে ইউক্যালিপটাশ কিংবা কৃষ্ণচূড়া বা শাল বা শিশুগাছের চারা রোপণ করা যায় একা একা বা কোনো সমবেত উৎসবের মত্ততায়। কিন্তু দিনের পরে রাত আর রাতের পরে দিন ভালবাসা উজ্জীবিত রাখতে ত ভালবাসারই সেচন দরকার। ক্রমাগত সেচন দরকার। বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করবার জন্য সযত্ন সতর্কতার বেষ্টনী দরকার। গাছ বাঁচানো আর বড় করার জন্যও ত এমন ভালবাসার আর যত্নের দরকার। অথচ কিরীট দেখে প্রয়োজনের তুলনায় লোক কম। পাহারাদার কম। যারা আছে তারা ত শুধু ডিউটি করে। চাকরি করে। অথচ এই কাজে ডিউটি আর চাকরি শব্দ দুটোকে অন্য অর্থে ভাবতে হয় নইলে এই বিরাট কর্মযজ্ঞ অনেক সরকারি কাজের মতই ফাইলের শব্দ হয়ে থাকবে—তাতে মাটি, জল, বাতাসের স্পর্শ ও গন্ধ থাকবে না। কিরীটের গত বছরের অভিজ্ঞতা মনে পড়ে যায়—

দশ

ফ্ল্যাশ ব্যাক—কিরীটের অভিজ্ঞতা

মাঝে-মধ্যেই কিরীট খবর পাচ্ছিল চিত্তরঞ্জনের কিছু লোকের গরু-মোষ বনবিভাগের লাগানো চারাগাছ খেয়ে ফেলছে। বিহার থেকে আসা গোয়ালাদের গাইবাছুর আর মোষই বেশি। পাহারাদারদের চোখ এড়িয়ে কী করে এসব ঘটে কিরীট বুঝতে পারল না। বনবিভাগের পাহারাদারদের চেহারা ভীতিপ্রদ নয়, ইউনিফর্মও নেই, নিতান্ত নিরীহ চেহারাআলা স্থানীয় লোকদের ভাগলপুরী বা জার্সি গরু পাত্তাই দেয় না। তাদের মালিকরা ত দূরের কথা। কিন্তু সি এল ডাবলিউ-এর ত নিজস্ব পাহারাদার আছে। তা আছে কিন্তু গাছপালা রক্ষার এই নতুন দায়িত্ব এখনো পর্যন্ত নাকি কাগজে-কলমে সেই রক্ষীদের ওপরে বর্তায় নি। ভেবেচিন্তে কিরীট প্রথমে আবেদনের রাস্তায় নামল। রিকশায়, জিপে মাইক নিয়ে জনগণের উদ্দেশে হিন্দিতে, বাংলায় এভাবে গরু-মোষ ছাড়তে বারণ করল। তিন-চারটে সভাও হল, তাতে পরিবেশ দূষণ এবং গাছপালা লাগানোর উপকারিতা বিষয়ে স্থানীয় এম এল এ, পঞ্চায়েত প্রধান, বি ডি ও এবং কিরীটও বক্তব্য রাখল। এখানকার মানুষজন বড় বিচিত্র। তাদের ভাবখানা এই, 'শায়েব ঠিকেই বইলচ্যে। গাচগাচালি থাইকল্যে আমাদিগেরই ভাল ব্যটে।' অথবা 'হাঁ, হাঁ ইয়ে ত বিলকুল সাচ হ্যায়, পেড় বচানা ত হমারা ডিবটি হ্যায়।' 'কিন্তু' কিরীট নিজেকেই নিজে বলে, 'সো হোয়াট?'

আবার খবর আসে, 'স্যার, একবার চলুন।'

গত পুজোর ঠিক আগে এক বিকেলে কিরীট এরকম একটা খবর পেয়ে আচমকা হানা দেয় বনরক্ষীবাহিনী নিয়ে। প্রায় শ দুয়েক গরু-মোষ সরকারি জমিতে বিচরণ করছে

দেখা গেল। তাদের মালিকরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেছিল। স্বয়ং শাহেবকে দেখে তারা উঠে দৌড়তে শুরু করে। দুজনকে ধরা গেল, তৃতীয় একজনের পেছনে গিরিধারী একাই দৌড়ে গেল তিনশ-সাড়ে তিনশ মিটার এবং তার চাইতে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে আড়াইগুণ সেই ছাপরাবাসীকে প্রায় হিন্দি সিনেমার নায়কের কায়দায় কাবু করে। অন্য কর্মীরা সেই ফাইটিঙের দৃশ্য উপভোগ করছে দেখে কিরীট ধমক লাগায়। সিনেমার দৃশ্যের মতই তিনজন বন্দীসমেত শ দুই গরুমোষের পালকে খেদিয়ে, আগুপিছু ঘিরে, বনবিভাগ খানিকটা পথ নিরুপদ্রব চলে। রাস্তার দুধারে লোক দাঁড়িয়ে যায়। কারখানা ছুটির সময় রাস্তার সাইকেল আর টু-হুইলারের ভিড় জমে ওঠে। সে ভিড় ঠেলে বনবিভাগ চট করে যেতেও পারে না। সেই মন্থরতার সুযোগে আর-এক বাহিনী, সশস্ত্র, লাঠি, রড, টাঙ্গি নিয়ে এদের ঘিরে ফেলে। এরা কোথা থেকে এল বোঝার আগেই কিরীটের মাথাটা দুফাঁক হয়ে যেত, যদি না গিরিধারী আগে থেকেই টের পেয়ে তার সেই শরীর নিয়ে সময়মত পুলিশবাহিনী আনত।

সেই মামলা, গোয়ালাদের বিরুদ্ধে বনবিভাগের মামলা আসানসোল কোর্টে ঝুলে আছে। যেমন থাকে এইসব মামলা। সি এল ডাবলিউ-তে কাজ করে এমন লোকেদের বিরুদ্ধে তারা ক্ষমা চাইলে কিরীট মামলা তুলে নেয়। সে ত এখানকার মানুষের ক্ষতি করতে চায় নি। সে শুধু এখানকার মানুষজনকে শুদ্ধ আলো-বাতাস-জল দিতে চেয়েছিল। সেই শুদ্ধতার জন্য তার চেষ্টার অংশীদার করতে চেয়েছিল। এ তার কর্তব্য, কোনো ব্যক্তিগত সুখ চরিতার্থতা নয়।

এগার

মিছিলে অশ্‌কা

অশ্‌কা একটা শাদা জ্যালজেলে হাফশার্ট আর রঙজ্বলা নীল হাফপ্যান্ট পরে লাইনে দাঁড়িয়েছিল। গতবছর ও স্কুলে ভরতি হয়েছে। বাউরিপাড়ার উলটোদিকে যে রাস্তাটা 'ওয়েলকাম টু রূপনগর' লেখা বোর্ডটার দিকে গেছে সে রাস্তার শুরুতেই বাঁ হাতে ক্লাশ ফোর পর্যন্ত রূপনারায়ণপুরের বিনা বেতনের সরকারি স্কুল। দুটো ঘর, একটা বারান্দা, একটা বাথরুম আর তিনজন প্রায় একমাপের শিক্ষিকা নিয়ে এই প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুলের মাঠ নেই। সামনে একটু খোলা জমিতে একটা টিউবওয়েল। তাতে জল ওঠে কিন্তু সে-জল এত ঘন লাল যে তাকাতেই ভয় করে। ছেলেমেয়েরা রাস্তা পার হয়ে খানিকটা হেঁটে বিজয়ের দোকানের সামনের কল থেকে জল নিয়ে আসে দিদিমণিদের জন্য। বাউরি ছেলেমেয়েরা জল আনার কাজ পায় না, ওরা পালা করে স্কুলঘর, বারান্দা ঝাঁট দেয়। এগারটার বাসে দিদিমণিরা আসেন। আড়াইটের সময় স্কুল থেকে বেরিয়ে বাসের জন্য ম্যাচিং ছাতা মাথায় বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকেন।

কেন জানি বনমালীর শখ ছেলেকে পড়ালিখ্যা শিখাবেক। তা দেরিতে ভরতি হলেও

এক বছরের অশ্‌কা অনেকখানি শিখে ফেলেছে। শেলেটে নিজের নামটি লিখতে পারে। একের পিঠে দুখানা শূন্য পর্যন্ত গুনতে পারে। লিখতেও পারে।

অশ্‌কার সামনে-পেছনে দুজন মেচলাডির ছেলে। সামনের জনকে ও চেনে। মতিয়াব রহমান। মতি ড্যামে নৌকো করে মাছ ধরে। নিজের নাম লিখতে না পারলেও মাছের হিশেব জানে। পয়সাকড়ির হিশেব জানে। তের চোদ্দ বছরের মতির ফরশা হিলহিলে শরীর। নৌকো বাইতে, হাল ধরতে, লগি ঠেলতে, মাথার ওপরে পাক মেরে জাল ফেলতে আর দুহাতে টেনে টেনে মাছ ভরতি সেই জাল গোটাতে মতি 'চ্যাম্পিয়ান'। বৃন্দাবনীতে দিদির বাড়ি বেড়াতে গেলে মতির সাথে আলাপ হয় অশ্‌কার। মতি সাঁতার দেয়। এক ডুবে কতদূর যায় মতি ভয়ে অশ্‌কার গলা শুকিয়ে গেলে ও শোনে অনেকটা দূরে মতি ভেসে উঠে চেঁচিয়ে হাত নাড়ছে। মতি 'শায়েব'কে মাছ দেয় ওদের ওখানে গেলে। শায়েব লাউ, কুমড়ো, ট্যাড়শ, ভুট্টা লাগিয়েছিল মেচলাডিতে। ত সেখানকার লোকই ত এইসব ঘরে নিয়ে গেল। শায়েব একটাও নেয় নি। কিরীটের কথায় মতিরা না এসে পারে?

রূপনারায়ণপুরে এমন একটা মিছিল নতুন। তা বলে মিছিল নতুন নয়। কারখানা আর মিছিল ত পাশাপাশি থাকে। কারখানা থাকলে শ্রমিক থাকে। শ্রমিক থাকলে মিছিল থাকে। সে-মিছিলের ধরন এখানকার মানুষ জানে। সে-মিছিলের ধ্বনি এখানকার মানুষের শোনা। এইসব মিছিল বেশির ভাগই সাইকেলে হয়। ট্রাকে-টেম্পোয় মিছিলের, সভাসমিতির লোকেরাও যায় এটাও কিছু নতুন নয়। সেই চেনাজানা অভিজ্ঞতার বাইরে এমন একখানা পায়েহাঁটা মিছিলের অচেনা ধ্বনি রাস্তার দুধারে মানুষ টেনে আনল। পঞ্চাশ-যাট জন ছেলেমেয়ে আর পনের-কুড়ি জন সাবালক মানুষ, একটি রিকশা, একটি মাইকসমেত এই অদ্ভুত মিছিল দর্শকদের কৌতূহল আর কৌতুক জাগায়।

কিরীট এসব দেখে। বোঝে। কিন্তু এই দেখা আর বোঝাটা দেখতে দেয় না। বুঝতে দিতে চায় না। মাঝে মাঝে পেছন ফিরে সে দেখে লাইন ঠিক আছে কিনা। প্রতিধ্বনি ঠিকমত উঠছে কিনা। আর তাতে এটা বুঝে ফেলে মিছিল এখন নিজস্ব গতি পেয়েছে। তার ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতায় সে জানে মিছিলের শরীর আর প্রাণ ব্যক্তির চাইতে সামগ্রিক বেশি। সেই শরীর আর প্রাণ পেলে মিছিল এক সুরে বাঁধা হয়। সেই সুরে স্থিত হওয়াই মিছিলের সার্থকতা। কিরীট নিশ্চিন্ত মনে হাঁটে।

কিন্তু মিছিলের শিশুরা ত শিশুই। তারা কেউ 'টিপিনের' জন্য হাঁটে। কেউ আনেন্দ, কেউ-বা কৌতূহলে।

অশ্‌কা একটু দেরিতে আসায় ফেস্টুন পায় নি। চলতে চলতে সে রাস্তা থেকে একটা গাছের ডাল কুড়িয়ে পায়। বেশ কয়েকটা সবুজ পাতাসমেত। সেই ডালটাকে নিশানের মত আকাশে তুলে সে প্রতিদিনের চেনাপথে এক অচেনা হাঁটে। শাদা শালটার গায়ে লম্বা সবুজ পাতাগুলোর নিচে এই বাউরি বালক, স্বপ্নাতুর ও আনন্দবিহ্বল হাঁটে।

ব্রিজের ওপর দিয়ে মিছিল হাঁটে। ডাইনে নেমে যায় মিহিজামের দিকে চলে যাওয়া

খোয়া-ওঠা রাস্তা দিয়ে। লেভেল ক্রশিং পেরিয়ে ডাবরমোড় হয়ে ডাইনে ঘুরে আবার বনসৃজন প্রকল্পের অফিসের সামনে আসে।

রাস্তার ধারে ন্যাড়া চৌকির ওপরে বেডকভার বিছিয়ে মঞ্চ। বি ডি ও, কিরীট, অঞ্চলপ্রধান আর বনবিভাগের আর-এক অফিসার বক্তৃতা করেন। কিরীট সলজ্জ কণ্ঠে 'চলো ভাই গাছ লাগাই' স্বরচিত কবিতা পাঠ করে। কবিতাটা ও 'বনবাণী' পত্রিকায় পাঠিয়েছে।

কিরীটের মা বাচ্চাদের আর বনবিভাগের কর্মীদের পাউরুটি ডিমসেদ্ধ, কলা, লজেন্স, ছাড়াও বাড়ির ঠাকুরের প্রসাদ দেন।

বার

অশ্‌কার ভূগোল

ইশকুল ছুটি আড়াইটে বাজতেই। কিরীট তার ছেলেমেয়েকে এই স্কুলেই দিয়েছে। আর কোনো সরকারি অফিসারের ছেলেমেয়ে এই স্কুলে পড়ে না। কেবলস-এর অফিসারদের ছেলেমেয়েরা চিত্তরঞ্জনের ইংলিশ মিডিআম নয়ত কনভেন্টে পড়ে। কারখানার গাড়িতে কারো ছেলেমেয়ে আসানসোলেও যায় লোরেটো বা সেন্ট প্যাট্রিক্স-এ। ই সি এল-এর বাসেও কেউ কেউ যায়। কিরীট বলে, 'আমি মায়ের ভাজা ছোলা-বাদাম-মুড়ি খেয়ে বাংলা ইস্কুলে পড়ে যদি চাকরি পেতে পারি আমার ছেলেমেয়েও পারবে।'

বাপ্পা অশ্‌কার বয়সি হলেও গায়ে-মাথায় বড়। ইশকুলেও দু-ক্লাশ উঁচুতে পড়ে। স্কুল থেকে ফিরে ভাত খেয়ে তবলা বাজায়। ভোরে আর সন্ধ্যায় সংগীতবিশারদের প্রথম বছরের পরীক্ষার জন্য ভূপালী, ইমন, 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে' আর 'খেজুর পাতার নূপুর' অভ্যাস করে। রবিবার দুপুরে গানের দিদিমণি আসেন। তবলাও তিনিই শেখান।

বিকেলবেলা বাপ্পা খুব অসহায় বোধ করে। সবে সাইকেল চালাতে শিখেছে বলে সাইকেল চালাতে ইচ্ছে করে আবার নতুন ঘুড়ি-লাটাই কিনেছে বলে সেটাও না উড়িয়ে পারে না। ও একটা পঞ্চাশ পয়সা নিয়ে টস করে। তারপর ঘুড়ি-লাটাই নিয়ে সামনের ফাঁকা জায়গাটায় বেরয়। ঘুড়ির সুতোয় একটা কাগজে কী যেন লিখে আটকে দেয়। সুতো ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাগজটা সরসর করে ওপরে উঠে যায়। বাপ্পা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। অশ্‌কা জিগ্যেস করে, 'কী উড়্যাচ্যা গাঁ বাপ্‌পা?' 'ভগবানের কাছে চিঠি পাঠাচ্ছি।' বাপ্পা চোখ না সরিয়েই উত্তর দেয়।

অশ্‌কা একটা ছেঁড়া কাগজে নিজের নামটি লিখে আনে পরের দিন। 'আমার নামটো ভগমানের কাছকে পাঠাই দাও বাপ্পা।' ও বলে।

'ধ্যেৎ, তোর নাম ভগবান ছোঁবেই না।'

অশ্‌কা কাগজটা নিয়ে রাস্তা পেরিয়ে জগন্মাতা ভাণ্ডারের সামনে যায়। রাস্তা আর দোকানের মাঝে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। দোকানঘরের পাশে আরো তিনটে ঘর

তালাবন্ধ। মাঝে মাঝে লরি-ভরতি মাল এলে তালা খুলে বস্তাগুলো ডাঁই করে রাখা হয়। ঘরগুলোর সামনে লম্বা টানা বারান্দা। অশ্‌কা মাটিতে চোখ রেখে হাঁটে। জায়গাটায় রোজ সকাল বিকেল ঝাঁট পড়ে বলে ভেতর-বাড়ির উঠনের মত লাগে। দুটো বেঞ্চি পাতা হয় দুবেলাতেই। হাঁটতে হাঁটতে অশ্‌কা বাড়ির মস্ত ফটকের সামনে আসে। লোহার গেট বন্ধ। গেটের ওপারে শ্যামাপদর বাগান আর ছোটমতন একটা পুকুর। গেট পেরিয়ে দেড় মানুষ উঁচু টানা পাঁচিল। এদিকে জমিটা ঢালু। আগে ধান হত, এখন পুটুস আর বুনো লতায় ভরতি। পাঁচিলের গায়ে বিস্কুটের ছবির নিচে কাঁচা বড় বড় অক্ষরে লেখা 'গুলুকোশ বিস্কুট'।

'গুলুকোশ বিস্কুট'-এর নিচে অশ্‌কা তার এতক্ষণের খোঁজা জিনিশটা পায়। একটা সরু মাছ ধরা ছিপের মত লম্বা কাঠি। কাঠির গোড়াটা মোটা আর গায়ে খাঁজ থাকাতে ওর সুবিধা হল। কাঠির আগায় নিজের নাম লেখা কাগজটা বিঁধিয়ে দেয়। দুহাতে উঁচু করে ধরে কাঠিটা। হাওয়ায় কাগজটা ফরফর করে নড়ে, বারকতক ওই ভাবেই ও ঘুরপাক খায় জমিটার ওপর দিয়ে। শ্যামাপদ এসে বেঞ্চিতে বসলে ও আরো খানিকটা ছুটে মাঠে নেমে যায়। আলে আলে ছুটতে থাকে।

'ঘুড়ি দিও গঁ ভগমান। বাপ্পার পারা, লাটাই দিও একটি। অশককুমার বাউরি ব্যটি। অ... শ... ক কু-মা-র নামটো ভুলো না।'

একবার এমন ছোটায় মজা পেলে থামা যায় না। অশ্‌কাও থামে না। মাঠ পেরিয়ে ও রূপনগরের রাস্তায় ওঠে। রাস্তা দিয়ে সোজা ছোটে। বাঁয়ে বেঁকে। আবার ডাইনে। এবার এবড়োখেবড়ো লালমাটির পথ দিয়ে আবার মাঠে নামে। এই পথের দুধারে চিহ্ন দেখলে বোঝা যাবে জমিগুলো বিক্রি হয়েছে বা হবে। আর একটু গেলেই ধানখেত। ধান এখনো পাকে নি। সবুজ রঙই গাঢ় হয়েছে। ও আকাশে তাকাল। নীল আকাশে শেষবেলার রঙ। মেঘের গায়ে রঙ। ঘোর লাল নয়, সিঁদুরে লাল নয়, কমলা লাল নয়। সে লালের কেমন রক্তিমা তা ও বুঝতে পারল না। দুধারের সবুজে কেমন গাঢ়তা ঘনিয়ে আছে ও তাও বুঝল না। শুধু আকাশের লালে, আকাশের যেখানে নীল আর লালের সঙ্গমে বেগনি আভা, সেই বেগনি রঙে, ধানখেতের সবুজে ও এমন বিহ্বলতায় অকারণ, অকারণ খুশি হয়ে ওঠে যেন সেই খুশির আবেগেই ওর নিশান উড়িয়ে পথের ঢাল বেয়ে ছুটে যায় অনেকটা দূরের কালভার্ট পর্যন্ত। সেখানে বসে। নিচে তেমন জল নেই। বর্ষায় জল হয়। একটু দূরেই একটা পলাশগাছ। এখন সবুজ। সে সবুজের রঙ ধানখেতের চাইতে ঘন। যেন খানিকটা অন্ধকার সবুজ। কালভার্টের গায়ে রঙিন চক দিয়ে কে যেন লিখে রেখেছে—'আই লাভ ইউ'।

এই রাস্তা দিয়ে হাঁটলে হরিসাডি, কেঁদুয়াডি, আছডা, লহাটমোড় হয়ে ডাইনে মুক্তাইচণ্ডী পাহাড। অশ্‌কা মা-বাবার সঙ্গে মুক্তাইচণ্ডীর মেলাতে গেছে আগের বছর। পাহাড়ের নিচে অনেক মানুষের মাঝে খোলা আকাশের তলায় বাউল গান শুনেছিল। দিদিরা চুড়ি, ফিতে, কানের দুল কিনেছিল। বাবা ঘুগুনি, জিলাবি আর চা খাওয়ালেক

সবাইকে। রেতের বেলিতে দল বেঁধে হেঁটে হেঁটে ফেরা। ঘুরে বারে মেলায় অশ্‌কা মতিকে নিয়ে যাবে। আপাতত ও ভালবাসার সেতুর ওপর বসে থাকে।

অশ্‌কা ত বেশিদূর যায় নি। এদিকে মিহিজাম, ওদিকে দিশেরগড়। এদিকে 'আই লাভ ইউ', ওদিকে বৃন্দাবনী। এই ভৌগোলিক ক্ষেত্রটাও তেমন করে জানবার আগে বনমালী মারা গেল। মারা গেল ঠিক নয়; বরং বলা চলে, মারা পড়ল। বড় আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত তার মরণ।

তের

মানতের পাঁঠা

বনমালী হাটে যায়। মিহিজামের হাট। সন-তারিখ হিশেব করে দিনটা চিহ্নিত করে নেওয়া যায়, কিন্তু বনমালীর জীবনের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কোন দিনটা আলাদা করে, বিশেষ করে চিহ্নিত করা আছে? বনমালী কবে জন্মেছে তা তার জানার কথা নয়, কিন্তু তার মা বেঁচে থাকলে হয়ত বলত 'লকখীবারে কি সমবারে'। কেননা মাকে ত ছেলের জন্মবার মানতে হয়, জন্মদিন ভুলে গেলেও। তেমনি নিজের বিয়ের দিনটিও তার মনে থাকে না এমনই- লেপটে থাকে তা অন্যান্য দিনগুলোর সঙ্গে। 'যে বচ্ছর অবনী মইণ্ডল মইরল তার পরের সনের আষাঢ় মাসে আমার বিয়া হইচ্যে।' সুখী এভাবে বলে। এভাবে মনে রাখে। কেননা 'জন্মদিন', 'বিবাহবার্ষিকী' এসব শব্দ বাউরি অভিধানে নেই। বা থাকলেও অবান্তর। তেমনি কোনো-এক শনিবারের হাটে বনমালী তার ছোটমেয়ে জবার অসুখে মানত করা পাঁঠা কিনতে যায়।

চোদ্দ

জবার অসুখ

সুখী ঠিক করেছিল জবাকেও ইশকুলে দেবে। ববিতার পীড়াপীড়িতে। ও বলে, 'তুমি কাজ কইরচ, আমি বাবুঘরে খাইটচি বুনটকে পড়্যালিখা শিখাও। মণ্ডলকাকীমা বলে এট্টা পাশ দিলেই চাকরি হবেক।' জবারও খুব শখ। বলে, 'কবে ইশকুল যাব গঁ মা?'

সরস্বতী পুজোর দিন কেলাবের ঠাকুরের ওখানে জবার হাতেখড়ি। মণ্ডলকাকীমা শেলেট-পেনসিল ও পঁচিশ টাকা দিয়ে একটি নতুন জামা দেন। তারও আগে থেকে কিংবা সুখী খেয়ালই করে নি মাঝে মাঝেই জ্বরে পড়ত জবা। 'ছেল্যাপিল্যা থাইকলেই জ্বর হব্যাক উয়াতে অত ভাবনার কিছু নাই।' কিন্তু সরস্বতী পুজো পার হতেই জবা বিছানায় পড়ল। হাঁটতে পারে না। বাঁ পাটা ফুলে গেছে। পা সোজা করতে পারে না। ঘাড়ে ব্যথা। খালি বলে, 'ইখানট বড় বাইজছে গঁ।' সুখী 'হমিপাথি' করায় ওর পুরনো মনিব চৌধুরীর কাছে। চৌধুরীর এখন পড়তি সময়। ও আর দত্ত একই বছরে, একই

মাসে, একই তারিখে একই কারণে একসঙ্গে সাসপেন্ড হয়। এনকোয়ারির পর দত্ত চাকরি, বকেয়া বেতন ও কিছু উপরি সম্মান পায়। চৌধুরীকে সবাই মামলা করতে বলেছিল। চৌধুরী হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিশ শুরু করে। আসলে শুরুটা আগেই হয়েছিল আগে অবরে-সবরে করত এখন পুরোদমে করে। প্রায় দিনই ও বনমালীর উঠনে চারপাইতে বসে সন্ধের দিকে। বনমালী বা সুখী পয়সা নেয় ও ভাদুর ঘর থেকে একটি বোতল নিয়ে আসে। বনমালী থাকলে ওকেও দেয়। সুখী স্টীলের থালায় তেলেভাজা, কাঁচালঙ্কা পেঁয়াজকুচি দিয়ে যায়। মাঝে মাঝে জবা আর অশ্‌কার হাতে পঁচিশ তিরিশ করে পয়সা দেয়। সুখী বলে, 'উয়াদের হাতে পয়সা দিও না কাকু। লালচ হব্যাক।' চৌধুরী হাসে।

চৌধুরীর কাছে এক টাকায় তিনদিনের পুরিয়া। পনের যোল দিনেও জ্বর গেল না। তখন দেয়াসিনের শিকড়ি-বাকড়ি। এথান-সেথান। তাথেও ভাল হল না দেখে পঞ্চেতের মণ্ডলবাবুকে ধরে নার্সিং হমের ডাকতরবাবু। ডাকতারবাবু বলেন, 'পারবে দেড় বছর ওষুধ খাওয়াতে? শাকসিদ্ধ খাওয়াবে। পেঁপে সিদ্ধ। চুনো মাছ। দুধ খাওয়াবে। এক্স-রে করার দরকার নেই—অনেক খরচ। রক্তটা বরং পরীক্ষা করিয়ে নাও।'

রিপোর্ট দেখে ডাকতারবাবু ওষুধ লিখে দেন। মণ্ডলকাকীমা ওষুধের শিশিতে দাগ দিয়ে দেন। 'খালি পেটে একটা দাগ দেওয়া শিশির ওষুধ দেড় চামচ, কিছু খেয়ে দুটো দাগ দেওয়া শিশির ওষুধ দেড় চামচ, বুঝেছ বউ?'

'হঁ গো কাকীমা, বইলব?' সুখী বলে।

'বলো দেখি।' মণ্ডলকাকীমা বলেন।

'খালি পেটে লাল ওষুদ এক চামট, খাওয়ার পর জলের পারা ওষুদ দেড় চামট।' মণ্ডলগিন্নি শুধরে দেন, 'দুটোই দেড় চামচ। আর আজ রাতে এই ছোট শিশির ওষুধ সবটা। কাল পায়খানাটা দেখবে কৃমি পড়ে কিনা।'

এসব হল চার-পাঁচ মাস আগের কথা। তিন মাসে জবার পা ফোলা কমে। হাঁটতে পারে। ঘাড়ের ব্যথা কমে। জ্বর আসা বন্ধ হয়। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ও এখন কলে চান করতে যেতে পারে। ছোট বালতি করে জল আনতে পারে। কিন্তু ইশকুলে যাওয়া হয় না ওর।

'মেয়েছিল্যার লিখাপড়া কইরথে নাই। হাতেখড়ি দিথেই মেয়ের অসুক কইরল। ফের ঝদি ইশকুলে যাব বলিস ত ঠেঙাব।' সুখী মেয়েকে বলে।

জবার ওজন বেড়েছে এক কেজি। তা সুখী অত ওয়েট গেইন-টেইন বোঝে না। মেয়ের জ্বর কমেছে তাও শরীলে শক্তি নাই, মেয়ের পা ফোলা কমেছে তবু ঠ্যাং ঠিকমত পাততে পারে না কেন ও ভেবে পায় না। আর ভেবে পায় না বলে মাসকাবারি মুদিখানার আগের মাসের হিশেবের পয়সার সঙ্গে এ মাসের চালডাল তেলনুনের পয়সাও ফেলে রাখে। মেয়ের আর নিজের উপার্জনের টাকা থেকে বনমালীকে দুশ টাকা দেয়। এ টাকাটা ও দিতে পারল এই পাঁচ মাসের ওষুধ মণ্ডলকাকীমা কিনে দেন বলে। মাসে প্রায় একশ টাকার মত ওষুধ, কাকীমা মাইনের টাকাও কাটে নি।

·পনের

রাই জাগো রাই জাগো

হাট থেকে বনমালী দুশ টাকায় পাঁঠা কেনে। চেনা লোক বলে দেড়শ টাকা দেয়, বাকিটা কিস্তিতে, সুখীর দুশ বাদে ওর নিজের কাছে ছিল দশটি টাকা। সুখী কীভাবে টাকাটা জোগাড় করল বা দিতে পারল তা নিয়ে ও মাথা ঘামায় না। ঠিকমত কামকাজ কইরলে অমন দুশ-তিনশ টাকাপয়সা ও নিজেই রোজগার করতে পারে—হপ্তা দুতিনের কামাই। পাঁঠাটা নিকষ কালো, সর্বসুলক্ষণযুক্ত। তাও সবটা টাকা দিতে হল না একবারে। এতে তার ভারি ফুর্তি হয়। আলু পেঁয়াজ আদা রসুন, সুপুর্‍্যা কেনে। একটি লাল গামছা। দোকানে ঢুকে কচুরি আর জিলাবি খায়। এক বোতল বাংলা সেই ভরা পেটে খায়। আর এক বোতল কেনে। এক ভাঁড় রসগোল্লা। এতসব কেনাকাটা করে সে একটু দিশেহারা বোধ করে। রাত হয়। হাট ভাঙে। হাট ত তেমন বড় কিছু নয়। বনমালী নতুন গামছা মাথায় ফেট্টির মত বাঁধে। তাতে ওর ঝাঁকড়া চুলগুলো বশে থাকে আর চেহারায় একটা ছোকরা ছোকরা ভাব আসে। থলিতে আনাজগুলো আর বোতল নেয়। রসগোল্লার ভাঁড় বাঁ হাতের আঙুলে ঝোলায়। ডান হাতের পাঞ্জা গলিয়ে দেয় থলির হাতলের মধ্যে দিয়ে। কবজির কাছে হাতলটা থাকে। ওই হাতেই পাঁঠার দড়ি ধরে সে হেঁটে রওনা দেয়। আসবার সময় সে লেভেল ক্রশিং পার হয়ে সোজা রাস্তায় এসেছিল। তাতে বেশি হাঁটতে হলেও সঙ্গীদের সঙ্গে এটা সেটা কথা কি হাসিমশকরা করতে করতে দূরত্বটা বোঝা যায় না। এখন ও অতটা যায় না। রাস্তা থেকে একটু নেমে একটা পাঁচিলের ভাঙা গর্ত দিয়ে ঠিক স্টেশনের উলটোদিকে গিয়ে পড়ে। পাঁঠাটাকে প্ল্যাটফর্মের ওপরে তোলে। মিস্টির ভাঁড়টা তখন আঙুল থেকে খসিয়ে নিতে হয়। পাঁঠা আর মিস্টির ভাঁড়ের মাঝখানে ও দুহাতের ভরে এক ঝাঁকুনিতে প্ল্যাটফর্মে উঠতে যায়। পারে না। আবার চেষ্টা করে। আবারও পারে না।

'ধ্যুস্ শালা লাফাঁইচ্যি ত উইঠতে লারচি কেনে?' এবারে বনমালী একটু দ্বিধা করে—লাইন পেরিয়ে আবার ওদিকের প্ল্যাটফর্মে উঠে সোজা বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে বাসে উঠবে না কি হেঁটেই যাবে? বাসে উঠলেও কোনদিকের বাসে উঠবে? স্টেশনের গায়ে লাগানো স্ট্যান্ড থেকে উঠলে লম্বা পাড়ির বড় বাসে উঠতে হবে। এ-বাস চিত্তরঞ্জনের ভেতর দিয়ে যাবে না; স্টেশনের পাশ দিয়ে চেক পোস্ট পেরিয়ে বিহার পটারির সামনে দিয়ে রূপনায়রাণপুর স্টেশন আর বার্নার্ড নার্সারির মাঝখানের রাস্তা দিয়ে সোজা এম জি কাবখানা ডাইনে আর ব্রিজ বাঁয়ে রেখে ডানদিকে ঘুরে আসানসোল যাবে। স্টেশন পেরিয়ে শিবমন্দিরের সামনে রূপনারায়ণপুরে থামবে। সেখানে নামলে গ্রামের এ-মুখ দিয়ে ঢুকে ও-মুখে বেরিয়ে রাস্তার ধারে ওর ঘরে পৌঁছবে। আবার স্টেশন থেকে নেমে সোজা হাঁটলে বাংলা-বিহারের মাঝের গেট পেরিয়ে যদি মিনিতে ওঠে তাহলে একেবারে ঘরের সামনেই নামতে পারে। শেষ মিনিটা ভায়া সালানপুর বলে বাউরিপাড়ার সামনে

দিয়ে যায়। সামডি লাইনের মিনি হলে ডাবরমোড়ে নেমে হাঁটতে হত। কিন্তু ছাগল নিয়ে টলমল বনমালী লাস্ট মিনিতে উঠতে ভরসা পায় না। 'গেদ্যে ভিড় হব্যাক।' ও ভাবে। 'পাবলিকে ছাগলটো উইঠত্যে দিবেক নাই।' পাবলিককে ওর ভয় করে। পাবলিকের ঠেঙানিকে আরো।

পাঁঠাটা দড়িতে টান দেয়। এবারে বনমালী প্রাণপণে দুহাতের ওপর ভর দিয়ে শরীরটাকে ঠেলে দেয় ওপর দিকে। ডান পা বাড়িয়ে প্ল্যাটফর্মের জমি পায়। দুই হাত আর ডান পায়ের শক্তিতে বাঁ পা সমেত গোটা শরীরটা নিয়ে প্রায় আছড়ে পড়ে শক্ত প্ল্যাটফর্মের ওপর। গাটা ঝেড়েঝুড়ে নেয়। স্টেশনে লোকজন। ভিড়। আলো। হঠাৎই ও মনস্থির করে ফেলে। আবার ভাঁড়টা ঝুলিয়ে নেয় হাতে। তারপর লাইনে না নেমে ডাইনে হাঁটে। প্ল্যাটফর্ম শেষ হয়। ও বাঁয়ে ঘোরে। দুই রাস্তার মোড়ে দাঁড়ায় একটু। আকাশে তাকায়। অল্প ছেঁড়া-খোঁড়া মেঘ আর চাঁদের ঘোলাটে আলোয় আকাশে তারা তেমন চোখে পড়ে না। 'জল হবেক? উহুঁহুঁ বনারে, জল হব্যাক নাই।' ও ডানদিকের সোজা রাস্তা ধরে। চিত্তরঞ্জনের ভেতর দিয়ে যেতে হলে মুশকিল। সেখানে আর পি এফ আছে, পুলিশ আছে, পাড়ায় পাড়ায় হাঁকপাড়া চৌকিদার, পাহারাদার আছে। ভরাপেটে বনমালী এখন একটি স্বাধীন, মুক্ত ও মৌলিক ভ্রমণ চায়।

এই রাস্তার দুধারে তেমন জনবসতি নেই। মাটির গাঁথনি, টালির চাল একতলা নিচু দরজা, ছোট ছোট জানলা দেওয়া সেকেলে ধাঁচের বাড়ি। কুঁড়েঘর। কুয়ো। ধুলোভরা রাস্তা। দুধারে মাঠও দেখা যায়। চাঁদের আবছা আলোয় আর মেঘের ছায়ায় কেমন অন্য জগৎ মনে হয়। যেন দিনের আলোর সব রুক্ষতা রাতের আধো-আলো আধো-ছায়ায় এক ম্লান বিষণ্ণতা ও নিঃসঙ্গতার মধ্যে হারিয়ে গেছে। সেই ছায়া ছায়া নীরবতা ও বিষণ্ণতার মধ্যে বনমালী এক অনন্য, হাঁটে।

কিছুদূর যাবার পর ও একটা গান ধরে। ওর কণ্ঠটি বিস্ময়করভাবে সুরেলা আর বাউলদের মত উচ্চগ্রামে বাঁধা। পার্টির দাদনে তৈরি কল্যাণেশ্বরী ব্যান্ড পার্টিতে সে তালে তালে বিগ ড্রাম বাজায়। বিয়ে-শাদিতে পেতলের বোতাম-আঁটা নকল জরি বসানো মেরুন রঙের ড্রেস পরে ব্যাগপাইপে 'ফিল্‌মি গানা' বাজায়।

কিন্তু ভাঙা চাঁদ আর সামান্য কিছু তারার আলোয় বনমালীর মহুলমাতাল কণ্ঠ বেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত যে গানটি রাতের বাতাসে ভেসে যায় তা কোনো সিনমার গান লয়। গতবছর গাঁয়ের বাসন্তী মন্দিরে বায়না করা কীর্তনীয়া দলের মূল গায়েনের গানটিই ওকে পেয়ে বসে। সে গানের সব পদ ওর জানা নেই। দুটো শব্দই সে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গায়—'রাই জাগো, রাই জাগো, পোভাত হল যে আঁকি মেলো।'

গাইতে গাইতে বনমালী, মাতাল, বাউরি, মূর্খ বনমালী নিজেকে এক অন্য সত্তায় পায় যেন। কোমল সুরের আর্তিতে সে যেন গভীর রাত থেকে ভোরের দিকে চলে। তার গলা মাঝে মাঝে স্খলিত হয়। তার পা বেতালে পড়ে। সে কিছুই পরোয়া করে না। মাঝে মাঝে ছাগলটা অচেনা পথে চলতে ভয় পায়। দাঁড়িয়ে পড়ে। 'ম্যা হ্যা হ্যা' শব্দে আপত্তি

জানায়। বনমালী গান থামায়। বলে, 'ই ক্যামুন হলো মা বিষহরী? তুমার পাঁঠা তুমিই টানো মা গঁ।'

রূপনারায়ণপুর স্টেশনের উলটো পিঠ এ-রাস্তায়। ওভারব্রিজ যেখানে শুরু বা শেষ সেখানে হিন্দি-বাংলা-ইংরেজিতে স্টেশনের নাম লেখা। বনমালী পড়তে না পারলেও সেটা জানে। নার্শারীর আলো আর ওভারব্রিজের গোড়ায় জ্বলা আলোর নিচে বনমালী থামে। সিঁড়ি বেয়ে তিন-চার ধাপ ওঠে, তারপর বুক চিতিয়ে তার বিখ্যাত ভঙ্গিমায় দাঁড়ায়। সে যেন এই মধ্যরাতের রাজা। গান থামিয়ে সে শোলের ডায়ালগটা মনে করার চেষ্টা করল, কিন্তু মনে পড়ল না। চাঁদনী রাতের বিভ্রমে আর ইলেকট্রিক আলোর ঝলকে তার খালি 'রাই জাগো'-তে ফিরে আসা। ফিরে ফিরে আসা।

হঠাৎ সে যেন নিজেকে আবিষ্কার করে। সিঁড়িতে বসে পড়ে সে আবার ভাঁড়টা নাবিয়ে রাখে। বোতলটা বের করে উঁচুতে তুলে ধরে বোতলের গায়ে। ওর ঠোঁট দুটো সরু করে লাগিয়ে শব্দ করে। 'বনা রে তুই আজ রাজা ব্যটে। বিন্দাবনের রাজা। রাধিকা কাইনছেঁ তুর লেগ্যে। আহ্ হ্। জাগোরে ও রাই জাগো, পোভাত, পো ও ও ভা আ আ ত।' খানিকটা খেয়ে ও বোতলটা ব্যাগে রাখে।

'ওঠরে বনমালী, রাইকিশরী কাইনচ্যে যে, রাধার কাছকে যেথ্যে হব্যাক, ও রাই জাগ অ অ।'

বনমালী উঠে দাঁড়ায়। আর তখনি তার খেয়াল হয় হাত ফশকে পাঁঠার দড়ি চলে যাচ্ছে, নেমে যাচ্ছে সিঁড়ি বেয়ে।

'হঃ! ই ক্যামুন রঙ্গ ব্যটে মা? রশিট চইলছ্যে?' চলমান দড়ির পেছন পেছন সেও নামে। পা দিয়ে দড়িটা আটকাতে চায় কিন্তু বারে বারে পিছলে যায়। শরীরের বিষমপদী চলনে ভাঁড়ের রস চলকে ওঠে। 'পেম সাগরে লহরাচ্যে গঁ। কঠিন মিঠা ব্যটে।' কবজিতে লেগে যাওয়া রস একটু চেটে নেয় ডান হাতের আঙুলে লাগিয়ে। ভাঁড়টা এবারে ডান হাতে নেয়। পাঁঠার দড়িটা এবার একটু গতি পায়। টলমল বনমালী বুঝে ফেলে এবারে দড়িটা ওর নাগালের বাইরে চলে যাবে। ও 'হেই হেই। ধ্যার, ধ্যার, আরর্, হুরর্র' শব্দে জোড়া পায়ে লাফিয়ে পড়ে চলে যাওয়া দড়ির ওপর। ওই ভাবে একটা ছবির মত দাঁড়িয়ে থাকে আকাশেব নিচে। যেন ভেবে পায় না কীভাবে দড়িটা তুলবে। ও আস্তে আস্তে বাঁ দিকে কোমর নোওয়ায়। বাঁ হাত লম্বা করে বলে আস্তে আস্তে ভাঁড়সমেত ডান হাত উঁচু হয়ে যায় ভূমির ওপরে শরীরের ভরকেন্দ্রের সংগতি রাখতে। দড়িটা তুলে কবজি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ও দড়ি গুটোয়। ওর চোখ দড়ির পাক খাওয়ার ওপর, হাতের নড়াচড়ার ওপর। দড়ির টানে টানে পাঁঠাটা কাছে আসে। বনমালীর পায়ের কাছে আসে। দড়ির টানে টানে ছাগলছানার গলাটা উঁচু হয়ে যায় আর ছাগলটা ডেকে ওঠে, ম্যা-হ্যা-হ্যা-হ্যা-হ্যা। এতক্ষণ বনমালী যেন ভুলেই ছিল ও দড়িটা গোটাচ্ছে কেন। যেন গোটাতে হয় তাই গোটাচ্ছে। কিন্তু কালো কুচকুচে ছাগলছানাটা একেবারে পায়ের কাছে এসে ডেকে উঠলে ওটাকে না দেখে আর উপায় থাকে না। সে নিজেকেই শুনিয়ে

শুনিয়ে বলে,'পাঁঠাটো আইনলুম আমি? তালে বিন্দাবন লয় বনারে তুই মায়ের থানে যেছিস! ইট লিচ্চয় মায়ের পাঁটা। কী গো তুমি মায়ের পাঁটা লও? ত পাল্যাচ্যিস কীসকে?' হাত ঘোরাতে ঘোরাতে ও নিচু হয়ে পাঁঠাটাকে তোলে। বাঁ বগলের তলায় সেঁধিয়ে দেয়। পাঁঠার পেটের তলায় হাত গলিয়ে শক্ত করে ধরে। তারপর হাঁটা শুরু করে। একটু টলমল হেঁটেই সে আবাব 'বাই জাগ'-তে ফিরে আসে। এবারে সুর একটু নিচু পরদায় ধরে, যেন নিজেকেই শোনাতে শোনাতে হাঁটে। মৌমাছির মত সুরটা বিনবিন করে ওকে ছেঁকে ধরে। সেই গুনগুন ধ্বনি রাস্তা জুড়ে চলে। রাস্তার এপাশ-ওপাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা চলে। রাই জাগাতে জাগাতে চলে। এভাবেই লেভেল ক্রশিং-এর মোড়ে পৌঁছে যায় বনমালী। কিন্তু বাঁয়ে ঘুরবার আগেই সে তার 'মায়ের পাঁটা' ও 'রাই জাগ' গানটি সমেত একটা মালবোঝাই দূরপাল্লার ট্রাকের নিচে নিখুঁতভাবে চাপা পড়ে।

গাড়ির নিচে এক মাতাল বনমালী হাত-পা ছড়িয়ে ভাঙা কাচ, আলু, পেঁয়াজ, মশলা, মদ, রসগোল্লার রস আর রক্তে মাখামাখি হয়ে থেঁতলে পড়ে থাকে। ট্রাকের ড্রাইভার, আর-এক মাতাল, ভয়ে অ্যাক্সিলেটরে আরো জোরে চাপ দেয়। ছাগলছানাটা আহত হয় আর তারস্বরে চেঁচায়। মৃত বনমালীর রক্তাক্ত হাতখানার সঙ্গে দড়ির অপরপ্রান্ত আটকানো থাকে বলে জ্যান্ত ছানাটা যেন এই মরণ দৃশ্যের একটা অংশ হয়ে থাকে। তাতে বনমালীর এই অপ্রস্তুত, অসতর্ক শব্দহীন মৃত্যুও সশব্দ হয়ে ওঠে পাঁঠাটার মরণ পেরিয়ে বাঁচার শব্দে।

ষোল

বনমালীর মরণোত্তর সম্মান

একটা জ্যান্ত মানুষ ত মরে যাবার জন্য জন্মায়। তবু সেই মরণ যেখানেই আসুক আর যেভাবেই আসুক তার জন্য তেমন কোনো প্রস্তুতি সত্যি সত্যিই কি তৈরি করা যায়? মৃত্যু ত একটা ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনা। ঘটবার আকস্মিকতায় কোনো কোনো ঘটনাই দুর্ঘটনা যেমন, তেমনি ঘটবার পারিপার্শ্বিকতায় কোনো কোনো দুর্ঘটনাও ঘটনা হয়ে ওঠে। তবু বনমালীর মরাটা শেষ পর্যন্ত তেমন ঘটনা বা দুর্ঘটনা হয়ে ওঠে না। আবার খানিকটা হয়েও ওঠে।

বনমালী যে এভাবে মরবে এটা কেউ জানত না, আবার বনমালীর এভাবে মরাটাও তেমন অপ্রত্যাশিত হয় না। এমন ঘটনা দুর্ঘটনাতেই ত এরা, বনমালীর বাবা, কাকা-জ্যাঠা কি আরো আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীরা মরে যায়। রোগে ভুগে মরেই বেশি অবশ্য। মদ খেয়ে খেয়ে মরে। মদ খাওয়ার সাথে সাথে আধপেটা খাওয়াটা মরণকে আরো তড়িঘড়ি আগিয়ে আনে।

বনমালীর মরণের আকস্মিকতা এমনই এক দুর্ঘটনা যে সে সত্যি সত্যিই মরেছে কিনা

সে নিশ্চয়তায় পৌঁছবার ব্যাপারটা আরো এক ঘটনা হয়ে ওঠে। থ্যাতলানো, রক্তমাখা হাড় ভাঙা, মাংস বের করা শরীরটা ডাক্তারের সার্টিফিকেট না পাওয়া পর্যন্ত কাগজে-কলমে মরে না। শুধু তাই নয়, সেই সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত মৃত শরীরটা জ্যান্ত মানুষেরা বয়ে নিয়ে যায় আসানসোলে। সেখানে লাশকাটা ঘরে তার মরণ সম্পূর্ণ হয়। কিংবা তার মরণের সম্পূর্ণ লেখচিত্রটি তৈরি হয়।

মৃত বনমালীর মরা এভাবেই সম্পূর্ণতা পায়। স্বীকৃতি পায়। মরণোত্তর ভোজের সঙ্গে সঙ্গে মরণোত্তর সম্মানটিও সে পেয়ে যায়। পেয়ে যাবার মত কারণ সে যেন তাব অমন মরণ দিয়েই তৈরি করে যায়।

খুঁতো হওয়ায় মানতের পাঁঠাটি পুজোয় দেওয়া যায় না। বরং ওটি দিয়েই তার শ্রাদ্ধের ভোজ সুসম্পন্ন হয়। শেষ কাজের লৌকিক ক্রিয়াকর্মের মোরগাটিও অশ্‌কা পেয়ে যায়। সন্ধেবেলা মাঠ ফিরতে গেলে ঘরে না ফেরা মোরগাটাকে ও একটা ঝোপের ধারে পায়। এ ভাবে মোরগাটা পেয়ে যাওয়াও যেন বনমালীরই তৈরি করা কোনো ঘটনা। বনমালী যেখানে পড়েছিল তার একটু দূরে এক বস্তা ভাল চাল, এখানে 'দিল্লির চাল' বলে যা বিক্রি হয়, রাস্তার ধারে পড়েছিল। সে চালের বস্তা কী করে এল তখন কেউ সেটা ভাবে নি। আহত ছাগলছানার সঙ্গে সেই চালের বস্তাও বনমালীর বাড়িতে পৌঁছে যায় পুলিশ জানার আগেই। দড়ির ও প্রান্তে কী ছিল? বা বনমালীর হাতে দড়ি জড়ানো কেন? তবে কি কেউ বনমালীকে খুন করে দড়ি দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে ফেলে গেছে রাস্তার ঠিক মধ্যিখানে. ট্রাক কি বাসের অপেক্ষায়? এসব প্রশ্ন পুলিশের মাথাতেই আসে। এসব প্রশ্নের উত্তর পুলিশকেই খুঁজে বের করতে হয়। কাজে কাজেই লোকগুলো এসব ভাবে না। লাইন যখন আছে, লেভেল ক্রসিং যখন আছে, তখন দুটো-চারটে মরদ কি মেয়েমানুষ লাইনে এমনিতর ছিন্নভিন্ন ও রক্তাক্ত হয়ে পড়ে থাকে মাঝে মধ্যে। তা সেই পড়ে থাকা মৃত্যুগুলো ঘটনা না দুর্ঘটনা? স্বেচ্ছামৃত্যু না আকস্মিক মরণ এ-প্রশ্নের উত্তর দেবার দায় ত পাবলিকের নয়। তাই যে পাবলিকের ভয়ে বনমালী বাসে উঠল না সেই পাবলিকই তার শ্রাদ্ধের চাল ও মাংস বয়ে নিয়ে আসে তার ঘরে।

শ্রাদ্ধের ভোজ খেতে খেতে কেউ একজন পরিতৃপ্ত গলায় বলে ওঠে, 'বড় ভাগ্যিমানী লক ছিল্য হে আমাদের বনমালী। অপঘাতে মল কিন্তুক লিজের ভোজের বেবস্তাটো লিজেই কর‍্যা গেল।'

'পাঁঠাটো লিজেই কিন্যেচিল, কিন্তুক চালটো পজ্জন্ত?' আর একজন বলে।

বাউরিপাড়ায় বিয়ে যেন এক যৌথ উদ্যোগ। সমবায়ের যৌথ উদ্যোগ। কেউ যদি দেয় দশ কিলো চাল ত কেউ দেবে দুকেজি ছাঁচি তেল। কেউ ডিংলা। কেউ দেয় দানের থালা। স্টীলের থালা হলে চলবে না, কাঁসার থালা-বাটি চাই। এই দেওয়াটা যেন ঠিক উপহার নয়। প্রত্যাশার দেওয়া, কেননা যে যত দেয় সে তত বেশি করে এই আশায় থাকে যে তার বাড়ির অমন কোনো উৎসবেও সে এমনি 'যতুক' পাবে। কিন্তু শ্রাদ্ধের মদ মাংসের খরচা নিজের নিজের। শোকের গুরুভার যে একাই বহন করতে হয়, তা যে

ভাগ করে নেওয়া যায় না তা এই অন্ত্যজ জাতির মানুষদের রীত-প্রকরণই বলে দেয়। কেউ যদি সমবেদনার হাত বাড়ায় সে হাতের দান এরা গ্রহণ করে অতীতের ভুলে যাওয়া নম্রতায় ও শ্রদ্ধায়, কিন্তু উৎসবের ভার আর আনন্দ ভাগ করে নেয় এক অলিখিত অধিকারের সামাজিকতায়। এখন বহু বহু বছর ধরে ভদ্রসমাজের গায়ে গায়ে বেঁচে থাকতে থাকতে, সভ্যমানুষের পাশাপাশি বসবাস করতে করতে এদের বহির্জীবনের কিছু কিছু আচার আর ভাবনা প্রকাশভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এ পরিবর্তন হঠাৎ কোনো ঘটে যাওয়া ব্যাপার নয়, মাটি বা বাতাসের উপাদানের পরিবর্তনের মত ধীরতায় ঘটে। কলকারখানার ক্রমাগত বিষবাষ্পে যেমন নিষ্কলুষ বাতাস ক্রমশ ভারী হয়ে ওঠে, কারখানা কলিয়ারি অঞ্চলের মানুষজনের অর্থনৈতিক, সামাজিক দূষণও তেমনি ধীরে ধীরে ক্রমাগত শুদ্ধ বাতাস আর মাটির মানুষজনের বিশুদ্ধতা নষ্ট করে। তার ব্যক্তিগত শুদ্ধতা নষ্ট করে। তার সামাজিক শুদ্ধতাও নষ্ট করে। একদিনে তা হয় না, একদিনে তা টেরও পাওয়া যায় না।

বনমালীর শ্রাদ্ধের ভোজ যেন সেই হারিয়ে যাওয়া নষ্ট হয়ে যাওয়া শুদ্ধতায় সম্পন্ন হয় পাড়া-প্রতিবেশী-আত্মীয়কুটুমের এমন সব কথায়। এমন সব বিশ্বাসের সরলতায় আর এমনতর আবেগের স্বতোৎসারিতায়।

তাই জীবিত অবস্থায় কৌতুক ও করুণার পাত্র, কখনো-বা বিরক্তি জাগানো বনমালী, আমৃত্যু ধারদেনায় ডুবে থাকা বনমালী বাউবি—তার জাতের মানুষজনের কাছে 'ভাগ্যিমানী লক' হয়ে ওঠে, অপঘাতে মরা সত্ত্বেও 'ভাগ্যিমানী'—একটি খুঁতো পাঁঠার মাংস আর পড়ে পাওয়া এক বস্তা ভাল চালের পেটভরা ভোজের সুবাদে।

সতের

অশ্‌কার শৈশবের মৃত্যু

বাউরি শিশুদের ত তেমন করে কোনো শৈশব বা বাল্যকাল থাকে না। একটা গরু কি ভেড়ার বাচ্চা জন্মানোর কিছু পরেই টলমল পায়ে উঠে দাঁড়ায়। দৌড়য়। কুকুর-বিড়ালের বাচ্চারা খানিকটা বেশি মাতৃনির্ভর। কিন্তু মানুষের মত এত দীর্ঘস্থায়ী শৈশব বা বাল্যকাল অন্য কোনো প্রাণীর নেই। একটা মানুষের বাচ্চাকে একটা আস্ত মানুষ বানাতে কত যে আয়োজন আর উপকরণ, কত যে ধৈর্য, যত্ন আর ধ্যান দরকার তা ত মানুষই জানে। কিন্তু সব মানুষ জানে না। বা কেউ কেউ জানলেও পারে না। মানুষের মত এত শ্রেণীবিভাগ ত অন্য কোনো প্রাণীর নেই। সন্তানের মধ্য দিয়েই মানুষের বেঁচে থাকার অন্য অর্থ থাকে কিংবা বেঁচে থেকে যাবারও একটা অন্য অর্থ থাকে। তাই বোধহয় সন্তান লালনপালনের দৈনন্দিনতায় মানুষ আরো পারিবারিক হয়ে ওঠে। কিন্তু বাউরি-জীবনের কি সদর্থে কোনো অর্থ আছে? তার বেঁচে থাকার প্রাত্যহিকতায় বেঁচে থাকাটুকু ছাড়া কি অন্য কোনো গভীরতর সত্য নিহিত আছে? বাউরিদের ত তেমন

কোনো ইতিহাস নেই, কোনো আদিম অরণ্যের ঐতিহ্য নেই। নিজস্ব লিপি নেই। নিজস্ব ভাষা নেই। বাউরি-জীবনের দৈনন্দিন তাই শুধুই দৈনন্দিনতায় ফুরিয়ে যায়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যেন এক যাযাবর জীবন তাদেব অথচ কোনো যাযাবর পথচলা নেই। ভবঘুরের মত তারা শিকডহীন, ভবঘুরের মতই তারা উদ্দেশ্যহীন, তবু তারা যাযাবর নয়, ভবঘুরেও নয়। তাদের মননে আর জীবনযাপনে যেন যাযাবর বৃত্তি, ভবঘুরেপনা। তাই তাদের প্রতিটা দিন এমন বর্তমানতায় থাকে যেন তারা সেই বর্তমানেই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। বাউরি বেঁচে থাকে, বেঁচে থাকাটা আছে বলেই, যেন বেঁচে থাকাটা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ওই কাজটা করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। যেমন মরার সময় সব মানুষেরই মবা ছাড়া দ্বিতীয় কাজ থাকে না। দ্বিতীয় উপায় থাকে না। বাউরি-সন্তানের জন্ম হয়ও এভাবে। প্রাকৃতিক ও জৈবিক কোনো ক্রিয়াকাণ্ডের মতই। এক সন্তান দাঁড়াতে শিখলেই মায়ের গর্ভ আর-এক সন্তানের প্রাণময় নতুন কোষটি ধারণ করে। বাউরি-রমণী ঋতুমতী যতদিন, ততদিনই সন্তানবতী। ইদানীং স্বাস্থ্যকেন্দ্রেব জন্যই হোক বা বাবুঘরের বউদি-কাকীমাদের পরামর্শেই হোক পাঁচ/ছয়/ কি সাত নম্বব সন্তানেব জন্মের পরে কেউ কেউ অপারেশন করিয়েছে। বাউরি-পুরুষদের এ-ব্যাপাবে মতভেদ দেখা যায় না। তারা কেউ 'খাসি' হতে রাজি নয় ত বটেই অন্য কোনো গর্ভনিরোধক ব্যাপারেও তাদের আপত্তি। 'রমণী ত রমণেরই জন্য'—ভদ্রভাষায় বললে তাদের মনের ভাবটি এইরকমই দাঁড়ায়।

এমনি জীবনের মধ্যেই ত বাউরি-শিশুরা জন্মায়। মায়ের দুধ পায় কি পায় না ভদ্রলোকের উচ্ছিষ্ট খেয়ে বড় হয়। হাঁটতে শিখলেই গোবর কুড়োয়, কাঠ কুড়োয়, কয়লা কুড়োয়। ভাইবোন কোলে নিতে শেখে। সেই সমস্ত বাল্যকাল ও শৈশববর্জিত মানবসন্তান শুধু মানুষের আকৃতি পায়, আস্ত মানুষ হয়ে ওঠে না। তাদের শরীর ত শুধুই মানবশরীর—তাতে যে আবেগ বাহিত হয় তা বড বেশি জান্তব। বড বেশি তাৎক্ষণিক। তাতে মানবসভ্যতার, শতাব্দীপ্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিহ্নমাত্র থাকে না। সচেতনতা থাকে না।

এহেন এক বাউরি-বালক অশকা তার বাপের এক ব্যতিক্রমী আবেগে আর মমতাভরা পিতৃত্বে বাল্যকাল পেয়েছিল। দিদির মততা পেয়েছিল। মায়ের স্নেহ পেয়েছিল। বাপ মারা যাবার পর ন্যাড়া মাথায় ভাল করে চুল গজাবার আগেই তার বাল্যকাল যেন হঠাৎ এক সংকটের মধ্যে পড়ে। যেন খুব তাড়াতাড়ি তাকে বড় হতে হবে। কথাটা সে প্রথমে বোঝে নি। বোঝার মতও ত নয় কথাটা। সব কথা কি শুরুতেই বোঝা যায়? কোন কথা থেকে যে কোন কথা আসে, কোন কাজের মধ্যে দিয়ে যে কোন কাজের শুরু হয় তা কি কেউ জানে? তেমনি অশকাও ত জানে না। জানতে পারে না তার জীবনের কোন সকালটি থেকে তার পরের দিনের সকালের কত তফাত হয়ে যায়;—মৌলিকভাবে বদলে যায় একটি সকাল আর একটি সকালের দিকে গড়িয়ে যেতে যেতে।

আঠার

অশ্‌কা ইশকুলে যেতে চায়

কলে জল এসেছে অশ্‌কা মুড়ি খেতে খেতে দেখে নিয়েছে। শুধুই মুড়ি। এক গ্লাশ চায়ে জল ঢেলে দেড় গ্লাশ চা বাটিতে গরম করেছে সুখী। ববিতা দু-বাড়ি কাজ করে। দু-বাড়ির সকালবেলার চা আগে বাড়িতে দিত। অশ্‌কা নয়ত জবা নিয়ে আসত। সুখীর কাজের বাড়ি দূরে বলে ও ওখানেই চা খায়। ইদানীং ববিতা এককাপ চা দেয়, বলে, 'আমি খাব নাই? মা ত আইনতে পারে এক ঘরের চা টো।' সুখীর আসতে বারটা বাজে তবু ও এখন তৃতীয় বাড়ির চা-রুটি নিয়ে আসে। কোনোদিন ভাত। সেই চা গরম করে বিকেলে ওরা তিনজনে খায়। ববিতা ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা। সে চা খেয়ে আসে। সুখী কোনো বাড়িতেই বিকেলে চা পায় না।

চা গরম হলে একটা স্টীলের বাটিতে অশ্‌কাকে আর একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে জবাকে দিয়ে নিজে কলাই-এর গ্লাশে চা নেয় সুখী। চা খেয়ে ভাত বসিয়ে ও কাজে বেরয়। বনমালী নেই, এ-কথাটা সুখী রোজ সকালেই টের পায়। রোজ রাতে টের পায়। শরীরে যৌবন ঢলেছে কিন্তু বয়স ত তেমন ঢলে নি। ছেলেমেয়ের গায়ে হাত রেখে এক-একদিন তার নিশিজাগরণ হয় যেন। চাঁদের আলোয় যেন কোজাগরী। যেন হু-হু হাওয়ার সাথে দড়াম করে কপাট খুলে ওর স্বামী আসবে। চ্যাঁচাবে। ওর শরীরে এখনো যেন বনমালীর গন্ধ লেগে আছে।

কিন্তু বনমালী তার শরীর নিয়ে চলে গেছে। মদ খেয়ে বা জুয়া খেলে টাকাপয়সা উড়িয়ে দিলেও তবু ত হাটে যেত। মাঝে মধ্যে টাকাপয়সা দিত। এখন দকানের দেনাট শুইধবেক কে? চাল সয়দা। হাট-বাজার সব একা সুখী সামলাবে কী করে?

ববিতা আজকাল টাকাপয়সা বিশেষ দেয় না। ওই লাইনের ওধারে ভিডিও দেখায়—সেখানে যায়। জেমারির হলে সিনমা একটাও বাদ নাই। তা বাদে চুড়িরে, ফিতারে, টিপরে, নখপালিশ, পাউডার, সেন, মাসকাবার হতেই ও মাইনে নিয়ে দোকানে এসবের ধার মেটায়। তা ববিতাই সুখীকে বলে, 'অশ্‌কাকে বাগালিতে দাও, পয়সা পাবেক। দুপরে মুড়ি। কী হব্যাক পঢ়ালিখ্যা কর্‌্যা?'

চা খেয়ে অশ্‌কা বালতি নিয়ে কলে যায়। জল নিয়ে আসে দু-বালতি। চান করে আসে। স্কুলেব সময় হয় নি তখনো কিন্তু কলে চান না করলে হয় সরাকদিগের পুখরে, নইলে বাবুর বাঁধকে যাও। ফিরে আসতে মাথা গরম হয়ে যায়। দড়িতে ওর গেঞ্জি প্যান্ট মেলছিল, সুখী ডাকে, 'এ নুনু, বেটা, শুন?' 'কা ামার ঘর যাস নাই যে অখনও?' অশ্‌কা মাব কাছে আসে। সুখী ভাতে গোটাচারেক আলু দেয়। শাক কুচিয়ে ঝুড়িতে রেখেছে। ধোয়া। বাছা। আলু সানা আর লাল শাকভাজা রসুন স্যপুর‍্যা দিয়ে।

'কী বলচিস বল? এ্যাই মা?'

কীভাবে কথাটি পাড়বে তা ত সুখীকে ভাবতে হয়। তার বেটাটো আর পাঁচজনের

মত লয়। তার বেটা ইশকুলে 'ক' পায়। ক মানে খুব ভাল বটে। অশ্‌কা ইশকুলে যাত্যে ভালবাসে। পড়ার শক খুব। অর বাপও চাইত ছিল্যাটো পড়ুক। হায়, কোন প্রাণে সুখী ওকে বাগালিতে দেবে? অশ্‌কার মুখখানা ঘিরে যেন মায়া। ওর চোখদুটি মায়ের মত আয়ত। খোলাচোখে তাকালে ঘন পল্লবের ঘেরে থাকে মায়াময় চোখদুটি। একটু যেন লম্বা হয়েছে অশ্‌কা। নাকি বাপের শোকে আর আধপেটা খেয়ে শীর্ণ হয়েছে বলেই এমন লম্বা দেখায় ওকে। 'আজ কাজে যাব নাই। শরীল ভাল নাই।' সুখী বলে। ঘরের ভেতর জবা একটু কাশে। আবার কদিন ওর রাত্রে জ্বর হয়। শেষরাতে ঘুম ভেঙে দেখে পিপাসা। ঘামে চুল ভিজে সপসপ করে। জামা ভেজা। কাঁথা ভেজা। এদিকে তৃষ্ণা। যেন বুক ফেটে যাবে। ঘাড়ে ব্যথা।

'কী রাঁইধলি? ঈঃ শাগ্? খাব নাই?' অশ্‌কা একটু ঝুঁকে দাঁড়ায়।

'আলু সিজতে দিইচি। ফেন-ভাত হবেক।'

ঘরের ভেতর থেকে জবা চিঁ-চিঁ করে বলে, 'আমি ভাত খাব নাই।'

'কেনে? চালটো অমোনি আসে? খাবি না কেনে? কী খাবি তালে?'

'কুছু খাব নাই। মুকে রুচ্যাছে না।'

'মর তুরা মর! ই বইলচ্যে শাগ্ খাব নাই, উ বইলচ্যে ভাত খাব নাই, আমার হইচ্যে মরণ। বাবুর বাঁধকে আমি গেলুম না কেনে? ববিটার ঘরে মন নাই। বিয়ার বয়স হইচ্যে, সব আমার উপর চাঁপাই দিয়া তাদেব বাপ সগ্‌গে গেল!'

জবা উঠে দুয়ারের কাছে বসে। নীরবে। তার বাদামি চোখে যেন জীবনের উলটোদিকের ছায়া ঘনিয়ে থাকে। তার চুলগুলো বাদামি, তেল না দেওয়াতে তাতে একটা নিষ্প্রাণ বিবর্ণতা। মায়ের কথায় সে তার বিস্মিত ও ভীত অস্তিত্ব নিয়ে যেন এতটুকুনি হয়ে যায়।

অশ্‌কা তাড়াতাড়ি বলে, 'খাবরে খাব। তুই চিঁচাস্ না। ভাত খাব, আলুসানা। পিয়াজ, ত্যাল দিবি ত? শাগ্ খাব। লাল হবেক ভাত, হ্যাঁ গঁ মা, লাল হব্যাক নাই? এ্যাতটি ভাত খাব! দিদি তুই খাবি না?'

ছেলের কথায় আর হাত নেড়ে কথার বলায়, মুখের হাসি হাসি ভঙ্গিতে সুখী হেসে ফেলে। হাসতে হাসতেই বলে, 'আজ ইশকুলে যেয়ে দিদিমণিদের বইলবি আর আইসব না।'

হঠাৎ এমন একটা অপ্রত্যাশিত কথায় অশ্‌কা অবাক হয়।

'কেনে, মামাঘর যাবি?'

'না, ঘোষকাকু তুকে চাকরি দিবেক।'

'পাশ দিলুম নাই, তাথেই চাকরি?' অশ্‌কা বলে।

'ই চাকরিতে পাশ লাগে না। উয়াদের গাই-বলদ চরাবি আর মাইন্দারি করবি। পনর টাকা মাইনে—দুপরে ভাত দিবেক। মুড়ি দিবেক।'

'ধ্যেৎ, বাগালি বল? আমি ত পইড়ব। বাবু বইলথ আমি বড় হয়্যা বাবুঘরের

ছিল্যাদের পারা জামা-প্যান পইরব। চাকরি কইরব। ভটভটিয়া চাইপব। বাগালিতে কী হব্যাক?'

'তর বাবু থাইকলে বইলথুম না। আজ ভাত রাইনছি খেঁইয়ে লে। কাল রাঁইধব না, ঘরে চাল বাড়ন্ত, কাল খাবি কি?'

অশ্‌কা বানান করে যুক্ত অক্ষরের কহানী পড়তে পারে। বাপ্পা ওকে মাঝে মাঝে পড়তে দেয়। স্কুলে পড়ানো বিশেষ হয় না, তাথেই ইসকল হয়। বাপ্পা গল্পের বই পড়তে ভালবাসে তার একটা কারণ বোধহয় বাপ্পাদের টিভি নেই। কিরীট এসব পছন্দ করে না, সে নিজে ছেলেমেয়েকে পড়ানোর সময় পায় না এমনই তার চাকরির ধরন, কিন্তু তার মাধ্যমিক পাশ বউ তপতী সকালে আর রাতে ওদের নিয়ম করে পড়ায়। দুপুরে চুল শুকোতে শুকোতে সে নিজে গল্পের বই পড়ে, উল বোনে বা টেবল ক্লথে ফুল তোলে সেসময়ও তার একটা কান যেন ছেলেমেয়ের দিকে থাকে। তার শাশুড়ির বয়স বেশি না। সকালবেলার রান্নার অনেকখানি তিনি সামলান। ফলে তাদের সংসারের খানিকটা সাবেকি চলন। সে চলনে খানিকটা খানিকটা এই শিল্পাঞ্চলের আধুনিকতা মেশে। সে আধুনিকতায় বাড়িতে খবরের কাগজ আসে না কিন্তু পাড়ার রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তীতে বাপ্পা আর তিস্তা রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্রনৃত্য আর নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করে। তপতী ওদের বই কিনে দেয়। ছোট ছোট গল্পের বই। পাণ্ডবগোয়েন্দা, বেতাল বা অরণ্যদেবের গল্প। স্টেশনারি দোকানে কিছু বই পাওয়া যায় বিয়ে বা পৈতেতে দেবার জন্য। সেখান থেকে রূপকথা আর ভূতের গল্প পঞ্চতন্ত্রের আর হাসির গল্পের বই কিনেছে তপতী। ইদানীং রবিবার সকালে দু-ভাইবোন সকাল সকাল চান সেরে পাশের ফ্ল্যাটে গিয়ে রামায়ণ দেখে। বাপ্পা মাকে লুকিয়ে কয়েকটা বই অশ্‌কাকে পড়ায়। অশ্‌কা খুব যে একটা বোঝে তা নয়। এইসব কাহিনী তার চেনা জগতের সঙ্গে মেলে না বলেই হয়ত সবটুকু বুঝতে তার বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতায় কুলোয় না। শুধু তার ভাল লাগে, শায়েবের বেটা তার পাশে বসে। নতুন বই-এর গল্পের সঙ্গে বাপ্পার বাড়িতে কাচা আর ইস্ত্রি করা সার্টের গন্ধ মিশে যায়। বাপ্পার চুলগুলো পরিপাটি আঁচড়ানো, মাথায় গন্ধতেলের বাস। মুখে আর ঘাড়ে-গলায় পাউডারের আবছা ছাপ। অশ্‌কার জামাটা লালচে, ছেঁড়া, কোঁচকানো। প্যান্টের রঙ জলে গেছে। তার মা বাবুঘর থেকে এনে দিয়েছে। বাবুঘরের ছিল্যাটো কেবেলে পড়ে। কেবেলের ইশকুলে জামা-প্যান-সুয়েটার দ্যায়। আর-এক বাবুঘরের বিটিটো কনভেনে পড়ে। উয়ার জামার রঙ আলেদা।

অশ্‌কা ইসকল বুঝলেও তার মায়ের কথাটি বোঝে না যেন। সে ইশকুল ছেড়ে গরুবাগ্যালি কইরবে কীসকে? তাকে ত অনেক অনেক পইড়তে হব্যাক। বড় ইশকুলে যাথ্যে হব্যাক। মায়ের কথায তার ভারি রাগ হয়। সে ঘাড় গোঁজ করে অবাধ্য ঘোড়ার মত দাঁড়িয়ে থাকে। তার চোখ দিয়ে টসটস জল পড়ে। 'বাপ্পা পইড়বেক আর আমি মাঠে মাঠে গরুবাগালি কইরব? কেনে?' ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে ও।

এবারে সুখী ঠাস করে চড় কষায় ছেলের গালে। 'ঢের পড়্যাচিস। কে খাত্যে দিবেক?

ইশকুলের দিদিমণি? বাবুঘরের ছিল্যাদের সাথে পাল্লা দিবি তুই? বাবুঘরের ছিল্যাদের পারা পইড়বি সি কপাল কর‍্যাচিস? কে ভাত দিবেক? কাল থিক্যা মাঠে যাবি। হুঃ।'

উনিশ

কুমোরপাড়ার গোরুর গাড়ি

আজ খুব ভোরে, বোধহয় আঁধার থাকতেই অশ্‌কা মাঠে আসে। ওদের পাড়ার ছেলেমেয়েরা এত দূরে আসে না। ছোটরা রাস্তার ধারেই নয়ত রাস্তার ওপরেই পায়খানা করে। বড়রা রাস্তা থেকে নিচু জমিতে, ধান কাটা হলেও ত মাঠেই বসে যায়। এই অঞ্চলে পুকুরকে বাঁধও বলে— হয়ত সেগুলো কাটানো পুকুর নয়—নিচু জমি মাটি পাথরের উঁচু বাঁধে ঘিরে দিলে বর্ষার জল অনেকদিন পর্যন্ত থাকে, পরে কোথাও গভীর করে কেটেও দেওয়া হয়। তাহলে সারা বছর জল পাওয়া যায়। মাছ চাষ করা যায়। সেইসব পুকুরে বা রাস্তার কল উপচিয়ে রাস্তা পেরিয়ে মাঠে নামা জল জমে ডোবা মত হয়ে থাকে যেখানে, সেখানে কোনোমতে ধোয়াধুয়ির কাজ সেরে প্যান্ট পরে নেয়। বউ-মেয়েরাও মাঠে বসে—অল্প বয়সে শাড়ি ছড়িয়ে, বয়স বাড়লে, দু-তিন ছেলের মা হলে শাড়ি উঠিয়ে। সাবান মাখে চানের সময়, মাথা ঘষে যতদিন সাবান ফুরিয়ে না যায়। তা বাদে জল দিয়েই হাত ধোয়। মাটি দিয়েও হাত ঘষে না বেশিরভাগই। কেউ কেউ মাঠ থেকেই কাজে যায়। বাবুঘরে। জমিতে। ইটভাটায়। পাথর ভাঙা মেশিনে বা অন্য টুকটাক কাজে।

সেইরকম একটা পুকুরে, একেবারে জলের কাছটিতে আকাশভরা শেষরাতের তারার আলোর নিচে অশ্‌কা উবু হয়ে বসে। পুকুরের পাড় অনেকটা উঁচু, এত উঁচু যে অশ্‌কা মুখ তুলে তাকিয়ে আকাশ আর মাটির উঁচু দেয়ালের মত অথচ ক্রমে ঢালু হওয়া বাঁধ ছাড়া কিছু দেখে না। গরমে জল একেবারে শুকিয়ে যায় বলে মাছ ছাড়া হয় না। মোটা মোটা ডালের কতকগুলো বুনোগাছের ডাল একেবারে জলের ভেতরে অবদি চলে গেছে। আবছা আলোয় পাতাগুলোকে কালো দেখায়। জলের ধারে অশ্‌কার ঠিক পাশেই ধুতরো ফুলের মত বড় বড় হালকা বেগুনি রঙের ফুল ফুটে আছে। অন্ধকার খানিকটা পাতলা হলেও ফুলের রঙ বোঝা যায় না। প্যান্ট পরতে পরতে অশ্‌কা ছুটে ওপরে উঠে আসে। বাঁধের ওপর পুকুর ঘিরে ছোট ছোট ঝোপ। তালগাছও ঝোপের মত বেঁটে হয়ে আছে। অশ্‌কার মাথা ছাড়িয়ে একটুখানি উঁচু। গাছগুলোর গুঁড়ি বেশ মোটা। পাতা না দেখলে তালগাছ বলে মনে হয় না। বাঁধের ঠিক নিচ থেকেই ধানখেতের শুরু। কিছু জমিতে এখন চাষ হয় না। সেগুলো সবই রাস্তার বাঁদিকে। লাল রঙের রাস্তাটাই খুব গর্ত, পাথর। কাঁকর। ধানগাছগুলোর শীষ বেরিয়েছে। শেষরাতের হাওয়ায় ঘন সবুজ গাছগুলো ছায়া ছায়া দোলে। আলো-আঁধারিতে মনে হয় ঘন রঙের মোটা চাদর বিছানো, মাঝে মাঝে কেউ ঝেড়ে দিচ্ছে অনন্ত আকাশের নিচে বিছানো এক অনন্ত

শয্যা। অশ্‌কা পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে গোটা আকাশ ও স্থলভূমি দেখে নেয়। ওপরের আকাশ আর নিচের স্থলভূমির গোটাটাই দেখে নেয়। গতকাল ওর ঘোষেদের গরু চরানোর কথা ছিল। ও যায় নি। স্কুলেও যায় নি। কালকে রান্না হয় নি। সেটা ওর কাছে নতুন নয়। বাপ বেঁচে থাকতেও ত মাঝে মাঝে রান্না হত না। বাবুঘরের ভাত-তরকারি, বাসী কি সাঁজো রুটি-ডাল খেয়ে কত দুপুর, রাত কেটেছে। তবে বাবু থাইকলে মাংস আইনথ হাট থিক্যা, দকানের চা, চপ, ঘুগুনি, জিলাবি। মেলায় যাথুম। মা ভালবাইসথ। বইলথ, 'নুনা পড়বে বেটা। চাকরি করবি।' ইখন বলে, 'পড়্যা কী হব্যাক? হ্যান, ত্যান ঢেক হব্যাক?' কাল ববিদিদি সইন্‌ধাকালে ভাতের কাঁসি নামাই দিয়্যা ভিডিও দেইখতে গেল। আমি যাব বইলথে উয়ার কী রাগ, কী রাগ! পইড়ব না, ভিডিও দেইখব না বাগা-আ-লি কইরব! কেনে? এই 'কেনে'র উত্তর আকাশে লেখা নেই যে ও মেঘের ওপর, পাতলা ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ওপর শেষ রাতের ভাঙা চাঁদ আর তারার আলোয় পাঠ করবে। এই 'কেনে'র উত্তব দিগন্ত পর্যন্ত চলে যাওয়া ধানখেতের ঢেউয়ে ঢেউয়ে হিল্লোলিত হয় না যে ও দেখে নেবে। বাতাসে ওর প্রশ্ন যেন প্রতিধ্বনিত হয় 'কেনে?' 'কেনে?' 'কেনে?' আর উত্তরহীনতায় ওর ছোট শরীরখানা ভারী হয়ে থাকে এই আকাশ-বাতাস আর শস্যখেতে লগ্ন হয়েও। যেন এই অসহায়তায় মানবশরীর তার প্রকৃতিসংলগ্নতা হারায়। প্রাকৃতিক হয়েও সে মানুষী ভাবনায় প্রোথিত হয়ে থাকে। বাঁধের ওপব তার ছোট মানবশরীর একটা নিরুত্তর প্রশ্নচিহ্নের মত আর-এক অন্ধকারের মূর্তি হয়ে থাকে। সেই ভারমুক্ত হবার জন্যই যেন হঠাৎ উড়ে যাওয়া একটা প্যাঁচার কর্কশ চিৎকারে ওর এমন চমক লাগে যে এতক্ষণের ভার যেন আলগা মাটির মত ঝুরঝুর ঝরে পড়ে ওর শরীর থেকে। মুখ উঁচু করে ও প্যাঁচাটাকে রাস্তার সমান্তরালে উড়ে যেতে দেখে। পাতলা অন্ধকারে একটা গাঢ় ছায়া কি আদিমকালের কোন অজানা প্রাণীর মত প্যাঁচাটা উড়ে যায়। ঝটপট শব্দে সচল অন্ধকারের মত মিলিয়ে যায় প্যাঁচাটা। সেই শব্দ ক্ষীণ হতে হতে দূরে চলে যায়। অশ্‌কা দুই হাত দুদিকে ছড়িয়ে দেয়। পাখিটার মতই ঝটপটায়। দূরে কলিআরির আলো দেখে। সামডি রোডের ধারে কেমিকাল ফ্যাক্টরির কালো নিশ্চল চিমনিটার গায়ে জোরালো আলো দেখে। শেষরাতের পাহারাওআলাদের শেষ হাঁক চারটের সময়। তারাও এবার ঘরে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু এই জনহীন প্রান্তরে এই বালক ছাড়া কেউ নেই। বোধহয় এমনি সময় এইসব প্রান্তর এমন জনশূন্যতায় এমন অলৌকিক হয়ে ওঠে। সেই অলৌকিক শূন্যতায় দাঁড়িয়ে অশ্‌কার সমস্ত শরীর মুচড়ে এক আনন্দ উঠে আসে। অকারণ। অকারণ। ও দুহাত ডানার মত নাড়তে নাড়তে হুড়মুড় করে নেমে আসে বাঁধের ঢাল বেয়ে। পায়ের নিচে কাঁকরমাটি ফোটে। ও টের পায় না। যেন উড়ে যায় গতির পুলকে। যেন হঠাৎ-জাগা এই আনন্দ-বিহ্বলতায় ভুলে যায় একটু আগের মানুষী দুঃখ। ছুটতে ছুটতে ও সেই কালভার্টটার ওপর আসে যার দুধারের বাঁধানো বসার জায়গায় কেউ চক দিয়ে লিখে রেখেছে 'আই লাভ ইউ। 'আই লাভ ইউ'।

বাঁধানো জায়গাটায় বসে ও একটু দম নেয়। শুয়ে পড়ে। তারাগুলো ম্লান হয়ে আসে। চাঁদের আলোও ম্লান হয়ে আসে। একটা ব্লটিং কাগজের টুকরোর মত ওটা সেঁটে থাকে নীল আকাশে। সেদিকে তাকিয়ে অশ্কার সমস্ত শরীর মন্থন করে কান্না উঠে আসে। একা বোধ জাগে ওর। অথচ একাকীত্বটা বোঝে না। শূন্য হয়ে থাকে ও। অথচ শূন্যতাটা বোঝে না। গলার কাছে কান্নাটা বমির মত আটকে থাকে যেন খানিকটা কেঁদে ফেলতে পারলে শরীরটা ঝরঝরে হত। অস্বস্তিটা কাটাবার জন্য ও উঠে দাঁড়ায়। বসতি থেকে এতটা দূরে এসেছে বুঝে ওর এবার একটু ভয় করে। সোজা তাকিয়ে দেখে কতকগুলো মূর্তি কী যেন টেনে টেনে আনছে। তাদের অস্পষ্ট কথা যেন শোনা যায়। ভয়ে ও চোখ বুজে ফেলে। এ ভাবেই থাকে কিছুক্ষণ। শব্দটা আরো এগিয়ে এলে ও বুঝে যায় সাইকেল আর পায়ের আওয়াজ। লোড করা সাইকেল। ও ত শব্দ শুনেই বলে দিতে পারে ট্রাক না বাস। বাস না মিনি। মিনি না টেম্পো। টেম্পো না অটো। রাস্তার ধারে ঘর ওদের এইসব শব্দ শুনে শুনে, এইসব শব্দ চিনে চিনেই ত বড় হয় ওরা। সেই নির্ভুল আন্দাজেই ও সাহস ফিরে পায়। চোখ খোলে। ছ-সাত জন লোক সাইকেল হাঁটিয়ে নিয়ে আসে। এক-একটা সাইকেলে অনেকগুলো বস্তা। সিমেন্টের ছোট বস্তাও আছে, জ্যালজেলে বড় বস্তাও আছে, যাতে আলু আনা হয় দোকানে। রাঙা, ডাবর, সংগ্রামপুর এইসব কলিয়ারি থেকে রাতের অন্ধকারে এইভাবে কয়লা পাচার হয়। আগে আরো আসত, সার বেঁধে। এখন পাহারা জোরদার হওয়াতে কমে গেছে। ডাবরমোড়ে ঝুড়ি আর সাইকেলের কয়লার দর বাড়ছে। হয়ত এ-কারণেই। এদিকে ডামপারের সংখ্যা বাড়ছে। যেমন বাড়ছে ভিডিও পার্লার। কাঁটার ওজনে যে চুরি হয় তার পদ্ধতি সরল ও সূক্ষ্ম। সেই কয়লার হিশেব কাগজে-কলমে ঠিক থাকে। দিনের আলোয় তা সি আই এস এফ-এর সামনে দিয়ে ধুলো উড়িয়ে জি টি রোড ধরে আসানসোলের দিকে চলে যায়। কিন্তু সাইকেলের কয়লা ত চুরিরই মাল। 'না বলিয়া পরের দ্রব্য' নেবার চুরি। সে চুরি চটপট ধরাও পড়ে। সাইকেল বাজেয়াপ্ত হয়। লোকগুলো মার খায়। দু-চারদিন হাজত বাস করে। কান্নাকাটি করে। কয়লার বস্তা যায়, সাইকেল যায়, টাকাও যায়। তবু শেষ পর্যন্ত সব কাজেই কিছু না কিছু লোক যেমন লেগে থাকে এও তেমনি। দোকানে দোকানে কয়লা চাই। হোটেলে চাই। সব বাড়িতে ত গ্যাস নেই, কাজেই বাড়িতে বাড়িতেও 'কয়লা লিবে গঁ?' হাঁক পাড়তে হয়। সেই সব লোকই কয়লার বস্তা বোঝাই সাইকেলগুলো এই ভোররাত্রে ঠেলে ঠেলে আনে। টেনে টেনে আনে। লোকগুলোর সর্বাঙ্গ কয়লার গুঁড়ো আর কালো ধুলোর আস্তরণে ঢাকা। কেউ নীল প্যান্ট হাঁটু অবদি গুটিয়ে, কেউ লুঙি উলটিয়ে দুভাঁজ করে গিঁট মেরে পরে। প্যান্ট আর লুঙির নিচ দিয়ে ওদের শিরা ওঠা রোমশ, পেশী জাগানো পাগুলো টানটান হয়ে থাকে। খয়ে যাওয়া শস্তার হাওয়াইতে শব্দ হয় ফটাৎ ফটাৎ। সাইকেলের মালিকদের মত সাইকেলগুলোরও রঙ চটা, শ্রীহীন চেহারা যেন ওরাও ওদের মালিকদের মত সি আই এস এফ নয়ত বি এস এফ-এর ঠেঙানি খেয়েছে। সাইকেল, নতুন কেনে না কেউ, মিহিজাম থেকেও

সেকেন্ড হ্যান্ড চোরা সাইকেল কারো। কারো এমনিতেই সেকেন্ড কি থার্ড হ্যান্ড সাইকেল। বহু সন্তানের মায়ের মতই সেগুলো বিবর্ণ। জীর্ণ কিন্তু সহনশীল ও পরিশ্রমী।

সাইকেলগুলো কালভার্টের ওপর উঠে এলে অশ্‌কা সামনের জনকে চিনতে পারে। দশরথকাকা। ওদের গাঁয়ে একটু ভেতর দিকে থাকে। দশরথ মানুষটিই ছোটখাট, শক্তসামর্থ্য চেহারা, মাথায় কাঁচাপাকা কোঁকড়া চুল। ঠোঁটের দুপাশের রেখা গাঢ় ও তীব্র। ও কথা বেশি বলে না। বয়সের তুলনায় বেশি পাকা চুল, নাকের দুপাশে দুটো তীব্র বাঁক খাওয়া গভীর রেখা আর কথা-কম-বলা ওর চেহারায় বেশ একটা মুরব্বি মুরব্বি ভাব এনে দিয়েছে। ও হাসে কম, কিন্তু হাসলে বয়স আর সারল্য ধরা পড়ে। দশরথ এখানে এসে একটু দাঁড়ায়। কান থেকে একটা বিড়ি নিয়ে পেছনের জনকে বলে, 'ম্যাচিস?' পেছনের সাইকেল আগুপিছু দুজন ঠেলে। পেছনের জন প্যান্টের পকেট থেকে দেশলাই বের করে জ্বালে। সেই লালচে আলোয় দশরথের মুখের রেখাগুলি স্পষ্ট হয়। ধোঁয়া ছেড়ে সে ওই অবস্থাতেই ঘাড় ঘোরায়। গলাটা টানটান হয়ে যায় তাতে। 'কে ব্যাটে ইখানে? অ, বনার ছিল্যাট? কী কইরচ্যিস এই আঁধারে?'

'মাঠে আলুম কাকা।'

'এত ধুরে আলি কেনে?'

'অমো-ও-ও নি।'

পেছন থেকে একজন বলে ওঠে, 'দশরথদা ডেরি হঁয়্যা যেছ্যে গঁ। চল, চল, টাইম নাই।'

'ইঃ, আমাদের নারানের যে দেখি খুউব টাইম-জ্ঞান? ডরপুক আছিস বল? শালোর পঁদে এখুনো সি আই এস এফ-এর বুটের লাথি লেগ্যে আচে।'

'অমোনি বোলো না হে, তুমাদিগের পঁদও খালি যাবেক নাই।' নারান বলে। তার চেহারাটি ভাল, বেশ কাটাকাটা নাক চোখ চিবুক। খুব ফরশা চামড়ায় কয়লার কালিতে মনে হয় কেউ এলোপাথাড়ি ব্রাশ চালিয়েছে। নারানের বয়স কম, এ-লাইনে নতুন তা ওর চামড়ার রঙ দেখলে বোঝা যায়। ঘরে নতুন বউ ফেলে আসতে তার মন চায় না। কিন্তু পয়সা না হলে বউ খুব তাড়াতাড়ি পুরনো হয়ে যাবে, চোপা কইরবেক এটা দশরথ বলেছে।

কয়লা নিয়ে সাইকেলের লোকগুলো রূপনগরের নতুন বাড়িগুলোর দিকে চলে যায়। অশ্‌কা পা ঝুলিয়ে বসে থাকে। পা দোলায়। সেই দোলানিতে ওর একটা 'পইদ্য' মনে পড়ে। পা সামনে এগয় ও বলে, 'কুমর পাড়ার' জোড়া পা গুটিয়ে আনে সেই তালে বলে, 'গরুর গাড়ি'। সবটা ওর মনে নেই। ও বলে চলে, 'বুজাই করা ক-অ-ল্-সি হাঁড়ি।' রাস্তার দিকে তাকিয়ে ও হেসে ফেলে। কঁ্যাচর কোঁ, কঁ্যাচর কঁ্যাচ করতে করতে হাঁড়ি কলসি বোঝাই একটা গরুর গাড়ি আসছে। খড়ের মধ্যে মাটির বাসনগুলো রাখা। বাঁশের উঁচু ঘের দেওয়া গাড়ির পেছন পেছন মাথায় গামছা জড়ানো লাঠি হাতে ওর বয়সি একটা ছেলে। অশ্‌কা লাফ দিয়ে নেমে পড়ে মাটিতে। ওর মনে পড়ে আজ মিহিজামের

হাট। গাড়ি সেখানেই যাবে। ও গাড়িটার পাশে পাশে আলগা হাঁটে। ঠিক দৌড়েও নয়, হেঁটেও নয়। দৌড়লে দম পাবে না। হাঁটলে ছন্দ পাবে না। খানিকটা টাট্টু ঘোড়ার দুলকি চালে কনুইয়ের কাছে হাত ভেঙে বনমালীর কিপ্টো বেটা বাপের ঢঙেই যেন চলে—'কুমর পাড়ার গঅরুর গাড়ি/ বুজাই করা ক-অ-ল্-সী হাঁড়ি/ গাড়ি চালায় বংসীবদন/ সোংগে যি যায় ভাইগনা মোদন।' গাড়ির লোকটা একবার তাকিয়ে আবার গাড়ি চালায়। ছেলেটা হাসে।

অশ্‌কা ঠিক করল ও গরুবাগালিই ধইরবে। বডডো খিদা পায় ওর। পেটটো জ্বল্যে যায় গঁ!

কুড়ি

গোষ্ঠ

'যদি টিকে যায় বুঝলি সুখী তোর ছেলে আমার ঘরকেই মাইন্দারি কইরবেক। ঘরের ছিল্যার পারা রইবেক, ছুটো ছিল্যা যার তার কাছে দিস না।' কথাটা মাধব ঘোষ এ-ভাবেই বলে। ছেলেরা বড় হলে, চাটটি পড়ালিখ্যা শিখলে চাষাঘরে হয় মুশকিল। তখন কেউ বেলা আটটায় ঘুম থেকে উঠে নটায় ভাত খেয়ে বাস ধরতে ছোটে, কেউ সকাল সকাল উঠে দোকানে গঙ্গাজল ছিটোতে যায়। কেউ চাকরি করবে বলে পাড়ার ক্লাবে তাস পিটিয়ে বেলা গড়িয়ে বাড়ি আসে। তার তিন ছেলের কেউই লাঙল ধরে না। বড়টা ত চিরকালই বাউণ্ডুলে। মেজটা কথা শুনত। মায়ের ন্যাওটা ছিল খুব। ভাল রেজাল্ট করে প্রাইভেট পড়ার মাস্টারের সঙ্গে বেলুড়ে ভরতি হল। মাস্টারের কি চেনাজানা ছিল বলে ভরতির পরীক্ষা দিতে হয় নি। সেই ছেলে ডি ভি সি-তে ভাল চাকরি করে ত সে হালবলদের খবর কী জানবে? জমি-জমা বেশি হোক চাই অল্পই হোক দেখভাল করার লোক ত চাই। মাধব এক-একসময় এক-এক শিফটে ডিউটি করে। তারই-বা সময় কই? জমি বর্গায় দিলে বেটারা ঠিক পার্টি লাইনে হক আদায় করবে। তখন মাধব ঘোষ আর কমরেড নয় জমির মালিক। জ্ঞাতিকুটুমের শত্রু। জ্ঞাতিগুষ্টিও ত লাল ঝান্ডা। কাজে কাজেই দু-পাঁচজন মাইন্দার, কামিন থাক—জল হলে বীজতলা থেকে যত্ন করে চারা নিয়ে পুঁতবে, খেত নিড়াবে, ফসল পাহারা দেবে। ধান কাটবে, পাছড়াবে, বস্তা করে কলে দিয়ে আসবে। জনে জনে দশ কেজি করে ধান বেঁটে দিলেও সংবচ্ছরের চাল ঘরে থাকবে। ওর বউ ননীবালাও আর পারে না। তার বয়স হয়েছে। বিয়ে হওয়া ইস্তক সে শুয়ে-বসে আলিস্যি করে নি। রাত থাকতে উঠে গোয়ালঘরে, ঘরদোর ঝাড়পোঁছ করবে, রাঁধাবাড়া, ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া কোন কাজটা সে করে নি? তারই মধ্যে নাইট ডিউটি না থাকলে ছ-ফুটি মাধবের হাড়কাঠামো তার চার ফুটি শরীরে ধারণ কারেছে বছর বছর। তাতেই তিন ছেলে, চার মেয়ে। বড়ছেলের বউ ঘরের কাজকর্মে তাকে অষ্টপ্রহর সাহায্য করে। মেজর বউ এক ছেলে নিয়ে অস্থির।

তাছাড়া সে 'নেকাপড়া জানা মেয়েছেলে' ঘুরিয়ে শাড়ি পরে, বাথরুমে তোলাজলে চান করে। সে কি এতসব পারে? নাকি এতসব করবে? তিন মেয়ের বিয়ে হয়েছে। মেয়েগুলোর কয়লার মত রঙ হলেও জমি দিয়ে কেনা মাধবের জামাইরা মোটামুটি ভাল। ছোটমেয়ে সীমা মাধ্যমিক দুবারে তিনটি বিভাগ টপকিয়েছে—সামনের বার শুধু সায়েন্স বিভাগটা দিলেই মাধব পাত্র খুঁজবে। আজকাল গোয়ালারাও পাশ দেওয়া মেয়ে খোঁজে।

মেজবউ আসার সুবাদে সুখীর চাকরি। মেজবউ-এর শাড়ি, শায়া, চাদর, বালিশের ওআড়, বাচ্চার কাঁথাকানি কাচার জন্য আলাদা দশটি টাকা বীরেন দেয়। তিনবাড়ির মধ্যে এই বাড়িটাই সবচেয়ে কাছে বলে পয়লাই এ বাড়িতে আসে সুখী।

মাধব ঘোষের তিনটি গাই, একটি বকনা। দুটি গাই দুধ দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে, একটি দুধেলা।

গরু তিনটে আর বকনাটাকে তাড়িয়ে মাঠে নিয়ে আসে অশ্‌কা। তার এই দশ-এগার বছরের জীবনে এই প্রথম সে পাচন হাতে গরু তাড়াতে মাঠে যায়। তার বয়সি ছেলেরা, যারা বাগালি করে, তাদের অনায়াস দক্ষতা ও প্রথম কদিন পায় না। তার বাপ ত তাকে মাইনদার বানাতে চায় নি। বাগাল বানাতে চায় নি। সে ত বানান করে নিজের নামটি লিখতে পারে। সে ত বানান করে গিরিডি আর উশ্রী নামগুলো শিখেছে। কিন্তু গরুগুলোর পেছনে ছুটতে তার খারাপ লাগে না। এমনকি মাঠে যাবার আগে দলবেঁধে বাবুদের ফেলে দেওয়া বাতিল জিনিশ ঘাঁটতে, কি বস্তায় পুরে ফেলতেও তার এক নতুন অভ্যাস তৈরি হয়। এইসব জিনিশ ওরা বিক্রি করে যাদের কাছে তারা সাইকেল-ভ্যানে জড়ো করে নিয়ে যায় বরাকর। মিহিজাম। অনেক শিশি-বোতল, কৌটো, পলিথিনের ঠোঙা বা ভাঙা কিছু দিলে তবে পঁচিশ/তিরিশ/পঞ্চাশ পয়সা। তবু সেই পয়সাটা ওরা নিজেরা খরচ করতে পারে। কেউ বিস্কুট কেনে, কেউ সেঁউ ভাজা, কেউ কাটা নারকেলের ফালি। ওদের পেটে ত সবসময়ই খিদে থাকে। সারাদিনই থাকে। বাগালির পয়সা, বাবুঘরে কাজের পয়সা, দোকানে কাজ করার পয়সা খরচ করার হক ওদের নেই। ছোট ছিল্যা পয়সা লিয়ে কী কইরব্যাক? তা সেই পয়সায় ওদের বাপ চা খায়, বিড়ি খায়, দু-চার গ্লাশ মদও খেতে পারে। সেই পয়সায় মা চালডাল কেনে, মশলাপাতি কেনে। ছেলেমেয়ে ডাগর হলেই পয়সা চিনবে। বাপ-মাকে দিবেক নাই। অশ্‌কার বাগালির পনের টাকা তাই ও চোখেও দেখে না, কিন্তু ববিতার উপার্জনের টাকা ববিতা দিলে তবে ত সুখী আঁচলে বাঁধতে পারে, কলসিতে রাখতে পারে। দাঁতে গুড়াকু দিতে পারে মেয়ের উপার্জনের পয়সায়।

অন্য ছেলেমেয়েদের কেউ কেউ ছাতা আনে। মস্ত বড় বাঁকানো হ্যান্ডেলের কালো ছাতা। অশ্‌কার ছাতা নেই ও বেলা হলে মাথায় গামছা বাঁধে—বনমালীর কেনা লাল গামছাখানা। বেশ বড়সড় গামছাটা, কাচার পরে রঙ উঠে অতটা লাল লাগে না আর।

মরা বাপের গামছাখানা মাথায় জড়িয়ে পাচন হাতে অশ্‌কা একছুটে বাবুর বাঁধে আসে। এ পুকুরে সারা বছর জল থাকে। আগে, অশ্‌কা শুনেছে এখানে যখন ধু-ধু ডাঙাল ছিল, পুখর ধারে টাওয়ারটো ছিল না, এত ঘরও ওঠে নি, রূপনগরের, সীমান্তপল্লির জায়গায় ধানী জমি ছিল, এমনকি সেও ত বাপের কাঁধে কাঁধেই ঘুরতে ঘুরতে এইসব বাড়ি, রাস্তা, কে জি স্কুল হতে দেখেছে, শুধু সীমান্তপল্লির খানকতক বাড়ি জেগে থাকত ধানখেতের মধ্যিখানে, তখন বাবুর বাঁধের শ্মশান ছিল 'পার্মেন্টি'। এখন বোধহয় লরি, টেম্পো ভাড়া করতে পারলে বাউরিরাও মড়া নিয়ে অজয়ের ধারে যেতে চায়। এখানে কোনো শবই কাঁধে কাঁধে যায় না। আর কাঁধে কাঁধে যায় বলেই বাউরিদের মড়াগুলোই এখনো বাবুর বাঁধে পোড়ে। অথচ গ্রিল দেওয়া বারান্দায় চা কফি খেতে খেতে নইলে ছাদে কাপড় মেলতে মেলতে এখনো বাবুর বাঁধ নামে পুকুরের অর্ধেকেরও বেশি এসময় থেকেই পদ্মফুলে ভরে থাকে দেখা যায়। দুহাতের মুঠোয় আঁটে না এমন বড় বড় নরম শ্বেতপদ্ম।

অশ্‌কার পায়ের পাতা অল্প জল ও কাদায় ডুবে থাকে। নির্জন দুপুরে এই বালক যেন বাল্যকাল ছেড়ে যেতে চায় না। তার দিনগুলো যতই কর্কশ ও একঘেয়ে হয়ে ওঠে, হয়ে উঠতে চায় তার বালক-মনের অমল বিস্ময়ে সেই দিনগুলোরই কর্কশতা ও একঘেয়েমি অবান্তর হয়ে যায়। আকাশের ধোয়া নীলে ও মেঘের শুভ্রতায় তার এই আবেগ এক শুদ্ধতা পায়—বাল্যের অমল শুদ্ধতা। পুকুরের ধারে এখনো পদ্ম ফোটে নি। মাঝখানে ফোটা ও আধফোটা পদ্ম তার দীর্ঘ ডাঁটাসমেত দোলে। বড় বড় পাতায় খালুচ পোকারা হাঁটে। এই আবেগে বালকমাত্রেই কমবেশি আক্রান্ত। অশ্‌কার সারা শরীরে কাঁটা দেয়, ও আর একটু এগয়। পাঁকে ওর হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়। পায়ে পোকা কামড়ায়। পা কুটকুট করে। ও হাত বাড়ায়। নাগাল পায় না। সাঁতার জানে না বলে ওর ভয় করে। পদ্মবনে নাকি কারা থাকে। যদি জলের তলা থেকে তারা তাদের শীর্ণ হাত বাড়িয়ে ওর পা জড়িয়ে ধরে? পদ্মবনে ত মা মনসাও থাকেন। যদি ওর পায়ে দংশন করেন? কিন্তুক কী সোনদর ফলগুল্যান। ওই ফুলের বীজে খই হয়। অনেকগুলো তুলতে পারলে মা ভাইজত। বালি এনে দিত অশ্‌কা। চা দিয়ে খেত পদ্মবীজের খই! ও আবারও হাত বাড়ায়! লাঠিটা দিয়ে একটা ফুল টানতে যায়, কিন্তু পদ্মের ডাঁটা একটু হেলে যেন হেসেই সরে যায়।

'এ্যাই, এ্যাই ছোঁড়া পাঁকে পড়বি যে! ওঠ, ওঠ, দিল জলটাকে ঘুলিয়ে! একেই চারে মাছ আসতে চায় না—সব গিয়ে ঢুকেছে পদ্মবনে!'

অশ্‌কা তাকিয়ে দেখে দাড়িওয়ালা বাবুটো। এই বাবুটির মাথায় জটা, কুঞ্চিত ঘন চাপদাড়ি বুক পর্যন্ত, গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা। চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন বানানোর কারখানায় চাকরি করতে যান সেন র‍্যালে চেপে। ডাবরমোড়ে সম্প্রতি বাড়ি করেছেন। বাড়িতে ঢোকার মুখেই ডানদিকে গাধার পিঠে মা শীতলার বেশ বড়সড় মূর্তি। রিটাআর করতে বছর পাঁচেক বাকি। পুজো করা ছাড়া মাছ ধরার নেশা আছে। অশ্‌কা ভয় পায়। পিছু হটে ও জলের ধারে রাখা কাপড় কাচার চ্যাটালো পাথরের ওপরে পা ঘষে ঘষে

পরিষ্কার করে। আড়ে আড়ে দেখে দাড়িওয়ালা বাবু বঁড়শিতে টোপ গেঁথে সামনে পেছনে দুলছেন সুতোসমেত। সাঁ-আ-ই করে টোপটা শূন্যে উঠে গেল, তারপর টুপ করে পদ্মবনের কাছে জলে ডুবে গেল। ফাৎনার দিকে চোখ রেখে দাড়িওয়ালা বাবু বসে একটা সিগারেট ধরান।

অশ্‌কার খুব মাছ ধরার শখ। বনমালী মাঝে মাঝে মশারির টুকরো নিয়ে বর্ষায় পুকুর, বাঁধ ওপচানো জলে মাছ ধরতে যেত। সে-রকম কানি দিয়ে মাছ অশ্‌কাও ধরেছে। সীমান্তপল্লির রাস্তার ধারে একটা নাবালে বেশি বৃষ্টি হলে জল জমত। ধানের জমি, অথচ বিক্রি হবে বলে ধান চাষ হয় না এমন অবস্থায় যতদিন ছিল। সেখানে বেলা দুটো-আড়াইটে পর্যন্ত ছেলে-বুড়ো-আধাভদ্র আর বাউরি ডোমরাও হাঁটু পর্যন্ত কাদায় ডুবিয়ে কোমর নুইয়ে নুইয়ে চ্যাং মাছ ধরত। অশ্‌কাকে বনমালী আলের ওপর বালতি নিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখত। শাটি, জবা, ববিতারাও নেমে পড়ত কাদাগোলা থকথকে জলে। সেই মাছ দুদিন ধরে খাওয়া। অশ্‌কার এই মাছ ধরায় তেমন শখ নেই। ওই বাবুর পারা মস্ত ছিপ আর ঘোরানো লাটাই-এর মত সুতো ছাড়ার কল লাগানো ছিপ হলে সে দশ/বিশ কেজি রুই কাতলা ধরে দিতে পারে।

অশ্‌কা গামছাখানা ভিজিয়ে নিয়ে জল ফেলতে ফেলতে ওপরে উঠে এল। এদিকে এখনো কিছু জমিতে চাষ হয়। গাছগুলো ফনফনিয়ে বেড়ে উঠেছে। ওর ভয় হয় গরুগুলো যদি খেতের ভেতর সেঁধিয়ে যায়। ও দৌড়ে আলের ওপরে ওঠে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে গরুগুলোকে দেখতে পায় না। বাছুরটাকেও না। ও বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে দৃষ্টিটাকে আরো উঁচুতে স্থাপন করে—তারপর হঠাৎ দৌড়তে শুরু করে। ছোট ছোট পদক্ষেপে। একটু পরেই ওর চলনে একটা স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দ আসে—দুটো লাফের পরে খানিকটা দৌড়ে যাওয়া, হাত দুটো দুদিকে প্রসারিত, আলের ওপরে শরীরের ভারসাম্য রাখবার জন্য সে দুটো নীড়ে যেন পাখি ডানা ঝটপটায়। বনমালীর কিপ্টো বেটা রাখাল রাজা হাতে লাঠি নেচে নেচে যায়। বাঁশি ছাড়াই নাচে। সেই নাচের তালে ধানখেতের হিল্লোলিত সবুজের মাঝখান দিয়ে একটা অশ্রুত সুরের টান তৈরি হয়। যেন এক স্বর থেকে অন্য স্বরে যাবার কালে প্রতিটি শ্রুতি ছোঁয়া এক অসামান্য মীড়। জলের রেখাও ক্ষণকালের জন্য হলেও দেখা যায়। সুরও ত শ্রবণগ্রাহ্য ইন্দ্রিয়ানুভূতি। কিন্তু এই অশ্রুত মীড় কোনো ইন্দ্রিয় দিয়ে শ্রবণ করা যায় না। এ সুর তাই অলৌকিক হয়ে ওঠে শুধু আকাশের নীল, মাটির লাল আর ধানখেতের সবুজ আলোক শঙ্কুতে।

দূরে, মাঠে গরু আর রাখালের ছবিগুলো মূর্তিতে আসে। আরো কাছে এলে মূর্তি প্রাণ পায়। অশ্‌কা সেই প্রাণময়তার মধ্যে ঢুকে পড়ে। অল্প হাঁপায়।

লক্ষ্মী, ঝরনা আর ছবির ঝুড়িতে শুকনো গোবর আর কাঠকুটো উঁচু হয়ে আছে। আজ ওরা আগেই ফিরবে। উতা, বিশু আর সপইনা গাব্বু পিল খেলছে। পলা একটা ঝুড়ি নিয়ে একটু দূরে গোবর কুড়োয়। গরু, বাছুর, মোষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ঘাস, বুনো ঝোপ খাচ্ছে। ঘাসই দুর্লভ। অশকা নিজের গরু-বাছুর দেখে নেয়। বলে, 'শালা,

গাইগুলান হেভি খায় ব্যটে। পেটের খোলটো ভরেই না।'

ঝরনা পা ছড়িয়ে বসে ছিল, বলে, "কেনেরে তুর প্যাটটো ভর‍্যা থাকে বুজি?'

একটা ছোট মতন মহুয়াগাছ একা দাঁড়িয়ে। তার গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে ধনা বসেছিল। ধনা গগন মাজির মাহিন্দর। তার ডান পায়ে গোদ, বর্ষায় বাড়ে। এখন কিছু কম। সেই ফোলা পাটি টান করে মেলে সে হাত বোলায়। একটা বিড়ি ধরিয়ে এদের বলে, 'এ নুনুং দেনা টুকুদু হাত বোলাএ?' 'আহা হা!' ছবি ওর কাছাকাছি বসেছিল বলেই বোধহয় হাত নেড়ে ঝংকার দেয়। 'ধনা জেঠা তুমার গদা পায়ে কে হাত দিবেক?'

'পয়সা দিব।' ধনা হাতছানি দেয়। 'ঘরকে যাও, জেঠি দিবেক।' ছবি উঠে অশ্‌কা আর ঝরনার মাঝখানে বসে। 'আচ্ছা হারামী বুড়াটো, পয়সা দেখাইচ্যে।'

অশ্‌কার খিদে পায়। ওর প্যান্টের পকেটে একটা হলুদ হয়ে যাওয়া শসা আছে। শসাটা এনে সুখী বলে, 'টাটকা জিনিশ দিথ্যে কাকীমার মন উঠে না।' তা সেই বোঁটার কাছে ঈষৎ কোঁচকানো হলুদ শসাটা অশ্‌কার প্যান্টের পকেটে। পকেটে হাত চেপে ও শসাটার কঠিনতা অনুভব করে। ভাবে উতা, বিশু, পলা, সোপইনা, লক্‌খী উয়াদের কাছকেও কি এমনি শোসা। আনজীর আছে? একা খাত্যে লইজ্জা বল্যা কেউ খাচ্যে না? 'লে রে. অশ্‌কা খা।' লক্ষ্মীর প্রসারিত হাতে দুপিস্ শুকনো বাসী পাউরুটি। অশ্‌কা একটু ইতস্তত করে তারপর বাঁ হাত পকেটে ঢুকিয়ে শসাটি বের করে আনে, ডান হাত দিয়ে এক পিস পাউরুটি তুলে নেয়, বাসী হওয়াতে কুড়মুড় করে ভেঙে যায়। দাঁতের পেষণে। শসাটা লক্ষ্মীর দিকে বাড়াতেই ও হেসে মাথা নাড়ে। 'লিব্যি না? পাঁরুটি খাব্য নাই তালে।' ছোট টুকরোটা লালায় ভিজে জিভ, তালু আর দাঁতে আটকে আছে বলে কথা জড়িয়ে যায় অশ্‌কার। বড় টুকরোটা ও এগিয়ে দেয় লক্ষ্মীর দিকে। লক্ষ্মী খিলখিল করে হেসে শসাটা নিয়ে ভাঙে। বড় টুকরোটা অশ্‌কাকে দেয়। ওরা মুখোমুখি পা ছড়িয়ে বসে আস্তে আস্তে খায়। খাদ্যের প্রতিটা কণা সারা শরীর দিয়ে আস্বাদ করতে করতে খায়।

'চলরে, শোসা পাঁরুটি মাইরল্যে চলিবেক নাই। গবর কাঠ লিয়ে ঘরকে ঝাব তবে মা রাঁইধবেক।' ঝরনা তাড়া দেয়। লক্ষ্মী, খাবারে গাল চটচটে হয়ে আছে, উঠে পড়ে। দলের মধ্যে ওই সবচেয়ে ছোট কিন্তু ঝুড়িটা ছোট নয়। পলা ওর নিজের ঝুড়ির মধ্যে ছাতাটা রাখে। অশ্‌কাকে বলে, 'গাইবাছুরগুলান তাড়াই আন, ধুরে গেলে আইনতে লাইরবি। তর বাগালিতে মন নাইরে অশ্‌কা।' লক্ষ্মীর ঝুড়িটা অশ্‌কা উঠিয়ে দেয়, ছবিরটা উতা, ঝরনারটা ও নিজেই মাথায় না উঠিযে একটু হেলে কলসির মত কাঁকালে নেয়। তিন বালিকা ঝুড়ি নিয়ে চলে, চলতে চলতে হাসে, ওদের টুকরো কথা আর হাসিতে ওদের চলন ভেঙে ভেঙে যায়। অশ্‌কা গাইগুলোকে আনতে ছোটে। লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে তাড়িয়ে আনে। গরুগুলো এখন এক মাঠেই চরে। অশ্‌কা এক পাক ঘুরে আসে গরুর পালের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে, কোনোটার সামনে দিয়ে, কোনোটাকে ডাইনে রেখে, কোনোটাকে বাঁয়ে। বারকতক যেন লুকোচুরি খেলার মত দৌড়য়। স্বপন মজা পায়, তার বয়স আট বছর, নাকে পোঁটা গড়ায়। এতক্ষণ ও মুখে আঙুল দিয়ে একটা

দাঁত নড়ছে কদিন, ফেলার চেষ্টা করছিল, অশ্‌কাকে এলোমেলো দৌড়তে দেখে ও-ও ছোটে। দুজনে ছোটা শেষ করে গোটা গরুর পালটাকে প্রদক্ষিণ করে কোনো অশ্রুত নূপুরের ধ্বনির ছন্দে।

একুশ

অশ্‌কার স্বপন দেখা

বছর ঘুরলে সুখী বলে, 'গরু বাগালিতে খাটানি বেশি, তকে আমি দকানে দিব।' ববিতা সিনেমা দেখতে গেছে জেমারির হলে ভাদু, ওর মেয়ে আর ছেলের বউয়ের সাথে। বনমালীর কাটাছেঁড়া শরীরটা বাবুর বাঁধের জলে ছাই হয়ে মিশে গেলে পর ভাদু নিজেই সুখীর ঘরে আসে। বলে, 'দ্যাঅর নাই ত আমরা আচি বুন—তর ঝ্যাখন ঝা লাইগবে বলিস।' কিন্তু সুখী জানে, ভাদুও জানে। কথা যে বলে সে ত জানেই, কথা যে শোনো সেও জানে যে ইসকল কতা এক মায়া ব্যটে। ঝ্যাতখন চখে জল ত্যাতখনই কতাগুলান ভিজা ঠেকে—ঝ্যান চখের জলে সিঁজান থাক্যে কতাগুলান—এমনি মায়া ব্যটে। তবু দুঃখের দিনে, শোকের দিনে মিছা হলেও এমন কথায় বুকে বল আসে। হাতে-পায়ে জোর আসে। নুয়ে পড়া, ভেঙে পড়া মানুষ উঠে বসতে পারে। সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারে।

জবা আজকাল ঘরটুকু আর উঠনটুকুতেই চলাফেরা করে। কল পর্যন্ত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যায় যেদিন একটু ভাল বোধ করে। ছোট চারপাইতে বসে সে খড়িফোটা হাতে রুখু চুলের উকুন বাছে। নিকি মারে দুই নখের মাঝে—পুটুস। দুটাকা দিয়ে কেনা নখপালিশ লাগায় বসে বসে হাতের আঙুলে, পায়ের আঙুলে। সারা গায়ে ওর এক অসহ্য ব্যথা। আগে আগে শুলে পরে ব্যথা কমত, এখন শরীরের কোনো অবস্থানেই ব্যথা মরে না। সমস্ত মুখের ভেতরটা তেতো হয়ে থাকে ওর। ঘাড় নাড়াতে কষ্ট। কাশলে বুকে কষ্ট। পেটে কষ্ট। জামাগুলো ঢলঢল করে গায়ে। শরীরটা শুকিয়ে ছোট হয়ে বয়েছে। অশ্‌কার সাথে তার খুব ভাব। অশ্‌কা এই একবছরে খানিকটা লম্বা হয়ে উঠেছে। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে সে মাটির পাঁচিলের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখে জোবাদিদি ওকে ভালে কিনা। বুক সমান পাঁচিলের পরে তিন কদম উঠন, তারপর একটা ঘর। তার মেঝে মাটির। দেয়াল মাটির। টালির ছাদ। দরজার ফ্রেম আছে, কবাট নেই। সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে আবার দুকদম উঠন তারপরে শোবার ঘর। সেটার সামনে দেয়াল দিয়ে ভাগ করা বারান্দা বলো বারান্দা, রান্নার জায়গা বলো রান্নার জায়গা। এই ঘরের ছাদও টালির কিন্তু সব টালি একবারে দেওয়া নয়—যখন যেমন জোগাড় হয়েছে তেমন তেমন বসানো হয়েছে। ফলে কোথাও লাল নতুন টালি কয়েকখানা, কোথাও ফাটা টালি—বর্ষায় বিছানা সরিয়ে সরিয়ে পাততে হয়। প্রায় দিনই জবা এসময়টা সামনের ঘরের দুয়ারের কাছে দাঁড়ায়। দেয়ালের ওপার থেকে ভাইয়ের গভীর কালো চোখ দুটির সঙ্গে তার

হলদে আধমরা নিষ্প্রভ চোখ দুটোর একটা আদানপ্রদান হয়। সেই কয়েকটা মুহূর্ত যেন এই বালিকার মৃতপ্রায় খয়ের রঙা চোখে রঙ ফিরে আসে—মৃত শালিকের ডানার রঙের মত খয়েরি, যেন ডানাটা তখনো মরে নি। পালকগুলো যেন তখনো উষ্ণ আর জীবন্ত। অশ্‌কা জানে না কেন দিদির অমন চাউনির জন্য তার বালকহৃদয়ে এক তীব্র আর্তি থাকে। সে কি রক্তের বন্ধন, নাকি জীবনমরণের বিপরীতমুখিনতার আকর্ষণ না জীবনের দিকে জীবনের বাড়ানো হাতের ব্যাকুলতা এই মমতা-মাখানো চাউনিতে চকিত হয় বোঝা যায় না।

গোয়ালা ঘর থেকে দুপালি মুড়ি আনে অশ্‌কা। মুড়ির সাথে কোনোদিন ভেলিগুড় এক ডেলা, ছোলামটর কলাই সিজা নয়ত একথাবা তরকারি কি ডাল। সুখী ববিতার এসময়ে খাওয়ার পাট নেই। উনুনের আগুন থেকে সুখী কেরোসিনের কুপি ধরায়। ভাতের হাঁড়ি বসায় উনুনে। চট পেতে দেয় ছেলেমেয়েকে। অশ্‌কা ভাতের গরাসে মুড়ি খায়। জবা খুঁটে খুঁটে খায়, অনিচ্ছায়।

'পদ্‌দো ফুটেচ্যেরে অশ্‌কা?' জবা বলে।

'হঁ ত। দেদার।'

'ইবারে দুগ্‌গা ঠাকুরকে এট্টা পদ্‌দো মালা দিব।'

'ইঃ, তু মালা গাঁইথবি?' দিদির চোখের দিকে তাকিয়ে অশকা, যেন আরো কথা ছিল, বলে না। সে চোখে যেন হিমকুয়াশা, উনানের ধুঁয়ার পারা দেখায় যেন। ভাষা নেই, জীবনের কোনো ভাষা নেই সেই চোখে, যেন জীবনের ওপারের কোনো রহস্য, মৃত্যু ও অন্ধকারের রহস্য, শীতল ও ঘন হয়ে আছে। সে শীতলতার স্পর্শে অশ্‌কা ভীত, সে রহস্যময়তায় এক না বোঝা বিস্ময়ে আবিষ্ট যেন ও খানিকটা অক্ষমতা ও করুণায় বলে ফেলে, 'অতটি পদ্দ আমাকে লিখ্যে দিবেক নাই বাবুরা।' সুখী ধমকায়, 'বাবুর বাঁধকে যেছিলি্য ফের? মানা করি নাই তুকে? উখানে ডাইন আচে। পদ্‌দো বনে, মা মোনসা! খবরদার অশ্‌কা, ঝদি নামিস জলে দুপর বেলিতে।'

অশ্‌কা শেষ গরাসটি মুখে পোরে। থালার কানায় হাতের চেটো চেঁছে শেষটুকুও মুখে পোরে। থালা চাটে। জল ঢালে থালায়। দুহাতে থালার কানা ধরে চোঁ-চোঁ করে জল খায়। নাক মুখ দিয়ে ফোঁস্‌স্‌ করে বাতাস ছেড়ে বলে, 'খাট পাড়ি দিদি?' জবা কোনোরকমে খাওয়া শেষ করে ওভাবেই পাতে জল ঢেলে খায়। থালা দুটো তোলে। বলে, 'পাড়, আমি সকড়ি মুছ্যা থালা দুট্যা মেজ্যে আনি ত্যাতখন।'

দুজনে পাশাপাশি দুটো ছোট খাটিয়ায় শোয়। আঁকাবাঁকা কাঁচা কাঠের ফ্রেমে বাবুই দড়ির বুন্যা কর‍্যা চারপাই। ন্যাকড়াকানি ভরা সিথান আর বড় বড় ফোঁড়ের সেলাই এ কাঁথা। জবার শীত বেশি বলে সে এখনো দুখানা কাঁথা জড়ায়। শুধু সোডাসিদ্ধ জলে কাচা কাঁথায় তেলচিটে গন্ধ ছড়ায়। সেই গন্ধ ওদের গায়েও। জবার সমস্ত শরীর দিয়ে আরো কিছু গন্ধ পাওয়া যায়—চিমসে ও ভ্যাপসা মত সেই গন্ধটায় যেন মৃত্যুর ছায়া। অশ্‌কার হাই ওঠে। জবারও। ওর ঠিক ঘুম নয় কেমন যেন ঝিম ধরে থাকে সারাক্ষণ।

ওরা ঘুমিয়ে পড়লে ববিতা ফেরে। সুখী ভাত উপুড় করে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে ছিল। ববিতা একটা ঠোঙা নামিয়ে রাখে। 'দুটি ডিম পালুম শোস্তায়—ভাজো।' কাপড় ছাড়তে ঘরে ঢোকে ও। শাড়িটা ভাঁজ করে দড়িতে রাখে। ব্লাউজ খোলে। ব্রা-এর হুকটা ঠিকমত খুলতে না পেরে বলে, 'খুলরে বাবা, মর‍্যা গেলুম।' কালো ব্লাউজ আর সাদা ব্রেসিয়ার দলা করে রাখে কাপড়ের পোঁটলার পাশেব ঝুড়িতে। একটা কালোরঙের ম্যাক্সি পরে শাড়ির রঙে রঙ মেলানো হলুদ শায়া খোলে। দড়ি থেকে একটা ছোট, ছেঁড়া লালচে হয়ে যাওয়া শাদা শায়া পরে। গামছা নিয়ে ভেতরের উঠনের কোণে রাখা জালা থেকে জল নেয় একটা আমূল স্প্রের কৌটোয়। মাকে বলে, 'তুই ভাত দে, আমি আসচি।' জালাতে অর্ধেকটা জল আছে। কৌটো ডুবিয়ে জল তোলে ববিতা। মুখে জল ছিটোতে গাটা শিরশির করে ওঠে। কুলকুচো করে বারবার। পায়ের পাতা ঘষে ঘষে ধোয়। দুপায়ের আঙুলে রুপোর চুটকীতে টিং-টিং শব্দ তুলে খেতে যায়।

জবা রাতে আর খেতে ওঠে না। কাঁথার তলে জ্বরে কোঁকায়। অশ্‌কা উঠে ঘুমচোখে ডিমভাজা আর ডাল দিয়ে ভাত খায়। ববিতা বলে, 'বাসন ধুত্যে লারছি। জল ঢেলে রেখ্যে দে, সোকালে মেজ্যে দিব।'

সুখী জবাকে বলে, 'ঘুমাস নাই?' কপালে হাত দেয়। গরম অতটা লাগে না। ঘাম ফুটে আছে। ও আঁচল দিয়ে মেয়ের মাথা মুখ মুছিয়ে দেয়। 'দুটি খাবি?' 'উঁহু।' 'ত ঘুমা, কাল অসুদ আন্যে দিবো।' ববিতার পাশে সুখী শুয়ে পড়ে মেঝেতে।

অশ্‌কা উপুড় হয়ে ঘুময়। ঘুমের মধ্যে ও হাত বাড়িয়ে কী যেন খোঁজে। স্বপ্নের মধ্যে খোঁজে। কী স্বপন দেখে অশ্‌কা?

অশ্‌কা স্বপন দেখে পদ্মবিলের। পদ্মফুলের। বাবুর বাঁধের। মাঝারি মাপের পুকুরের নাম বাবুর বাঁধ! বাবুর বাঁধে আবার মাটি কিংবা পাথরের কোনো বাঁধই নেই, বরং রাস্তার ধারের জমি, নতুন তৈরি বাড়ি আর উঁচু পাঁচিল ঘেরা ইন্ডিয়ান অয়েলের টাওয়ারটা থেকে পুকুর অনেক নিচে। এই সময় জল কমেও গেছে। কিন্তু কাদা হয়ে আছে অনেকটা। সেই জংলী ঘাস আর কাদায় পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে তবে পুকুরের ধারে পৌঁছনো। পুকুরের জলের নিচেও ত কাদা। সেইজন্য ঠিক কোনখান থেকে পুকুরের শুরু বা শেষ বা কোনটা পুকুরের সীমা চিহ্নিত করা কঠিন। আবার বর্ষায় যখন পুকুর উপচে জল ধানখেতের ভেতব দিয়ে মাঠে মাঠে নাবালে নেমে যায়, নানা ধারায়, তখনো বাবুর বাঁধের কোনো সীমারেখা থাকে না। পুকুরের তীরে শ্মশান, শ্মশান বলে বোঝা না গেলেও শ্মশান। বাউরিরাই দাহ করে এখানে। বাঁশে বেঁধে মড়া আনে, সেই বাঁশই আধপোড়া হয়ে পড়ে থাকে। পরে কেউ জ্বালানি হিশেবে কুড়িয়ে নিয়ে যায়। বিশেষত 'পাখমারা' বেদেরা যখন কোলে-কাঁকালে কচিকাচা নিয়ে মেয়ে-মরদে একদল আসে, কিছুদিন পরপরই ত আসে ওরা, তখন মাঠে, ঘাটে, রাস্তায় গোবর, কাঠ, পোড়াকয়লা কিছুই পাবার উপায় নেই। ওদের ত শ্মশানের আধপোড়া কাঠেও কাজ চালাতে বাধে না। বাবুর বাঁধে এখন পদ্ম। ফোটা আধফোটা পদ্মে পুকুরটা ভরে আছে। স্বপ্নেও ভরে থাকে

পুকুরটা, এই বড় বড় শ্বেতপদ্মে। পদ্ম আছে ত পাঁকও আছে দেদার। সেই পাঁকে পা রাখা যায় না। শরীর খাড়া রাখা যায় না। কেবলই পা হড়কে যায়। কেবলই শরীর টলে যায়। হাত বাড়ালে মরীচিকাবৎ ফুল উলটোদিকে হেলে যায়। মৃণালসমেত। নাগাল পাওয়া যায় না, অথচ মনে হয় এক ইঞ্চি এগলেই ফুল ধরা যাবে। কিন্তু আরো এগলে পদ্মপাতায় আর ডাঁটায় বসা কালো কালো খালুচ পোকারা গায়ে উঠবে। কুটকুটাবে। এখন অশ্‌কা পাঁকে হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে স্বপ্নে হাঁটে। কোমর সমান জল। পদ্মবনে অশ্‌কা হারাই যায় ভমরার পারা। পদ্মমধুর টানে। পদ্মরা ধরা দেয় না, শুধু ক্রমশ বেষ্টন করে ওকে। বেপরোয়া দোলে। চারিধারে শাদা পদ্মের দল, তবু অশ্‌কা একটি পদ্ম পায় না। যে ফুলটি মনে হয় সবচাইতে কাছে ও হাত বাড়িয়ে তার ডাঁটি ধরতে গেলে সে ফুল সরে সরে যায়। এমনি লুকোচুরি খেলতে খেলতে একটা বেশ বড়সড় পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুল ওর গা ছুঁয়ে যায়। সারা গায়ে কাঁটা, অশ্‌কা দুহাত বাড়িয়ে ফুলটাকে ধরে। ফুলটা হেলে যেতে চায়। ও দুই করতলের মাঝখানে ধরতে যায়। কিন্তু ফুলটা ওর দুই করতলের মাঝখানেই ঝুরঝুর পাপড়ি খসিয়ে দেয়। মসৃণ পাপড়িগুলো ওর দুই পাঞ্জার ভেতর দিয়ে খসে পড়তে থাকে। খসেখসে পড়তে থাকে। শেষে রেণুমাখানো হলুদ পুষ্পাক্ষ থাকে। স্বপ্নের মধ্যেও অশ্‌কার জানা থাকে এইটি ও খেতে পারে। ও ডাঁটাটা ধরে টানে। প্রাণপণ টানে। সেইটানে পদ্মের পাতাগুলো এগিয়ে আসে। ওকে ঘিরে ধরে। পরিত্রাণহীন ওকে ঘিরে ধরে। কাদাতে ওর পা ডুবে যায়। ও পা তুলতে পারে না। পদ্মের দীর্ঘ মৃণাল আঁকড়ে ওর শরীরের উর্ধ্বাংশ জলের নিচে ছটফটায় কিন্তু পা দুটো এমন প্রোথিত হয়ে যায় যেন প্রস্তরীভূত। পদ্ম নেই, পদ্ম নেই। শুধু বড় বড় থালার মত সবুজ পাতারা ওকে ঘিরে ধরে। ওকে যেন ঢেকে ফেলতে চায়। ওর দমবন্ধ হয়ে আসে। একটু বাতাসের জন্য ওর বুক ফেটে যায়। ও মাকে ডাকতে চায়। পারে না। দিদিকে ডাকতে চায়, পারে না। অনেক কষ্টে চোখ খুলে দেখে অন্ধকারে চোখের জলে ওর মুখখানা ভিজে আছে। একটু সময় লাগে ওর নিজের ঘর, খাট, বিছানা, মা, দিদি এইসবের মধ্যে ফিরে আসতে। এইসব বুঝে নিতে। তলপেটটা ভারী লাগে ওর, অথচ উঠতে ইচ্ছে করে না।

'ভাই, জাগা আচিস?' জবা অস্ফুট বলে। 'পেসাপ কইরথ্যে যাব দিদি।' এতক্ষণে স্বাভাবিক গলায় কথা বলে ও। 'ডাঁরা, আমো যাব—উফ্‌ফ। জবা হাতে ভর দিয়ে ওঠে। 'আমাকে এট্টু ধর ভাই, মাতাটো ক্যামুন ঘুরাইচ্যেঁ।' অশ্‌কা কাঁথা ফেলে মেঝেতে নামে। জবাকে ধরে ধরে বাইরে আনে। জবা উঠনের ধারে বসে। অশ্‌কা কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে বলে, 'হল্যে ডাকিস দিদি।'

জবাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে ও বাইরে আসে। এত রাতে রোডের ধারে যেতে ওর আলসেমি লাগে। নিজেদের ঘরের দেয়াল আর ভাদুদের দেয়ালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্যান্টের বোতাম খোলে। দেয়াল ভেজাতে ভেজাতে আকাশ দেখে—আকাশ জুড়ে যেন

পদ্ম ফুটে আছে। 'বাবু গঁ, দিদি মালা দিবেক মায়ের থানে, পদ্দ পাঠাই দাও।'

বনমালী বাবা হয়ে ওঠে আবারও। পুত্রের অবোধ স্মরণে।

বাইশ

কারিগর ও হারামীর বাচ্চা

ছেলের হাত ধরে সুখী বিজয় পালের দোকানে আসে। বলে, 'পালবাবু তুমার কাছকেই উয়াকে দিলুম। মাইর-ধর কোর না। বাপের বড় আদরের বেটা ছিল। কাজকাম শিখাই লিও।

অবিশ্যি বিজয় পাল কদিন ধরেই সুখীকে বলছিল, 'তুমার বেটাটকে দকানে লাগাই দাও। সোকাল বিকাল টিপিন, দুবেলা ভাত রুটি। তা বাদে হাতখরচ দিব দশটাকা।

সুখী দরদাম করতে শিখেছে। বলে, 'গোয়ালাঘরে বেইমানী কইরব পালবাবু? অশ্কার বাবা মইরলে পর ঘোষকাকু ডেক্যে ছিল্যাটকে বাগালিতে দিলেক। ভাত-মুড়ি কাপড়-গামছা ত দিছ্যেই পনরটি টাকাও দিছ্যে। উয়াদের কী বইলব বলো?'

বিজয় পাল এসব কথার গূঢ়ার্থ জানে। পেটে ভাত আর শরীরে লজ্জাবস্তর জোটাতে যাদের শ্রম বেচতে হয়, তাদের মুখে 'বেইমানী' শব্দটাও অন্য অর্থ পায়। নষ্ট করবার মত, বিলাসিতা করবার মত যথেষ্ট অর্থ যাদের আছে 'কৃতজ্ঞতা', 'মায়ামমতা-স্নেহভালবাসা' এইসব শব্দের আভিধানিক প্রয়োগ করবার অধিকার ত তাদেরই। এসব শব্দ ত তাদের বুককেসে রাখা অভিধানে শুয়ে থাকে। প্রয়োজন মত তারা তা ব্যবহারও করে।

কাজে কাজেই বিজয় পালকে মিনিট বিশেক দরদাম করতে হয়। তারপর কুড়ি টাকায় পুত্রের মাসিক শ্রম বেচে দেয় জননী।

প্রথম দিন অশ্কা বানান করে দোকানের নামটি পড়ে—মউচাক। চা-ভাত-রুটি-তরকারির দোকানের নাম কেন 'মউচাক' ও ভেবে পেল না। মউচাকে ত মধু থাকে। মউচাকে ত মম্‌ও থাকে। ভরা মউচাকে ফেলে দেওয়া স্ট্র ঢুকিয়ে ও মধু খেয়েছে বার কতক; একবারও মউমাছি দংশায় নি, ও ভয়ে ভয়ে মালিকের দিকে তাকায়। এই দোকানে ও ছোট থেকেই আসে। বাপের কোলে পিঠে কাঁধে চড়ে কতবার। কতবার জোবাদিদি, পারিদিদি, শাটিদিদি, ববিতাদিদির সঙ্গে। কখনো একা। ঝাল লজেন, পাঁরুটি, বিস্কুট, চানাচুর, পাঁপড়, ফুলরি, বেগুনি কিনতে ছেলেরা, হাতে পয়সা পেলে বাউরিপাড়ার ছেলেরা এ দোকানেই আসে। আজকাল আরো দোকান হয়েছে, তবে বিজয় পালের দোকান যেমনটি ছিল তেমনটিই আছে—কেনাবেচায় কি লোকের আনাগোনায়।

'লেরে বেটা, এই ঝাঁটাটো লে—দকানের সামনাটো বেশ কর‍্যা ঝাড় দে. খইদ্দার আইসবে অখনি।' অশ্কার হাতে ঝাঁটা দিয়ে বিজয় দোকানের ভেতরে তাকায়, উনুনের

সামনে শিবু দাঁড়িয়ে। শিবুর পিঠের দিকে তাকিয়ে একেবারে গলা পালটে, গভীর থেকে ডেকে ওঠে বিজয়, 'কারিগর?'

বিজয়ের দোকানে ত দুটি মাত্র পদ। প্রথম পদটি কিঞ্চিৎ মর্যাদাব্যঞ্জক, যদিও এই পদে মাইনে বেশি হলেও কেউ বেশিদিন থাকে না। প্রথম প্রথম সবাই নতনেত্র, বিনীত ও আনাড়ি। মাস ছয়েক পরে কাজেকর্মে বড় হলে পরে—'ই বাজারে বেতন না বাড়াল্যে হবেক নাই পালবাবু।'—বলে হয় তারা নিজেরাই চলে যায়, নয়ত বিজয়ই তাদের ছাঁটাই করে। ফলে আবার কিছুদিন বিজয়ের দ্রৌপদীগিরি। মেজাজ খিচড়ে থাকা।

দ্বিতীয় পদের ত কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। বাঁধাধরা সময়ও নেই কাজের। সকাল পাঁচটা থেকে রাত দশটা-এগারটা পর্যন্ত গামছা কাঁধে ছুটোছুটি। এই পদে তাই বালক ছাড়া প্রার্থী নেই। বালক ছাড়া নিয়োগ নেই। অশ্‌কা এই পদেই বহাল হয়।

দোকানের এক নম্বর পদটি 'কারিগর'-এর। বর্তমান কারিগর শিবু একটি আশ্চর্য ব্যতিক্রম। বছর ঘুরতে চলল এখনো সে মাইনে বাড়াবার কথা বলে নি। শুধু তাই নয়, এখনো সে কাঁধে স্থাপিত গামছাটির এক খুঁট হাতের মধ্যে না নিয়ে কথা বলে না। রান্নার হাতটি চমৎকার—মহাদেবের খদ্দের বাড়তে দেয় না। শুধু ওর মুখের সবজান্তা হাসিটি বিজয় পালের গায়ে জ্বালা ধরায়।

বিজয়ের ডাকে শিবু ভেতর থেকে সাড়া দেয়, 'যাই বিজয়দা।' উনুনে ডেকচি চাপিয়ে হড়হড় করে খানিকটা জল ঢেলে দেয়। কাঁচা কয়লার ধোঁয়ায় ঘরটা ভরা। কাশতে কাশতে ও বেরিয়ে আসে, ধোঁয়ায় চোখ দুটো লাল। শিবুর গায়ে একটা হাফহাতা গেঞ্জি—ঈষৎ লালচে। চুল মাঝখানে সিঁথি করে পরিপাটি আঁচড়ানো। গোঁফ-দাড়ি কামানো ঈষৎ লম্বাটে মুখ। কপালে দুই ভুরুর মাঝ বরাবর একটা দীর্ঘ কাটা দাগ। নীল লুঙিটা উলটিয়ে হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে গিঁট দেওয়া। বিজয়ের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কানে গোঁজা বিড়ি নামায় একটা। বাঁ হাতের তালুতে, বার তিনেক ঠোকে। দুপাটি দাঁতের ফাঁকে গুঁজে দেয়। ফলে চিবুকটা একটু বাঁ দিকে বেঁকে থাকে। শিবু নীরবে হাত বাড়ালে বিজয় পকেট থেকে দেশলাই বার করে ধরিয়ে দেয়। নিজেও একটি সিগারেট ধরায়। বিড়িতে বেশ দীর্ঘ একটা টান দেয় শিবু। যেন সারাদিন ওর উপবাস ছিল এমন তৃষ্ণার্ত ভঙ্গিতে। যেন কোনো ব্রতপালন করছে এমন প্রশান্তিতে। তারপর একমুখ ধোঁয়া, ঠিক বিজয়ের মুখের ওপরে নয়, একটু ডাইনে ফিরে, বাঁ হাতের পাতা দিয়ে আড়াল করে ছেড়ে দেয়। বলে, 'বলেন বিজয়দা?'

'আমার ডেরি হইচ্যে বল্যে তুমরাও ডেরি কইরব্যে শিবু?' রাগ নয়, বিজয়ের ভাঙা মেয়েলি গলায় যেন অভিমান ফোটে।

'কেন? কী হলো?'

'উনান ধইরথেই যদি সাতটা বাজাও', বিজয় ঘড়িটা উঁচু করে দেখায় শিবুর স্মিত মুখের ওপর, 'ত জিলাবি, ঘুগুনি কখন হব্যাক শুনি? আজ রবিবার বল্যা কি খইদ্‌দার আইসবেক নাই?'

শিবু রাগে না কেননা তার গলায় কণ্ঠি। বিনীত হাসি দেয়। জ্বলন্ত বিড়িটা তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের ফাঁকে ধরা থাকে। 'অত রাগলে কি চলে বিজয়দা। ক্রোধের মত রিপু নাই।' উত্তরে বিজয় জোরে জোরে টান দেয় সিগারেটে। শিবু বলে চলে, মটর ভিজেচে রাতভর, জিলাপির গোলা তৈরি। রস তৈরি। এক উনানে তোমার ঘুগুনি অন্যটায় জিলাপি। তা বাদে আজ, তোমার খদ্দের আসতে বসতে আটটার আগে নয়।'

শিবুকে চটাতে ভরসা পায় না বিজয়। তিনশ টাকায় এমন কারিগর পাবে না, তবু অভ্যাসেই ও ঘাড় ঘুরিয়ে মহাদেবের দোকানের দিকে তাকায়। মহাদেবের উনুনে কেটলি। জনা ছয় খদ্দের বেঞ্চিতে বসে। সে বলে, 'কীরে অশ্‌কা ঝাড় দিইলি?'

'হুঁ গ!' অশ্‌কা তখনো ঝাঁটা হাতে। বিজয় আঙুল দিয়ে দেখায়, 'ইটো ঝাড় দেয়া ব্যটে? ইখানকে দ্যাখ, কলগড়ায় শালপাতা, ঠঙগুলান ফেইললে মানুষজন গাইল দিবেক নাই? লে, জড়ো কর, জড়ো কর‍্যা রাস্তা পেরাই ফেলাই দে।' তা অশ্‌কা তাই করে। তারপর শিবুর নির্দেশে কাপ-ডিশ সাজায়। মাসকয়েক আগে এ-কাজটা করত শঙ্করা। দুপায়ে দুমাপের জুতো কানি দিয়ে গুঁজে খয়ে যাওয়া নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে বাসনের ময়লা তুলত। মহাদেবের দোকান ছেড়ে বাগালি আবার বাগালি ছেড়ে বিজয়ের দোকান। কলে জল আসে নি বলে দোতলাবাড়ির ইঁদারা থেকে জল আনছিল। পা পিছলে, নাকি মাথা ঘুরে পড়ে যায় ইঁদারার ধারে রাখা আধলা ইট আর পাথরকুচির ওপর। বিজয় পাল করেছিল বটে। তিনদিন নার্সিং হোম। বাড়িতে সাতদিনের ওষুধ পথ্যি। সবসমেত বিজয়ের নাকি সাতশ টাকা শঙ্করার মরণের খরচে যায়। নাকি শঙ্করার জীবনের দাম? তা নাকে কানে রক্ত মাখিয়ে শঙ্করা বাবুর বাঁধে ছাই হয়ে পদ্মবনে মিশে গেল। সে থাকলে অশ্‌কা এখানে এঁটো বাসন মাজত না। গরু-মোষের পিছু পিছু দৌড়ে বেড়াত।

এখন বেঞ্চিগুলোতে খরিদ্দার বসে আছে। 'জলদি দেরে' বলে তাড়া দিচ্ছে। প্রথম দিন বলে বিজয় ক্যাশ ছেড়ে নেমে অশ্‌কাকে হাতে হাতে এগিয়ে দিচ্ছে। এঁটো কাপ, গ্লাশ, প্লেট, চামচ একসাথে নেবার কায়দা শেখাচ্ছে।

'ইভাবে লয়রে, ধ্যান দেরে বেটা পোথম দিন বলে কতা! আহা-হা, ভাইঙবি যে!'

কাপের ভেতর একটা গ্লাশ বসানো—অশ্‌কা, রাখতে গিয়ে, দুটোই ফেলে দেয়—গ্লাশ টুকরো হয়ে যায়, কাপের হাতল ভাঙে!

'লে! হারামীর বাচ্চা, ফাস্টেই দিলি ত লস কর‍্যা? কাপগুলান বরাকরের, ইখানে পাব আর? ইসপেশাল কাপটো দিলি?' অশ্‌কা নিচু হয়ে ভাঙা টুকরোগুলো কুড়োয়। শিবু বলে, 'পোথম দিন অত গাল নাই-বা দিলে বিজয়দা। বাচ্চা ছেলে ত, দু-চার দিন কাজ করলেই শিখে নেবে। নে, ওগুলো ফেলে আয়, কলে জল এসেছে, দুবালতি নিয়ে আয়।'

তা প্রথম দিনই অশ্‌কা জেনে যায় তার পদটির নাম 'হারামীর বাচ্চা'।

তেইশ

বিজয় পাল

অশকার মনিব বিজয় পাল ঘুম থেকে ওঠে খুব ভোরে। বউ সরলা.বিয়ের আগে বছর তিনেক গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলে যায়। তের বছরের বিবাহিত জীবনে শুধু আঁকাবাঁকা হরফে নিজের নামটি লিখতে পারে, বাকিটুকু ভুলেছে। বিজয় বলে, 'গাঁঘরের মেয়েছেল্যা পঢ়ালিখা শিখে নাই ত সাথ সহবৎ জাইনবেক?' মেয়ে উমা গতবছর 'ঙ' পেয়ে ফাইভ পাশ করে বাড়িতে আছে। বিজয় বলে, 'বিটিছেল্যা নামটুক সই কইরথে পাল্লেই হব্যাক। ঘরের কাজকাম শিখুক বরং মায়ের কাছকে।' ছেলে দীনবন্ধুকে নিয়েই তার যত আশা। কল্পনা। স্বপ্ন দেখা। ছেলেকে সে পঞ্চাশ টাকা মাইনের কে জি স্কুলে ভরতি করেছে। পঞ্চাশ টাকা দিয়ে প্রাইভেট মাস্টার রেখেছে। ছেলের জন্যই তার সারা সপ্তাহের দুটো দিন মাত্র নিজের মত। কেননা শনি-রবি দীনবন্ধুর ইংরেজি স্কুল ছুটি। বাকি পাঁচদিন তার কম বেশি একই দৈনন্দিন—ঘুম থেকে উঠে ছেলেকে নিয়েই ঘটি-গাড়ু নিয়ে মাঠে। ঝোপের এধারে বাপ, ওধারে ছেলে। তারপর ছেলেকে জামা-জুতো-টাই পরিয়ে স্কুলের বইখাতা গুছিয়ে ব্যাগে ভরে দিয়ে মুড়ি খেয়ে বেরতে বেরতেই সোয়া ছটা। বউ সরলা একে আলুথালু স্বভাবের তায় কোলে দেড় বছরের মেয়ে মৌসুমি। ছমাস গর্ভবতী বলে বোঝা যায় না, এমনিতে সরলা মোটাসোটা বলে পেটটা গর্ভ ছাড়াই উঁচু হয়ে থাকে সারা বছর। বড়মেয়েটা বার বছরের হওয়াতে বাপ-ভাইকে মুড়ি, আলুসেদ্ধ নয়ত বেগুন পোড়া দেয়। ভাইয়ের টিফিন বাক্সে ডিম, কলা, পাউরুটি সাজিয়ে দেয়। ওয়াটার বটলে জল ভরে দেয়। বাপ-ব্যাটা বেরবার জন্য তৈরি হলে সরলা ছড়া দেওয়া ঝাঁটপাট শেষ করে ভিজে হাত আঁচলে মুছে ছেলের বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে কুট করে একটা কামড় দেয়। আলতো করেই দেয় তবু দীনবন্ধু 'উফফ্' বলে হাত টেনে প্যান্টে মোছে। বিজয় ধমকায়, 'প্যান্টে মুছলি ফের? রোমালটো দিইচ্যি কীসকে?' তারপর বউয়ের সিঁদুর মাখামাখি কপালখানার দিকে তাকিয়ে হেসে বলে, 'বাজারে যাত্যে হবেক?'

সরলা দাঁড়িয়ে, মাথায় আধখানা ঘোমটা, পেছনে বোনটাকে কোলে নিয়ে উমা। বিজয়, আবার বলে. 'ঝট করে বলো গঁ দীনবন্ধুর মা, কী চাই আজ?' 'রঙ্গ দেখ কেনে?' মুখ ঝামটায় সরলা। বলে, 'দুটি মাচ আইনল্লেই হব্যাক।'

ভিকিতে উঠে ছেলে বলে, 'টা-টা।' দিদির কোলে দেড়বছরের মৌসুমিও হাত নাড়ে 'তা, তা, তা, তা।'

বিজয় নিজে পড়েছে আট ক্লাশ পর্যন্ত। পাশ করতে পারলে কেবলস-এই একটা চাকরি হত—আনস্কীল্ড লেবারের চাকরি। সরলা ঠেস দিয়ে বলে, 'ডেরাম ঠ্যালা চাকরি!' তা সেই 'ডেরাম ঠ্যালা চাকরি' পেলে এদ্দিনে হোক না হোক দু-আড়াই হাজার মাস গেলে

কামাত। তা বাদে কোআর্টার, বোনাস, ইনসেন্টিভ, ফ্রী মেডিক্যাল—ভাবতেই ওর বুক জ্বলে যায়। মাজিবাবুর সাথে লেগেছিল গত ভোটে হারা ইস্তক। মাজিবাবুদের দখলে দিল্লির গদি। ত ওয়েস্ট বেঙ্গলে ত লাল ঝান্ডা গরমেন্ট। মাঝে মাঝে যখন ট্রাক ট্রেকারে দল বেঁধে লাল সেলামরা যায় তখন গোপনে ওর দীর্ঘশ্বাস পড়ে। কেননা ওর সামনে-পেছনে ডাইনে-বাঁয়ে উষ্টি-গুষ্টি সব তেরঙ্গা। কোনো ভাবেই ওর লাল হবার উপায় নেই। লাল হয়েছ কি শালো পাছায় লাথি! ওর দোকানটাও যেন লালবাতি জ্বালবে বলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। পেছনের গ্যারেজের ছেলেগুলো আর ওধাবের তার ছাড়ানোব কারখানার পাহারাদারগুলো মাসকাবারি খায়। তাতে বাঁধাধরা চাকরির মত বাঁধাধরা কিছু টাকা পাওয়া যায়। বাউরি মুনিষ-কামিনরা চা পাউরুটি খায় কখনো নগদ, কখনো ধাবে। হাজবির টাকা পেলে তবেই তাদের হাট বাজার ধার দেনা শোধ। ওদের মালিক ঠিকাদারবাও তেমনি—কখনো একবারে পুরো টাকা দেবে না। বাউরি মরদের হাতে কাঁচা পয়সা এলেই দু-চাব পাত্র পেটে পডবে কি রাতভর জুয়ায় কাটাবে। বিজয় ভাবে পুবো টাকা হাতে পেলে যারা মদে ঢালে, আধা টাকা পেলেও ত তাই! মাঝখান থেকে ওব লোকসানের অঙ্কই বাডতে থাকে। বাকির খাতা ওর সর্বদাই পূর্ণ। তবু যা হোক চলতি বাসেব ড্রাইভাব, কন্ডাক্টব, খালাসি, দূরপাল্লার এন পি মার্কা ট্রাক, লরি, কলিআবির ডামপার আর অয়েল ট্যাঙ্কারের ড্রাইভার খালাসিরাই ভরসা। সেখানে একথালা ভাতে দুগুণ, রুটি পিছু পঁচিশ তিরিশ পয়সা বেশি নিলেও হুজ্জোতি হয় না। দুটোব পবে আব ভাত মেলে না। তখন উনুনে গুঁড়ো কয়লা দিয়ে বিজয় বাড়ি যায়। কারিগর আর 'হারামীর বাচ্চা' খাওয়াদাওয়া করে বেঞ্চিতে গামছা পেতে একটু গড়িয়ে নেয়। তিনটে থেকেই আবার চপ-সিঙ্গাড়া বেগুনি-ফুলুরির ব্যস্ততা। জিলিপি ঘুগনি হয় সকালে। কোআর্টার পাউরুটি, হাফপ্লেট ঘুগনি আর একগ্লাশ চা—মুনিষ, কামিন, গ্যাবেজেব ছেলেরা এই খেয়ে কাজে লেগে পড়ে। মুনিষ-কামিনদের দুপুরের খাবার অবিশ্যি অ্যালুমিনিআমের দু-কৌটোর টিফিন ক্যাবিআরে বাড়ি থেকে গামছা বেঁধে কেউ, কেউ এমনিই হাতে ঝুলিয়ে আনে।

মাঝে ঘণ্টাখানেক বাদ দিয়ে দোকানে ব্যস্ততা সারাদিনই। রাত আটটা পর্যন্ত মানুষজনেব খাওয়া-দাওয়া গল্পগুজব। শহর হয়ে উঠছে তবু সাত-তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার গেঁয়ো অভ্যাস এখনো রূপনারায়ণপুরের পুরনো বাসিন্দাদের আছে। টিভি চললেও খাওয়া-দাওযা সেরে মশারি টাঙিয়ে দেখা। আর নটার পরে ডাবরমোড় সুনসান। তখনো ধাবা জাতীয় হোটেলগুলোতে টেবিল মোছা, কাজের লোকজনের খাওয়া, রাতেব বাসন ধোওয়া আর সকালেব জন্য কাজ এগিয়ে রাখা। মিষ্টির দোকানেও কাজ থাকে। শেষ ট্রেনের জন্য, রূপনারায়ণপুরে থামে এমন শেষ ট্রেনের জন্য রাস্তাটা প্রায় খালিই থাকে। কিন্তু এখন ফাঁকা রাস্তায় নিরাপদ হাঁটতে হাঁটতে রূপনারায়ণপুরের পুরনো লোকেবা জানে আশেপাশের ভাতরুটির হোটেলে আর-এক জগতেব জেগে ওঠা শুরু হয়েছে এখানকার নতুন পুরনো বাড়ির বাসিন্দাদের ঘুমিয়ে পড়া, কিংবা গল্পে গানে

কলহে বা সুখে অসুখে জেগে থাকার সমান্তরালে। সেই জগতে একঘণ্টায় সারা সপ্তাহের কামাই পয়সা উড়ে যায়। কারখানার মাল কারখানা যাওয়া-আসার পথে কিংবা কারখানা থেকেই কোন পথে কোন গুদামে পাচার হবে এসবের পরিকল্পনা হয়, কয়লার ডামপার কীভাবে বোঝাই করা, নয়ত কলিয়ারি থেকে ব্যাটারি চুরি এসবের নকশা এই সমান্তরাল জগতেই তৈরি হয়।

বিজয় পালের দোকানে এসব নেই। তাতেই বোধহয় তার মনে হয় এভাবে আর চলে না। এই দোকান দিতেই তাও দালান কোঠা নয়, কেনা জমিটুকুও নয়, বাপের জমির খানিকটা গেল। ভটভটিয়া নইলে ইজ্জত থাকে না। তাতে গেল মাজিবাবুর পুকুর ধারের জমিটা। মাজিবাবুই নিলেন। দাম কিছু কম হলেও মাজিবাবুর কথাটা ওর অন্যায্য মনে হয় নি। মাজিবাবু মানী লোক। শিক্ষিত। বি এসসি পাশ। গ্রামে ওদের সাবেক কালের দোতলা কোঠা। আশেপাশে যতদূর দেখ উয়াদেরই জমিন। তা এমনিতেও এই একচিলতে জমি থাকত না, এতে তবু কিছু টাকা পাওয়া গেল। মনে মনে মাজিবাবুকে গাল পাড়লেও বাপের জমি বেচা টাকায়, মোপেডে চেপে ওর ভারি ফুর্তি হয়। 'কী বাহার করেচ্যে মাইরি!' ও লালকালো চিত্রিত দুচাকার গাডিটায় ছিপছিপে মসৃণ শরীরে হাত বোলায়—এমন আদরে আর যত্নে যে সেরকমটি ওর বউ কোনোদিন পায় নি। বউ মানে বউয়ের শরীর। বউয়ের শরীরে ওর শরীব আরাম খোঁজে। সে মন্থনে ওর তিনটে বাচ্চা তৈরি হয় তিন তিন রকমের শরীর নিয়ে, আরো একটা বাচ্চাও তৈরি হচ্ছে তবু কি ও কোনোদিন এমন আদরে আর গর্বে সরলার নারী শরীরে হাত রেখেছে? ভিকিটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে ও ভাবে বাপ জমিও করেচিল ব্যটে। ইখানকে দুকাঠা ত হুই পুখর ধারে তিনছটাক। উধারে তিনছটাক ত ইধারে আড়াই কাঠা। ধান পুঁতলে পাহারা দিতে জান কয়লা আর অমন ডাঙালে ঘর করবেই-বা কে? তবে রূপনারায়ণপুর ত এখন দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে—আয়তনে, ভৌগোলিক আয়তনে। রূপনারায়ণপুর প্রতিদিনই ভরে উঠছে—লোকের আনাগোনায়, বসতিতে। বিজয়ের দোকানের পাশের ফাঁকা জমিটাতেও দোকান ঘর উঠেছে। দোতলা বাড়ির ইঁদারার পাড়টা তাতে খানিকটা আড়াল পেল। আবার বাপ্পা তিস্তার খেলার জায়গাও কমে গেল। ওদের মায়েরা শীতের দুপুরে চেয়ার কি ফোল্ডিং খাটে তোষক বালিশ রোদে দিত, থালা কুলোয় বড়ি, চাল, গম ধোয়া মশলা এসব রোদে দিত সেটা গেল। কাপড় শুকোতে দেওয়াটাও সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু এইসব ছোটখাট তুচ্ছ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যায় ত রূপনারায়ণপুরের বেড়ে ওঠা আটকায় না। ধানখেত সরতে সরতে এতদূর সরেছে যে আছরা পর্যন্ত হাঁটলেও মনে হবে না এ সেই জায়গা। ধানখেতের সবুজের পাশ দিয়ে হাঁটতে গেলে এখন রাস্তা থেকে নেমে অনেকটা যেতে হবে। হয়ত তাই বিজয় এখন ভাবে অমন হুটহাট করে জমিগুলো না বেচলেই হত। পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে সাঁওতালদের মহুয়া-টহুয়া খাইয়ে টিপ. .প পঞ্চাশ টাকা বিঘা দরে জমি কিনেছিল যারা, তারা সেই জমি দুই থেকে যত বাড়ানো যায় তত হাজার টাকা কাঠা দরে বেচে লাল হয়ে

গেল এ ত বিজয় চোখের সামনেই দেখছে। জমি বেচা টাকায় তাদের দোতলা, মোজেইক, ভাড়াটে, দোকান। সেখানে লাল আর তেরঙ্গায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। লাল তেরঙ্গা ভাই-ভাই। সেই সহাবস্থানে অশান্তি দেখা দিলে লালে লালে কোর্ট-কাছারি। তেরঙ্গায় তেরঙ্গায় কোর্ট-কাছারি। লালে তেরঙ্গায় গালাগালি। হাতাহাতি। মারামারি।

ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দেবার আগে বিজয় একবার দোকানে আসে। দীনবন্ধুকে নিয়েই আসে। দোকান বলতে কাঠ, তক্তা, কেরোসিন তেলের টিন চ্যাপ্টা দেয়ালের ওপর খড়ের চাল। ফি বছর খরচ কমাতে বিজয় নিজেই জোগাড়ে হয়ে ঘরামিকে খড়ের আটি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয়। দড়ি দিয়ে বাঁধে। দোকানের ডান দিকে ছোট বেঞ্চি। চেয়ার। টেবিল। তারও ডাইনে জোড়া উনুন। তক্তার ওপরে রান্নার হাঁড়ি, কড়াই, খুন্তি, হাতা, চামচ, থালা, বাটি, গেলাশ। দু-কোণে দুটো মাটির জালায় খাবার আর রান্নার জল। বাঁদিকে ওই একই চালার নিচে একটা আলকাতরা মাখানো কাঠের গুমটি ঘর। সেখানে বিজয় বসে। পান, বিড়ি, দেশলাই, সিগারেট, পাউরুটি, লেড়ো বিস্কুট, পাঁপড়, চানাচুর, লজেন্স বেচে। গুমটির সামনে নিচু খুঁটির ওপরে দুখানা তক্তা বেঞ্চির মত পাতা। দোকানের বাইরেও খানদুই বেঞ্চি। সকাল বিকেল ভদ্রলোকেরা কেউ কেউ বসেন বিজয়ের দোকানে। কেউ প্রচুর দুধ চিনি দেওয়া ন্যাকড়ায় ছাঁকা গুঁড়ো চা খেতে খেতে গল্প করেন, কেউ-বা এমনিই বসেন।

অশ্‌কার এখনো কাজে সড়গড় হয় নি। প্রথম দিনই জিনিশ ভেঙেছে, তবু বিজয় মারে নি ওকে। কিন্তু পয়সা কেটে নেবে বলেছে।

বিজয় থাকতে থাকতেই অশ্‌কা দোকান সাজায়। চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চি মোছে। আলগা বেঞ্চি দুটো ভেতর থেকে বাইরে টেনে আনে। ঝাঁট দেয়। কলে জল আসার দেরি আছে বলে রাতের কিছু বাসন দোকানের বাইরে রাখা তোলা জলেই ধোয়। ভিকিতে উঠে বিজয় স্টার্ট দেয়। দীনবন্ধু পেছনে ওঠে। 'এক ঘড়িতেই ঘুর‍্যা আসচ্যি' বলে বিজয় গাড়ি চালিয়ে দেয়। শিবু সেদিকে তাকিয়েই বিড়িতে শেষটান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে, বলে, 'লেরে অশ্‌কা শিলনোড়াখান পেতে মশলার থালা আর জলের ঘটিখান দে।'

হাসিমুখে অশ্‌কা কাজে লেগে যায়।

চব্বিশ

দীনবন্ধুর কে জি স্কুল

স্কুলটা অল্পদিনের। দোতলা বাড়ির বারান্দায় গ্রিলের ওপরে ঝকঝকে সাইনবোর্ডটি ঝোলে। রাস্তা থেকে সরু একটা সিঁড়ি উঠে গেছে। ঢুকেই অফিসঘর। পার্টিশানের ওপারে প্রিন্সিপালের চেম্বার। ছেলেকে পৌঁছে দেবার সময় রোজই বিজয়ের বুকে

ঢেঁকির পাড়। 'মেয়েছেল্যাগুল্যান ফটাফট ইংরাজি বইলচ্যে'—প্রথম দিন বাড়ি ফিরে বউকে বলে ও। বউ বলে, 'ছুঁড়িগুল্যার বিয়া হয় নাই?'

বিজয়ের বংশ ভাল। সেটা দৃশ্যত ওর গায়ের রঙে, কাটা কাটা নাকচোখ চিবুকে, শরীরের ছিপছিপে দীর্ঘ গড়নে। পালের পো যখন কলার তোলা গেঞ্জি পরে জীনসের প্যান্টের হিপ পকেট থেকে, প্রসঙ্গত ঘন নীল রঙের প্যান্টটি আসানসোলের সেকেন্ড হ্যান্ড বিদেশী জামাপ্যান্টের ফুটপাথের দোকান থেকে ও নিজেই কেনে আড়াইশ টাকায় ছেলেকে স্কুলে ভরতি করানোর ঠিক আগে, পার্স বের করে গোছাখানেক দশটাকার নোট ফর্মসমেত প্রিন্সিপাল শিবতোষ সেনের সামনের টেবিলে রাখে তখন শিবতোষের আদ্যোপান্ত বাংলা মিডিয়ামের হোঁচট খাওয়া ইংরেজি গলায় আটকায় আর কি!

কিন্তু সে চমক ত মিনিটখানেকের বেশি স্থায়ী হয় না। বিজয় পাল মুখ খুললে শিবতোষ স্বস্তি পায়। দাঁত চেপে বলতে পারে, 'ওকে, থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ পাল।'

রোজই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বিজয়ের দীর্ঘ চেহারাটা কুঁকড়ে যেতে থাকে। তার পোশাক, ভিকি, তার চেহারা সব কেন্নোর মত গুটিয়ে যায় ছেলেমেয়েদের সমবেত চিৎকারে। মিসদের দ্রুত ইংরেজি বলায়।

'গুড মর্নিং মিস।'

'হাই, সাউমেন!' [সৌম্যেন]

কোনো বাচ্চা কেঁদে উঠলে চুড়িদার-কুর্তা পরা অল্পবয়সি মিস ধমকায়, ডোন্ট ক্রাই। রান, বান, ডালিয়া। পরক্ষণেই বাচ্চার মায়ের দিকে ফিরে, 'প্লিজ গো হোম, আদারওয়াইজ উই কান্ট ম্যানেজ হার।' একটু বর্ষিয়সী একজন বলেন, 'আপনারা পৌঁছে দিয়েই চলে যাবেন। এ্যাট ফার্স্ট বাচ্চারা একটু কান্নাকাটি করে বাট দ্যাটস ন্যাচারাল। ডোন্ট ওরি দে উইল বী ওকে হিয়ার।' মায়ের উদ্বিগ্ন ও ভীত বাঙালি মুখখানার দিকে তাকিয়ে মিস হাসেন।

বিজয় ছেলেকে ফিসফিসিয়ে বলে, 'মিসদের কথা শুইনবি। মন লাগাই পইড়বি। বারটার সোময় আমি আইসব।'

দীনবন্ধু তার নির্বোধ চোখ দুটি তুলে হাত নেড়ে বাবাকে টা-টা করে। এটি অবশ্য তার স্কুলের শিক্ষা নয়। সে যখন মায়ের কোলে, বছরও পেরয় নি, তখনই সে আর সব বাচ্চার মতই এটা শিখেছে। 'আয় আয় চাঁদমামা'র সঙ্গে সঙ্গেই তার 'টা-টা' শিক্ষা।

ঘণ্টা বাজলে ছেলেমেয়েরা প্রেয়ারের লাইনে দাঁড়ায়। প্রত্যেক ক্লাশের মিস নিজের নিজের লাইনের বাচ্চাদের ঠিক করে দাঁড় করিয়ে দেন। বিজয় সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে আসে। ওর পেছনে সমবেত কচি গলায় গানের সুর ভেসে আসে। গানের সুরটা ওর ভারি ভাল লাগে। ও সিঁড়ির গোড়ায় একটু দাঁড়ায়। একই সুর যেন আস্তে আস্তে উঠছে। আস্তে আস্তে নামছে। গানের কথাগুলো ও বোঝে না কিন্তু শব্দের ধ্বনিতেই ও আবিষ্ট হয়ে থাকে ভিকিতে উঠেও—

'আই হ্যাভ ওয়ান্ডারড ফার অ্যাওয়ে ফ্রম গড/ নাউ আয়্যাম কামিং হোম। দ্য পাথ্‌স্

অব সিন টুউ লং আয়্যাভ ট্রড/ লর্ড আয়্যাম কামিং হোম।'

দীনবন্ধু তার বাপেব পারা 'দকানদার হব্যাক নাই ডাকতর হব্যাক বড় চাকরি কইরবেক—' বিজয় পাল দ্রুত তাব দোকানের দিকে গাড়ি চালায়।

পঁচিশ

গগন মাজি

দোকানে এসে বিজয় ভিকিটা একপাশে রেখে একটা নীল পলিথিনের সীট চাপা দেয়। গেঞ্জি খোলে। প্যান্ট খোলে। দুটোই একটু ভেতরের দিকে কাঠিতে ঝোলানো হ্যাঙ্গারে রাখে। তালা খুলে গুমটি থেকে ধূপকাঠি নেয়। কাঠের তক্তার ওপর লালরঙের মাটির গণেশের সামনে ধূপ জ্বালায়। গুমটিতেই একটা পলিথিনের প্যাকেটে একটা স্যান্ডো গেঞ্জি, লুঙি আর গামছা থাকে। কলে জল এলে, দোকানের সামনে, রাস্তার ধারেই ত সরকারি কল, ও চান করে নেয়। চান না করলে মনটা কেমন খচখচ করে। চান না করা পর্যন্ত ঠিক শুদ্ধ মনে হয় না নিজেকে।

কলেব পাশে চারখানা ইট পেতে ও একটা কল লাগানো ড্রাম রেখেছে। কলে যতক্ষণ জল থাকে এই ড্রামের জল খরচ হয় না। কল ছাড়াও জলের ব্যবস্থা আছে। মাজিবাবুর ইঁদারা। দোতলা বাড়ির চার ফ্ল্যাটের জন্য। নতুন তৈরি দোকানঘর ভাড়া হলে তার লোকজনের জন্য। দোকানঘরগুলো ওঠার আগে ইঁদারাটা রাস্তা থেকে দেখা যেত। এখন গোটাচারেক দোকান ঘব. শাটার লাগানো ও জানলাবিহীন হওয়াতে একটু ঘুরে বাড়িটার সামনে দিয়ে জল আনতে হয়।

ইঁদারাটা খুব বড় আর গর্ভীর, এত গভীর যে একটা বালতি পড়ে গেলে তুলতে চব্বিশ টাকার রশি লাগে। তবু এত গভীরতা সত্ত্বেও ইঁদারার জল খাওয়া যায় না। ওপরে চাপ চাপ শ্যাওলা আর নীচের দু-ফ্ল্যাটের বাচ্চাদের ফেলে দেওয়া কৌটো, গাছের ডাল, কাগজ এইসব ভাসে, বালতিতে জল তুললে হালকা-সবুজ লাগে। ফ্ল্যাটের জল পাম্পে ওঠে বলে না থিতালে সবুজ বোঝা যায় না। লোকে বলে পাঁচিলের ওপারে, এখন যেখানে গ্যারেজ সেখানে নাকি অ্যাসিড কারখানা ছিল।

এদিকে সরকারি কলে ত মর্জিমাফিক জল। শীতে আর বর্ষায় কোনো কোনোদিন দুবেলা এত জল যে বাস্তার মাঝে মাঝে পাইপের ছ্যাদা দিয়ে জল বেরিয়ে ঘোলাজলের ঘূর্ণি ওঠে। কলে মুখ লাগালে সাতদিনও টেঁকে না, ফলে জল উপচে রাস্তা কাদা। গরমকালে মাঝে মাঝে বিনা নোটিশে জল আসে না। কিংবা এলেও এক-দেড় ঘণ্টায় শেষ। হাঁড়ি-কলসি ঠনঠনিয়ে বাউরিপাড়ায় বউ-ঝিরা যায় লোকের বাড়ির কুয়োতে নয়ত আরো দূরে প্রাইমারি স্কুলের লাল জলের টিউবওয়েল পেরিয়ে রূপনগরের ডীপ টিউবওয়েলের দিকে। ফ্ল্যাটের লোকদের ভারি অসুবিধা। কিরীট বনবিভাগের কাশীকে দিয়ে জল আনায় টিউবওয়েল থেকে। জল তোলায় ইঁদারা থেকে। অন্য ফ্ল্যাটের আর

ওপরের দুই ফ্ল্যাটের বাবু গিন্নিরা ব্যাজার মুখে নিজেরাই নয়ত একে ওকে সাধাসাধি করে, পয়সা দিয়ে জল আনানোর কাজ সারেন।

কলে জল এলে বিজয় বউ, ঝি, ভারী আর গ্যারেজের ছেলেদের মাঝখান দিয়ে একসময় চান সেরে নেয় চট করে। তামার ছোট ঘটে জল ভরে। ভেজা গামছা পরে কালিঘাটের মায়ের ছবিটা মোছে। সন্তোষী মা, বাবা তারকেশ্বর, কৃষ্ণের কালীয়দমন এসব ছবি মোছে। ধূপ জ্বালায়। হাতজোড় করে ছবিগুলোতে মাথা ঠেকায় একের পর এক।

'কই হে বিজয়, পান দাও এট্টা জর্দা দিয়ে।' গগন মাজির গলা শুনে বিজয় বিনীত ও ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'এই যে দিই মাজিবাবু।' গগন বেঞ্চিতে বসে। উদাস মুখে। বিজয় চট করে গামছা ছেড়ে লুঙি পরে নেয়। ভেজা গামছা দোকানের ভেতরে টাঙানো দড়িতে মেলে দেয়।

গগন মাজির চেহারাটি ছোটখাট। বয়স আন্দাজ করা কঠিন। তবে তিরিশের কোঠায়। বিজয়ের মনে পড়ে না সে কোনোদিন গগনকে পাটভাঙা জামাকাপড় পরতে দেখেছে কিনা। গগন কোনোদিন একটা রঙজ্বলা খাদির পাঞ্জাবি, কোনোদিন একটা আধময়লা ঘিয়েরঙের টেরিকটের গুরু-পাঞ্জাবি পরে। পাজামাটার গোড়ালি পর্যন্ত ঝুল। সেটার রঙ কাচা হলে নীল নইলে লালচে। শীতে ওরই ওপরে একটা রঙচঙে ভুটিয়া মাপলার আর একটা শস্তা কালো লেডিজ চাদর। তবে গগন যখন ঠিকাদারির কাজে এদিক-ওদিক যায় তখন একটা গোলাপি ফুলশার্ট আর কালোরঙের ফুলপ্যান্ট পরে। শীতকালে এর উপরে একটা পুরনো কালো কোট চাপায় বলে তাকে রেলের ভ্রাম্যমাণ টিকিট চেকারের মত দেখায়।

গগনের বাহন ওর মিস্ত্রি কুরবানের রাজদূত। সেটা এত পুরনো যে তার সারা শরীরে বুড়ো হাতির মত ছোপ ছোপ শাদা দাগ। কিন্তু কুরবান যখন গগনকে পেছনে বসিয়ে সেটা চালায় তখন রাস্তার ধারের দোকানে, পথচলতি বা বাড়ির জানলা, কি ছাদে বারান্দায় দাঁড়ানো মানুষজনের মনে হয় 'গাড়ি একখানা বটে!'

গগন পায়ের ওপর পা তুলে বেঞ্চিতে বসে থাকে। একাই। ওর ছোটখাট ছুঁচলো মুখখানায় এমন এক ধূর্তামির ছাপ যে বিজয়ের মনে হয়, না বুঝেই মনে হয় ওর দোকানের পাউরুটি, বিস্কুট নষ্ট করে দেয় সেই নেংটি ইঁদুরের মতই যেন গগনের মুখখানা।

মন দিয়ে পান সাজে বিজয়। সাজা হয়ে গেলে একটা আলগা বোঁটায় চুন দেয় এক চিমটি। ন্যাকড়ায় হাত মুছে, বিনীত, বাঁ হাতের আঙুলগুলো ডান কনুইতে ছুঁইয়ে পানের খিলিটি বাড়িয়ে দেয় গগনের দিকে অল্প হাসিসমেত—

'লেন, মাজিবাবু পান। ঠিক হইচ্যে?'

গগন পান মুখে দেয়। পাঞ্জাবির ঝুল পকেটে হাত ঢোকায় রোজকার মত। রোজকার মতই বিজয় হাত জোড় করে বলে, 'ছি, ছি, এট্টা পান খাবেন তাথে...।' কথাটা শেষ করার আগেই গগন দুটো দশ পয়সা ওর দিকে বাড়িয়ে পানের রস ভরা গলায় বলে, 'ধর।'

একটা স্কুটার এসে থামে। কালো চশমা খুলে গগনের পাশে ধপ করে বসে পড়ে সুবীর বলে, 'বিজয় আজ একটায় খাব।' সুবীর বার্নপুরে থাকে। ওর জ্যাঠতুত দাদা তরুণ কন্ট্রাক্টারির কাজে বছর দুয়েক রূপনারায়ণপুরে। সুবীরও ঠিকাদারি করে, এই এলাকাটা ওর জানা। তরুণ মাসকয়েক হল গগনের এই বাড়ির দোতলার রাস্তার দিকের ফ্ল্যাটে উঠে এসেছে। সম্প্রতি ওরা একসঙ্গে কেবলস্‌-এ টেন্ডার পাওয়াতে সুবীরের রোজই বার্নপুর রূপনারায়ণপুর ছোটাছুটি। কাজ প্রায় হয়ে এসেছে কিন্তু ও ত জানে টাকা আদায় করতে কত তেল পুড়বে। তরুণের কলকাতার অভিজ্ঞতা এখানে চলবে না।

গগন পান মুখেই বলে, 'এই এলেন বুঝি?' গগনকে সুবীর ঠিক পছন্দ করে না। সে কি একই জীবিকায় আছে বলে না অন্য কোনো কারণে তা সুবীর কখনো ভাবে নি তবে সুবীর খুব টিপটপ স্বভাবের মানুষ, তার পোশাক-পরিচ্ছদ নিখুঁত। কলকাতায় গেলে সে অন্তত একটা রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান শুনবে। গগনের স্বভাব আর চেহারার আধা গ্রাম্যতা আর অপরিচ্ছন্নতা হয়ত তাকে অ্যালিয়েনেট করে। গগনের প্রশ্নের জবাবে সে অস্ফুটে 'হুম' বলে উঠে স্কুটারের ক্যারিয়ার খুলে একটা পলিথিনের ব্যাগ বের করে আনে। ওরা দুভাই বিজয়ের দোকানে ডাল আর ভাত নেয়। টিফিন ক্যারিয়ারে সুবীরের বউ রাকা মাছ, মাংস, তরকারি গুছিয়ে দেয়। অশ্‌কা দৌড়ে এসে টিফিন ক্যারিআর সমেত ব্যাগটা ভেতরে নিয়ে যায়। সুবীর স্কুটারটা লক করে। গগন আবার বলে, 'কাজ কেমন হচ্ছে রায়বাবু?' চাবির রিঙটা আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে সুবীর হেসে উত্তর দেয়, 'এই চলছে আর কি।'

'চাটা খাবেন নাই?' বিজয় বলে। 'চা পাঠিয়ে দাও দুটো।' সুবীর লম্বা লম্বা পদক্ষেপে দোকানঘরগুলোর সামনে দিয়ে ফ্ল্যাটের দিকে এগয়। নতুন দোকানঘরগুলোর দুটো ঘর ভাড়া হয়ে গেছে। আজ শুক্রবার তাই দোকান বন্ধ।

সুবীরের যাওয়ার দিকে গগন তাকিয়েছিল। বিজয় গগনের কাছে আসে। একেবারে পাশটিতে, কোমর থেকে শরীরের ওপরের অংশ কিঞ্চিৎ বেঁকিয়ে, যাতে গগনের কানের কাছে মুখটা আসে, বলে, 'মাজিবাবু একটো কতা বইলছিলুম।' বিজয়ের কথা শুনে প্রথমেই গগন কোনো উত্তর দেয় না, পিচ্‌ করে পানের পিক ফেলে খানিকটা, তারপর ভাবলেশহীন মুখে বলে, 'বলো, শুনছি।'

'বইলছিলুম কি, দকানের হালটো ত দেইখছেন।' কোমর সোজা করে বিজয়—কেননা বেশিক্ষণ এভাবে থাকলে ওর কোমরে খিচ ধরে। গগন তেমনি ভাবলেশহীন মুখেই বলে, 'ম্‌হুঁ।'

'ত বইলছিলুম কি—আমাকে যদি এট্টু কনসিডার করেন, মানে ওই অ্যাডভান্সটো।

কাঁচা দকানে ত কাসটোমার বেশি টানে না। মহাদেব ঘোষ পাকা দকান দিলেক। তা বাদে গরমেন্টের ভেস্টেড ল্যান্ডে ত আমার দকান, গতবছরই ত দেইখলেন ক্যামুন দকানটো ভেঙে দিলেক!'

নতুন দোকানঘরগুলোর দুটো এখনো ভাড়া হয় নি, বিজয় একেবারে ওর দোকানের লাগোয়া সব চাইতে ছোট ঘরখানা চেয়েছে। গগন বলেছে দশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স লাগবে। গগন তেমনি উদাস চোখেই বলে, 'বার হাজার হাতে নিয়ে সাধাসাধি কইবছে মজুমদার। ত তুমি হল্যা গাঁঘরের ব্যাটে। তমাকে কনসিডাব কইরথেই হবেক। তা দশ না পার আট দিও।'

'সাড়ে সাত করেন আঁইজ্ঞা—কাল দিল্যে হব্যাক?'

'তুমি দেখছি আলুপটল দর কইরচ বিজয়। ইসকল কতা কি ইখেনে হয়? ঘরে যেও কতা হবে, আমি উঠি।' গগন উঠে পড়ে। কয়েক জন মজুর, কামিন আর পেছনের গ্যারেজের সমীর, চিনু চায়ের জন্য বেঞ্চিতে বসে। গগনকে এবার পাথর ভাঙা মেশিনের তদারকিতে যেতে হবে। মজুর-কামিনগুলো বড্ডো ফাঁকিবাজ। না ঠেললে একবেলার কাজ দুবেলা টানবে।

গুমটিতে উঠে বিজয় মনে মনে বলে, 'জয় মা কল্যাণেশ্বরী। টাকা ঝাবেক যাক দুমাসেই উঠাই লিব। কই হে কারিগব তুমার কতদূর? অশকা. বেটা চা দেরে ইয়াদের।'

ছাব্বিশ

জবার আবার অসুখ

চৌধুরীর চিকিৎসায় জবা আবারও একটু সারে। পায়ের ফোলাটা কমে। ব্যথাটাও। ঘাড়ের ব্যথাটা কমে না অবশ্য। রাত্রে জ্বর আসে কিনা বোঝা যায় না, গলাটা খুশখুশ করে সবসময়. রাতে সেটাই বেড়ে যায়। বেড়ে যায় আর কাশি হয়। কাশতে কাশতে ওর বুকে ব্যথা। সুখী নিজেই তেলপড়া দেয়। বাসন মাজলেও ওর হাতের পাতাদুটি ছোট, পাতলা আর নরম। সেই হাতে ও বেশ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মালিশ করে। তাতে জবা একটু আরাম পায়। ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ওর ঘাম হয়। ঘামে মাথা ভেজে। বালিশ ভেজে। পিঠ ভেজে। জামা ভেজে। সারারাত অমন ঘামের মধ্যে শুয়ে শুয়ে সকালে ওর চোখে ঘুম যেন আরো জড়িয়ে ধরে। ঘাম শুকিয়ে গা মাথা চটচট করে। ঘাম শুকিয়ে গা মাথায় গন্ধ হয়। সেই গন্ধের মধ্যে, যেন-বা নিজেরই মৃত শরীরের গন্ধের মধ্যে ও এক অকাতর ঘুময়। প্রায় মৃতের মতই নিঃসাড় পড়ে থাকে ওর বেড়ে না ওঠা কিশোরী শরীর।

একটু বেলা হলে ওর ঘুম ভাঙে। মুখের ভেতরটা তেতো হয়ে থাকে। মাথাটা ভার হয়ে থাকে। হাত-পাগুলো আলগা লাগে। হালকা লাগে। বাড়িটা ফাঁকা। অশকা সবার আগে

কাজে যায়। তারপরে যায় ববিতা। সুখী যায় সবার শেষে। জবা ওঠে। নিজেই ওঠে। আস্তে আস্তে বাইরে যায়। দরজায় শিকল তুলে রাস্তা পেরয়। বেলা হয়েছে। লোকজন যাওয়া আসা করে। ও হাঁটে। অনেকটা গিয়ে একটু ঝোপের আড়ালে বসে। পেটটা ব্যথা। চৌধুরীকাকুর ওষুধে কেঁচো পড়েছে তিনটে। তাতে ব্যথাটা কমে। তবু কয়েক দিন পর পরই পেটে মোচড় দেয় ওর।

মাঠ থেকে এসে ও খানিকক্ষণ বসে থাকে। মাঠেই একটা নিশিন্দার ডাল ভাঙে। পাতাগুলো মালসাতে রাখে। সন্ধ্যাবেলিতে পোড়ালে মশা কইমবে। ডালগুলো টুকরো করে দাঁতনের সাইজে। মুখে দাঁতন দিয়ে ও উঠনের পাঁচিল ধরে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে দাঁত মাজে। নিমডাল দিয়ে দাঁতন করলে প্রথমে তেতো লাগে ঠিকই, কিন্তু মুখ ধোয়ার পর মুখের ভেতরটা যেমন ফুরফুরে লাগে, নিশিন্দায় অতটা হয় না। কিন্তু নিমডাল ত অনেক উঁচুতে ওর হাত পৌঁছয় না, অশকাই এনে দেয় একগোছা করে।

'শুনরে, এ জোবা?' দাঁতন মুখেই মুখ তুলে ও দেখে ভুবন বাউরির বউ ব্যটে। ভুবনের বউ লম্বা-চওড়া মেয়েছেলে, মুখখানা হাসি হাসি, ওদের পিছনে থাকে। ভুবন রিকশা চালায়। বউ শান্তিরানী পাথর মেশিনে কাজ করে।

'কাকী, মিশিনে যাও নাই আজ?' জবা দাঁতনটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় পাঁচিল পেরিয়ে রাস্তার ধারের নতুন তৈরি নর্দমায়। এই পাকা নর্দমা হওয়াতে বাউরি-বাচ্চাদের ভারি সুবিধা হয়। মায়েদেরও হয়। মাঠের বদলে নর্দমাতেই পায়খানা করে ছোটরা। আর উঠন ঘর ঝেঁটিয়ে জড় করা ময়লা নর্দমাতেই ফেলে দেয় বাউরি-মেয়েরা। নর্দমাটা খুব গভীর আর চওড়া বলে এখনো উপচে পড়ে নি। খালি তলায় কালো পাঁক জমেছে বোঝা যায় এক নতুন দুর্গন্ধে।

'নারে, শরীলটো ঠিক নাই আজ।' বলে শান্তি এদিক-ওদিক দেখে নেয়, তারপর রাস্তা থেকে নেমে পাঁচিলের ওপাশে দাঁড়ায়; বলে, 'ঈশ্‌স্‌ তর চ্যাহারা ইমন হইচোঁ! মড়ার পারা শাদা দেখাইচ্চোঁ মুখটো! তা তুর নাকি টিবি ব্যটে?' জবা চুপ করে থাকে। চোখ দুটি ছলছল, আনত করে রাখে। শান্তি আরো বলে, 'ভিটামিন খাবি। মাছ খাবি। হর্লিক খাবি। কলা খাবি না। ডিংলা খাবি না। আহারে, তকে ঘর‍্যা ফেল্যা তর মা কাজে গেল্যা বুজি?' জবার নিরুত্তর শান্তির লক্ষ্যে থাকে না, সে কথাকটি বলে হেলেদুলে মাঠের দিকে চলে যায়।

মুখ ধুয়ে কৌটোর ভেতরে রাখা প্যাকেট থেকে পুরিয়া বের করে জবা সকালের ওষুধটি খায়। টিবি রোগ হইচোঁ তার? হায় ভগমান তাহলে ত ও মর‍্যা যাবেক! ও দু-তিনবার কাশে। থু-থু করে কাশিটা থুথুর মত ফেলে মাটিতে। নিচু হয়ে দেখে রক্ত পড়ে কিনা। রক্ত পড়ে না তবু কাকী টিবি বইল্‌ল কেনে? ওর খিদে পায়। কৌটোতে মুড়ি আছে। মুড়ি আর কলাই সিঁজ্যা বাটিতে নিল। একটি দুটি খায় আর দরজার দিকে দেখে। ভাই আসবে না এখন ও জানে। ববিদিদি আসবে বাবুঘরের খাবার নিয়ে। মা আসবে চা-রুটি নিয়ে। ওরা কি জানে জবার টিবি হয়েছে? ওরা কি জানে জবা এবারে

মরে যাবে? মুড়ি খেয়ে একবাটি জল খায় ও। পাঁচিলেব পাশে দাঁড়িয়ে দেখল জল আনতে যাচ্ছে সবাই। এখন রোদ তত চড়া নয়। গায়ে ফোটে না। ও চুলগুলো খোঁপা করল। ছোট চুল বলে খোঁপাটা উঁচুতে করতে হল। আর তাতে ওর সরু ঘাড় আর তার নিচে উঠে থাকা শিরদাঁড়ায় গিঁট দেখা গেল। মাটির কলসি আব বালতি নিয়ে ও জল আনতে গেল। পিতলের কলসি ছিল একটা, ওরই অসুখে বাঁধা দিয়েছিল সুখী। ছাড়ানো হয় নি।

জল আনতে তিনবার কলে যেতে হল। শেষবার ও চান করে এল। কলের সামনের দোকানটাই ত বিজয়ের। অশ্‌কা একছুটে দিদির হাতে একটা কাগজে জড়ানো দুটো চপ দিয়ে বলল, 'ঘর যেছিস, ত চপ লিয়ে যা। খুউব ঝাল।'

এক ডেকচি জল আর চপের ঠোঙা নিয়ে ভিজে জামাকাপড়ে জবা বাড়ি যায়।

বাড়ি ফিরে সুখী দেখল উনুনে আঁচ পড়ে নি। ববিতা পা ছড়িয়ে বসে আছে। জবা খাটিয়া পেড়ে চিৎ হয়ে শুয়ে।

চায়ের গ্লাশটা উনুনের ধারে নাবিয়ে রাখে সুখী। পেটকাপড়ে তিনটে রুটি আর আলুচচ্চড়ি বাঁধা ছিল ঠোঙাসমেত, সেগুলো নামিয়ে রাখে ওখানেই। তারপর বলে, 'উনান ধরাস নাই কেনে? চান কর‍্যা, মাথা আঁচড়ি শুলি কীসকে? ববি তুই আগুন ধরাস নাই কেনে?'

ববিতার বয়স, বাউরি মেয়েদের তুলনায় ঢের। ওর বয়সে ছেলের মা হয়ে যায় এবা। মায়ের কথায় সে চোখ তোলে। সে চোখের ভাষা সুখী পড়তে পারে। স্বর পালটে সে বলে, 'অমন কর‍্যা ভালচিস কেনে?'

'শান্তিকাকী জোবাকে বল্যাচে উয়ার টিবি হইচ্যে—তাথেই কাঁদ্যে কাটে বইলচ্যে মর‍্যা যাবেক। উ আর বাঁইচবেক নাই। কত বড় কতা দেখ মা, উ মাগীটোর মরণ নাই?' ববিতা ঝেঁজে ওঠে।

জবা চোখ খোলে। চোখ তোলে। কেঁদে কেঁদে চোখের কোল ফুলে আছে। চোখের কোণ লাল হয়ে আছে। সুখী চেঁচায় 'কুন হারামী বল্যে, আমার মেয়্যার টিবি হইচ্যে? তর হইচ্যে, তর বাপের হইচ্যে, তর গুষ্টির হইচ্যে টিবি! হঃ কি আমার ডাগদর আলেন?'

বনমালীর মৃত্যুর পর সুখীকে তেমন ঝগড়া করতে হয় নি, তেমন চেঁচাতে হয় নি। চোদ্দ বছরের বালিকার আঠার বছরের স্বামী সোহাগে অভিমানে, আদরে রাগে, বছরে বছরে যেমন তার শরীর ও দিনযাপনের এক আবশ্যিকতায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল—সেই শূন্যতা সুখী পূর্ণ করবে কী দিয়ে? জেনে বা না জেনে? বুঝে বা না বুঝে?

জবা ওঠে। বলে, 'খাত্যে দে।'

এমন করে ও খেতে চায় না কোনোদিন। ববিতা তাড়াতাড়ি উঠে জবাকে ধরে, 'কী খাবি বুন? চা-রুটি আলুভাজা খাবি?' ডাইনে বাঁয়ে মাথা হেলায় জবা। 'খাব নাই

তদিগের চা-রুটি খাব নাই। ভাই দুটি চপ দিচ্যে। ঠঙে আচে দে।'

দুটো চপই নেয় জবা। দুহাতে। একবার ডান হাতের চপে কাপড় দেয়। ফিরে বাঁ হাতের চপে। শিউরে ববিতা চোখ ফিরিয়ে নেয়। উনুন ধরাবে বলে কাঠ ঘুঁটে আনতে গিয়ে এক পা এগিয়ে মুখ ফিরিয়ে মাকে বলে, 'কয়লা দিল্যা ডেঁরি হব্যাক ত ডাব দিব?' কাজের বাড়ি থেকে সুখী কয়লার গুঁড়ো এনে গুল দিয়ে রেখেছে। ববিতা তাই বোঝায়। সুখী জবাকে ধরে। বলে, 'তাই দে। দুটি আলু দিস ভাতে।'

হালুম হুলুম করে চপ খেয়ে জবা শুয়ে পড়ে। একটু পরে উঠে বমি করে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। ঘণ্টাখানেক পরে সুখী ববিতা ফ্যানভাত আর আলুসানা খায়। জবা ওঠে না। জবা খায় না। জবা ঘুময়।

সাতাশ

অশ্‌কার দিনগুলি, রাতগুলি

বিজয়ের নতুন দোকানের দরজার ওপরে এখনো দড়িতে টাঙানো আমপাতা শুকিয়ে আছে। পুরনো দোকানের চালাটার জায়গায় শুধু গুমটিঘরটাই নতুন দোকানের বারান্দা ঘেঁষে সরিয়ে রাখা হয়েছে; তার সামনে জোড়া উনুন।

মহাদেবের দোকান বন্ধ। মহাদেবের বাড়ির লোক বলে বউকে বাপের বাড়ি রেখে মহাদেব আবার দেশান্তরী হয়েছে। পাড়ার লোকে বলে বীরেন আর তার বউ মহাদেবের বাড়ি ছাড়ার কারণ। মহাদেব নাকি তার শ্বশুরবাড়ি সততোরে আছে।

তা মহাদেব যেখানেই থাকুক তার দোকানটা না থাকাতে বিজয় পালের সুবিধা। অতগুলো টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে তার এখন লস খেলেঁ্য চইলবেক নাই। এদিকে তার অমন যে কাবিগর শিবু সে এই নতুন ঘরে দোকান উঠে আসার আগেই গ্রামের কাছে রাস্তার ওপরেই চায়ের দোকান দিয়েছে। শিবুর নাকি চায়ের দোকানটাই লোক দেখানো, রাতে মদ জুয়োর জন্য পেছনের পাকাঘরটা আছে। বিজয় বলে, 'ইসকলই মিছা কতা। শিবু কণ্ঠিআলা বোষ্টম ব্যটে, তাবাদে উয়ার লাইসেন নাই। সামনেই ভাদুর ঠেক থাইকতে উয়ার কাছকে লোকে যাবেক?'

এই দোকানঘরগুলোর মধ্যে বিজয়েরটাই মুদিখানা। ভাত-রুটি-তরকারির পাট চুকিয়ে ও মুদিখানা বাদে মুড়ি তেলেভাজা চা ঘুগনি বেচে। ফলে শুক্রবার ওর দোকান বন্ধ থাকে। আর চাল, ডাল, তেল, নুন, চিনি, আটা, ময়দা, মশলাপাতি বেচতে বেচতে বিজয় হয়ে ওঠে বিজয় পাল—পালবাবু।

অন্য দোকানগুলোর দুটো গাড়ি মেরামতের। মাঝের ঘরটা সেন্টুর—স্পেয়ার পার্টস, রঙ এইসবের।

বিজয়ের নতুন কারিগরের নাম 'প্রিন্স'। নামটা সেন্টুই দিয়েছে নইলে ওর নাম নিতাই। নিতাইকে এত নিখুঁত দেখতে যে এই রুক্ষ পটভূমিকায় তাকে শাপভ্রষ্ট দেবতার মত লাগে। সে যখন হাতে অটোমেটিক ঘড়ি পরে জীনসের প্যান্ট গুটিয়ে কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে আলুর চপ ভাজে তখন মনে হয় হিন্দি ফিল্মের কোনো দৃশ্য বুঝি। তার টকটকে শরীরের পাশে মাথায় একটু বেড়ে ওঠা অশ্কাকে মনে হয় কষ্টিপাথরের কিশোর কৃষ্ণ।

অশ্কা এখন অনেক কাজ করতে পারে। করেও। বিজয় পাল মুদিখানা চালায় আর ফাঁক পেলেই সেন্টুর সঙ্গে নয়ত তার পাশের দোকানের বরুণের সঙ্গে গল্প করে। বরুণের দক্ষতা টু হুইলারে। গাড়ির দিকে ও একচোখ সরু করে তাকিয়ে থাকবে ছুতোর মিস্ত্রির মত, তারপর ঝপ করে ঠিক জায়গাটা খুলে ফেলবে। রোগা ফরশা চেহারা বরুণের চেয়ে একেবারে ওপাশের দোকানের ইয়াসিন ফিরোজখান আর রুস্তমকে বেশি ভাল লাগে অশ্কার। দোকানের কাজ তার ভাল লাগে না। কয়লা ভাঙা, এঁটো বাসন মাজা, ঝাড়ু দেওয়া, ময়দা ঠাসা, মশলা পেষা, আলুর খোসা ছাড়ানো, কলে লাইন দিয়ে জল আনা এসবের ভেতরে এক নিরন্তর নিরানন্দ আছে। অপমানের চোরাস্রোত আছে। মানুষে মানুষে শ্রেণীভেদের অনুভব আছে। সে অনুভব অশ্কার বালকমন বারেবারে পায়, কিন্তু তাতে আহত হওয়া ছাড়া গতি নেই। এই আহত অনুভবের কি প্রকাশ তা ত ও জানে না। তবু এই কাজের মধ্যে ওর আর এক আবেগ ঘন হয়ে ওঠে। গ্যারেজের, মোটরমেরামতি দোকানের কাজে, গাড়ির আওয়াজে, ডিজেল পেট্রলের গন্ধে, মিস্ত্রি মজুরদের হাসি ঠাট্টায়, কাজের ব্যস্ততায়, মানুষজনের কথায়, হাসিতে, চাহনিতে এক অন্যজীবনের স্বর যেন আবছা চেনা হয়ে ওঠে দিনে দিনে।

আজকাল ওর রাতেও বাড়ি ফিরতে মন ওঠে না। রাতে বিজয় শাটার নামিয়ে তালা লাগায়। অশ্কা কোনো কোনোদিন দাঁড়িয়ে থাকে। বিজয় বলে, 'আয় তোকে নামাই দিয়ে যাই।' অশ্কা বলে, 'কাকু, ইখানকেই থাকি।'

'কেনে রে?' বিজয় গাড়িতে ওঠে। 'আজ থাক। আট্টু ডাগর হ, তবে থাইকব্যি। তুই থাইকল্যে আমারও নিশ্চিন্দি, ওঠ।'

দোকান থেকে অশ্কার ঘর ত কাছেই। এক লহমায় রাস্তা ফুরিয়ে যায়। এত রাতে বাউরিপাড়ায় দু-চারজন মাতাল ছাড়া কে আর জাগে? অশ্কা মাটির দেওয়ালের কপাটবিহীন দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকে।

লম্বা বিছানার দরজার দিকে জবা। মাঝখানে সুখী, ওপাশে ববিতা। সুখী জেগেই ছিল। কদিন ধরে জবার জ্বর। কাশি। সুখী ওকে আজ ডাকতারখানায় নিয়ে গিয়েছিল। রূপনারায়ণপুরে এখন ওষুধের দোকান বেড়েছে, ডাকতার বেড়েছে। বিশেষজ্ঞ ডাকতার আসেন নিয়ম করে সপ্তাহে সপ্তাহে। তা সেসকল কুড়ি পঁচিশ টাকা ভিজিটের ডাকতার। ওষুধের দোকানে বসেন বলে সেই ওষুধের দোকানেই ওষুধ কিনতে হয়। সব দোকান ত সুখী চেনে না। সব দোকান ত ধারে ওষুধ দেবে না। এতসব ভেবেচিন্তে সুখী মেয়ে নিয়ে

আরতির কাছে যায়। আরতি এবারে মিহিজাম হোমিও কলেজ থেকে ফাইনাল দিয়েছে। ওর আগে ডাবরমোড়ে প্রথম মহিলা হোমিওপ্যাথ মমতা মণ্ডল। মমতার ওষুধের দাম বেশি। আরতি ধারে ওষুধ দেয় বলে বাউরিপাড়ার মেয়েবউরা ওর কাছেই বেশি যায়। রাতে ভাত দিতে বারণ করেছে আরতি তাই জবাকে মুড়ি দেয় সুখী। ডাল দিয়ে মুড়ি সেনে তবু দুটি খায় ও। খেয়ে শোবার আগে এক পুরিয়া ওষুধ খায়। একটু আগে ওর লম্বা নিশ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দে সুখী বোঝে মেয়েটা ঘুমিয়েছে।

অশ্‌কার পায়ের শব্দে সুখী বলে, 'অশ্‌কা? এলি বেটা?' অশ্‌কা বলে, 'হুঁ।' ও বাইরে জালার জলে হাত-পা ধোয়, ঘরে ঢুকে বলে, 'আজ বাইরে শুব না।' গামছা পরে দোকানের জামা-প্যান্ট খোলে। গামছা পরেই ওগুলো ধুয়ে মেলে দেয় বাইরের কপাটবিহীন ঘরের দড়িতে। কোনা থেকে ওর বিছানার বান্ডিল নিয়ে একটু সরিয়ে কাঁথা-বালিশ পাতে। ববিতার স্বাস্থ্য ভাল তায় সারাদিনের পরিশ্রম। ঘুমলে তাকে ডেকেহেঁকে তোলা কঠিন। ভাইয়ের খসখস চলাফেরা আর টুকরো কথার আওয়াজে সে হঠাৎই যেন সেই গহীন ঘুমের অতল থেকে ভেসে ওঠে দু-এক পলকের সচেতনে—ঘুমজড়ানো গলায় বলে, 'মা ভাইকে খাবারট দে।'

দোকানে খানছয়েক রুটি তরকারি খেয়ে আসে অশ্‌কা। তবু বাড়িতে খাবার থাকলে তাকে খেতেই হয়। অশ্‌কা বিছানা পেতে জল খাচ্ছিল। গ্লাশটা নাবিয়ে বলে, 'ম্হুঁহুঁ—আজ আর খাতো লারব।'

'কেনে রে?' ববিতা যেন দুহাতে জল সরিয়ে ওঠে। কোমরের এখানে একখুঁট ওখানে একখুঁট গুঁজে শাড়িটা ঠিক করে। চুলগুলো ঝাপ'টি সরালো কপাল থেকে। বলে, 'ভাল খাবাব আচ্যে। আমিও খাই নাই।'

অশ্‌কা পেছনে দুহাত রেখে তারই ওপব ভর দিয়ে একটা পেছন লাফে বিছানা ছেড়ে মেঝেয় বসে পড়ে টাল খেয়ে। ববিতার ঘুম ছুটে যায় ভাইয়ের কাণ্ড দেখে। ও হাসে, 'দ্যাকো মা খাবার কতায় অশ্‌কা ক্যামুন লাফাইচ্যে!' সুখী শুয়ে শুয়ে ওদের দেখে। ফাটা কাচ লণ্ঠনটা উশকে দেয় ববিতা। আলো-আঁধারিতে ঘর ভরে ওঠে।

ববিতা খেতে দেয় ভাইকে। চারটে লুচি, দু-টুকরো মাংস, আলু ঝোল। একটা সন্দেশ, একটা রসগোল্লা। ছোট বাটিতে আধবাটি পায়েস। অশ্‌কা আঙুল দিয়ে পায়েস ঘাঁটে। একটা তেজপাতা আর এলাচের খোসা পায়। দিদিকে বলে, 'কুন ঘরে দিল্যেক খাবারট? চিপ্পস ব্যাটে—এট্টাও কিচিমিচি নাই।'

ববিতাব মুখখানা ম্লান হয়ে যায়। বলে, 'লীডারকাকুর ছেল্যার জনমোদিন—তাথেই।'

'সবটো খাব নাই ববিদি', অশ্‌কা বলে। 'দকানে খেইচ্যি—' ও একটা লুচির ওপরে একটু ঝোল আর এক টুকরো মাংস নেয়। 'তুই নিন্ যা—আর খাব নাই।'

খেতে খেতে ববিতা বলে, 'লীডারকাকু ভুটে ডাড়াইচ্যে। জিতলে অশ্‌কাকে চাকরি দিবেক।'

'তুর বাবুকেও ত দিলেক চাকরি।' সুখী ঈষৎ ব্যঙ্গে বলে। 'বাবু না মইরলে ঠিকেই দিথ।' ববিতা উত্তর দেয়।

'উয়ার বেটার বিয়া হব্যাক নাকি?' সুখী বলে।

'হঁ ত। ভুটের পরে হব্যাক।'

কাঁথার তলা থেকে সুখী বলে, 'ভাল শাড়ি লিবি। গাজি সিল্ক।'

'হঁ গ, দিছ্যে তুমাকে গাজি সিল্ক।' ববিতা মুখ ব্যাঁকায়।

'কেনে দিবেক নাই? তু উয়াদের পার্মেন্টি কামিন ব্যটে—তুকে দিবেক নাই ত টেম্পোরারি কামিনকে দিবেক?' অশ্‌কা বলে।

'ভাইয়ের কঠিন বুদ্‌ধি ব্যটে—' ববিতা হাসে। 'কামিন কি পার্মেন্টি হয়?' অশ্‌কা চিন্তায় পড়ে। তার বালকবুদ্ধিতে দোকানের এঁটো বাসন মাজা ত চাকরি—পরের বাড়ি বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ঘর ঝাঁট দেওয়াও চাকরি। আর চাকরিতেই টেম্পোরারি থাকে। চাকরিতেই ত 'পার্মেন্টি' থাকে। ও উঠে পড়ে। দিদির দিকে ভালে। দিদি কি জানে কাকে চাকরি বলে? মেয়াছেল্যা ত বেশি জানে না। তবু ও জিগ্যেস করে 'বিজয়কাকুর দকানে আমি পার্মেন্টি হব নাই? আমার চাকরিট চাকরি লয়?'

ববিতা ইশকুলে যায় নি। সরকারি ইশকুলে, বিনা বেতনের লেখাপড়ার জন্য একটি দিনও যায় নি সে। মায়ের আঁচল ধরে বাবুঘরে যেত ছুটোবেলিতে। হাতে হাতে বাসন ধুত, ঝাড়ু, দিত। আধো আধো বোলে বলত, 'পাত্ কইরত্যে যেছ্যি গঁ।' ভোটের ছবি দেখে পার্টি চেনে ও, যদিও ভোট দেবার বয়স হয় নি। কিন্তু প্রতিদিনের জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে তার এক অভিজ্ঞতার জগৎ ও মনন ক্রিয়াশীল থাকে। এই মনন কোনো অক্ষর কি লিপি দিয়ে তৈরি নয়—রক্তে বাহিত শুদ্ধতায় ক্রমাগত দিনযাপনের কঠিনতায় ক্রমনির্মিত আবেগহীন, আসক্তিহীন, নির্মম ব্যক্তিগত ইচ্ছানিরপেক্ষ এক মনন। অক্ষরজ্ঞানহীন এই মনন ত অনেক সময় কেতাবী মননের যুক্তিগ্রাহ্যতাও নাকচ করে দেয়। সেই মননের অভিজ্ঞতাকে এই প্রশ্নের কোনো সোজাসুজি উত্তর দেওয়া ওর পক্ষে সম্ভব হয় না। এই উপায়হীনতায় ও কাতরতায় তার রাগ হয়। মাকে বলে, 'ভাইটকে পঢ়ালিখা শিখালি না কেনে? এট্টা পাস দিল্যেই সিডুল কাস্টে উয়ার চাকরি হত্য। বাবুর কত সাধ ছিল্য উয়াকে পড়াবেক। দকানে দিলি কেনে তবে? বাগালিতে দিলি কেনে উয়াকে? তুই খাটিস, আমি খাটি তাথেই হত্য। এখনি কি পেট ভরে সারা বচ্ছর? তবু লীডারকাকুর ঘরকে পাট করি বল্যা জি আর-এর ফিরি গম পাই।'

সুখী বলে, 'ইটো কপালের লিখন ব্যটে।'

ববিতা এঁটো থালা বাটি তুলতে তুলতে বলে, 'লয় মা লয়। কপালের লিখন লয়। বাউরি ব্যটে তাই ভগমানের খাতায় নামটো উঠাই দিলেক। কামিন খাটি বাউরি বল্যে। কেনে বাউরির রক্ত কি আলেদা? কাট্যে দেখো ত? বাউরি ব্যাটি কিন্তুক চোর লই, খাট্যে খাই। চাকরি কি অমোনি হয় মা? ঘুষ দিথ্যে হয়। আমি বুজি দেখি নাই চাকরির জন্য কাকুকে টাকা লিথ্যে? লাও এখন জেবনভর ভাইটো দকানে এঁটো বাসন মাজুক শঙ্করার

পারা।' কথাটা বলেই ববিতা চুপ করে যায়। সুখীও কথাটি বলে না। শুধু অশ্‌কা ফিক করে হেসে বলে, 'শঙ্করা না মইরল্যো আমি চাষাঘরে মাইন্দারি কইরথুম।'

রেগে যাওয়াতে আর হঠাৎ করে শঙ্করার কথাটা বলে ফেলাতে ববিতা অত রাতেও থালাবাটি ধোয়। অশ্‌কা ওর পাশে বসে কুলকুচো করে। দিদির পিঠে মাথা দিয়ে গুঁতো মারে। ববিতা হাত তুলতেই এক ছুটে বিছানায় শুয়ে পড়ে অশ্‌কা।

আঠাশ

ভোটের ফল বেরয়

অনেকদিন পরে বিজয়ের দোকানের সামনে বেঞ্চে শ্যামপদকে বসে থাকতে দেখা যায়। বিজয় গুমটি দোকান ছেড়ে পাকা দোকানের মালিক হওয়ার পর থেকেই শ্যামপদ বিশেষ আসে না। নিজের বাড়ির সামনেই চেয়ার পেতে বসে থাকে। আজ কদিনই সে একটু উত্তেজিত—দিল্লিতে সরকার বদল হওয়ায় তার উত্তেজনার কারণটাও বোঝা যায়। প্রায় আধঘণ্টা সে নীরবে বসে আছে দেখে বিজয় অস্বস্তি বোধ করে। এ সময়টায় বিজয়ের দোকানের প্রাথমিক ভিড়টা কমে আসে অথচ পাশের মা অটো ওআর্কস আর রাজা অটোমোবাইলের ছেলেরা প্রায় সবাই ব্যস্ত। সেন্টু একফাঁকে অশ্‌কাকে হাঁক দেয়, 'ভাইপো—চা দেখি একটা।' ওর 'ভাইপো' ডাকটা এমন হালকা হয়ে ভেসে আসে যে সঙ্গে সঙ্গেই অশ্‌কা গরম জলে গ্লাশ ধুয়ে একটু বেশি চিনি দিয়ে চা নিয়ে আসে। সেন্টুদাকে ওর খুব ভাল লাগে, এত হাসে সবসময় যে দেখলেই মন ভাল হয়ে যায়। সেন্টু ফুলশার্ট পরে। হাতা কনুই পর্যন্ত গুটনো। খুব রোগা বলে ওর কোনো অস্বস্তি নেই, যা ওর বয়সি ছেলেদের থাকে আর সেটা বোঝা যায় শার্টের ওপরের দুটো বোতাম খোলা দেখে। ও কথা বলে এত জোরে যে দোকান গ্যারেজের মানুষজনরা ত বটেই, দোতলা বাড়ির চার ফ্ল্যাটের সবাই গলা শুনেই ওকে চিনে নিতে পারে।

চায়ে এক চুমুক দিয়েই 'আরে ব্বাস্ কী গরমরে!' বলে ও গ্লাশ নামিয়ে নেয় ঠোঁট থেকে। সে অবস্থাতেই বাঁ হাতের চেটো দিয়ে ঠোঁট দুটো আলগা মুছে নেয়। শ্যামাপদর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করে, 'কাকু, আপনার চেয়ার ঠিক হয়েছে?' শ্যামাপদ দুখানা স্টিলের চেয়ার ঝালাই করতে দিয়েছিল রাজা অটোমোবাইলের ফিরোজকে। সেন্টু আবার রঙ করে দিয়েছে—গাঢ় নীল রঙ। সেই চেয়ারের একখানাতেই শ্যামাপদ এতটা সময় বসে আছে কোনো খেয়াল না করেই। সেন্টুর কথায় চমকে উঠে বলে, 'কোন চেয়ার?'

'আরে যেটায় বসেছেন—আপনার চেয়ার।' লম্বা চুমুকে গ্লাশ অর্ধেক করে দেয় সেন্টু। শ্যামাপদ উঠে এপাশ ওপাশ ঘুরে চেয়ারটা দেখে। 'তা বেশ হইচ্যে—কত খরচ পইড়ল্যা?'

'সে আপনি যা হয় দেবেন—ওয়েল্ডিং, রঙ, তার ওপরে লেবর চার্জ।' শ্যামাপদর এতক্ষণের নীরবতায় বিজয় যেন স্বস্তি পাচ্ছিল না, এবারে জিগ্যেস করে, 'কাকা, লতুন গরমেন্টে কি জিনিশপত্তরের দাম কইমবে? এক পার্টি ত লয়।'

'কইমবেক ত বইলচ্যে, তবে কিনা বিশ্বেস করা কঠিন ব্যটে। সেন্টার ঝদি ঠিকমত দ্যায় তবেই হব্যাক।'

'সেন্টার দিলেই ত হল না, সেগুলো ঠিকমত কাজে লাগানো চাই—চোরে চোরে দেশটা ভরে গেল।' মা অটোর বরুণ বলে। একটু চুপ করে থাকে শ্যামাপদ, তারপর বলে, 'শালারা আসানসোলেই ডুবাই দিলেক।' কে কাকে ডোবাল বুঝতে না পেরে বিজয় একটা বিনীত হাসি দেয়। শ্যামাপদ আবারো বলে, 'ঝিঞ্চির মহল্লায় পাহারা বসাই দিলেক—উয়াতেই মুসলমান ভোটগুলান বরবাদ হল। এখন ইয়াদের লাঠিবাজির ঠ্যালায় জমিজিরেত রইবেক?'

'তাথেই জমিগুলান বেচ্যে দিলুম। জমিন ত লয় দুশমন, দুশমন।' বিজয বলে।

জমি কেনা নয, জমি বেচার জোরেই বিজয় পাল যেন শ্যামাপদর সমকক্ষ হয়ে উঠতে চায়, কী রকম যেন লতায়-পাতায় এক আত্মীয় সম্পর্ক আছে ওর শ্যামাপদর সঙ্গে যে আত্মীয়তার কোনো সুবিধা পাওয়া যায় না শুধুমাত্র আত্মীয়তার গর্বটুকু করবার স্বীকৃতি আদায়ের এক করুণ প্রচেষ্টা ছাড়া। কিন্তু শ্যামাপদর এককথায় বিজয় পাল আবার কেন্নোর মত গুটিয়ে যায়।

'তোর আর কছটাক জমি? ও রইলেই-বা কি গেলেই-বা কি? মুশকিল ত আমাদের।'

বিজয় উত্তর না দিয়ে দোকানে ঢুকে যায়। মনে মনে বলে, 'আপুনাদিগের মুশকিল লয়। আপুনাদিগের বুঝাপড়া আছে। জমি, দকান, টাকা আপুনার দেদার। দেদারই থাইকবেক—কংগিরেস হল্যাও থাইকবেক, বামফরনট্ হল্যাও থাইকবেক। মরণ ত গরিবেরই ব্যটে।'

শ্যামাপদ উঠে পড়ে, সেন্টুকে বলে, 'চিয়ার দুট্যা পাঠাই দিও।' এক পা গিয়ে নিজের মনেই বলে, 'শালারা ক্র্যাকার ফাটাইচ্যে! লে কলিআরির ডিনামাইই পাছিস, ফাটা! ফাটাই লে।'

'ডিনামাইট কলিআরির, আবির কি জগন্মাতা ভাণ্ডারের?'

কখন চিনু এসে দাঁড়িয়েছে কেউ লক্ষ্য করে নি। চিনুকে শ্যামাপদর পছন্দ করার কোনো কারণ নেই। যে ছেলে পড়ালিখ্যা না কর্যা বোমাবাজি করেছে, গুলি চালিয়েছে, একসময়ে, এই এ্যাতটুকুনি বয়সেই শ্যামাপদর মত মানুষজনের ভয়ের কারণও হয়েছে পনের ষোল বছর আগে, সে ছেলে জেলে না পচে যদি মদ খায়, মাতাল হয় এমনকি নিজের শ্রমের পয়সাতেই হয় তাকে পছন্দ না করার এগুলোই ত যথেষ্ট কারণ। শুধু তাই নয শ্যামাপদকে বেকায়দায় ফেলতেই যেন চিনুর এক উল্লাস থাকে। খুব নীরব থাকে তা। তবু কী করে যেন শ্যামাপদ ঠিক টের পায়। বাইরে তা বুঝতে না দিলে চিনুও টের পায়। আর তখনি খেলাটা জমে ওঠে। চিনু আবার বলে, 'আপনার ত কলিআরিতে

দোকান, তাই চুরিটুরির খবর রাখেন?'

'দকান আমব লয়। বিষ্টুপদর নামে লাইসেন—আর কলিআরির চুরির খবর কুন গোপন কথা লয়, সকলেই জানে।'

'আচ্ছা আপনার ত অনেক জমি—এত জমি করলেন কী করে? রাখেনই-বা কী করে?'

শ্যামাপদ রাগে না। সস্নেহে বলে, 'জমি জিরেতের কতা তুমি কী বুঝবে বাবা। আমাদিগেব হল গো বংশ পরম্পরাব জমি—লুককে ঠকায়ে ভয় দেখায় জমি করি নাই।'

'আবে তুমি হঠাৎ জমির হিশেব নিচ্ছ কেন?' তপন নন্দী একটা মোড়ায় বসে চা খাচ্ছিল। ন্যাডা মাথায় একটা কাউন্টি ক্যাপে তাকে বেমানান লাগে।

'চুবি কোথায় নেই বলো? কলিআবি ত লুটেপুটেই গেল। রাতে চুরি করে গরিব লোক—ধরা পড়লে মার খায়, জেল হয়, ফাইন হয়। সে আর কতটুকু চুরি? দিনে চুরি করি আমবা—কাঁটাব ওজনে। দিন দুপুরে মাল হাপিস হয় না ফ্যাকট্রির? ওয়াগান ভাঙে না? কেবলস্ এ চুরি হয় না? সব সব শালা চোর। যাকগে মরুক গে মেজাজটাই খাবাপ।' বরুণ তপনেব স্কুটারের পাশে ঝুঁকে দেখছিল ওভাবেই শরীব ঝুঁকিয়ে বলে, 'কী হল আবার?'

'আব কী হল, লবিটা অ্যাকসিডেন্ট করেছে। দুটো স্পট ডেড। যতসব ঝুট ঝামেলা!'

বরুণ বলে, 'কয়েল চেঞ্জ করতে হবে আপনার।'

তপন নন্দী, 'ধুশশ্।' বলার সঙ্গে সঙ্গে চিনু একা একাই হো হো করে হেসে ওঠে।

এসবেব মাঝে অশ্কা কাপ, গ্লাশ কুড়িয়ে জড়ো করে। ধোয়। জল আনে। কয়লা ভাঙে। ভোটের খবব সেও শুনেছে। তার ত ভোট নেই। মায়ের ভোট আছে। মা ভোট দিল। পাবিদিদির ভোট আছে। শাটিদিদির ভোট আছে ত উয়ারা আলতা পায়ে দিল, চুল বাঁইদল, কাজল দিল চখে, ফিতা দিল চুলে, তা বাদে ভোট দিথ্যে গেল। ববিতার ভোটে নাম ওঠে নি। জবা আর অশ্কারও না। তবে বনমালীর নাম নাকি ভোটের কাগজে আছে। তা সেই ভোটটা যদি অশ্কাকে দিতে দিত ভোটের বাবুরা ত অশক ভোট দিত। দিল্লিতে গরমেন্ট বেনা করাত। কইলকাতায় গরমেন্ট বেনা করাত। হায় কবে যে ভোটের কাগজে ওর নাম উঠবে—'অশককুমার বাউবি'।

ঊনতিরিশ

অশ্কার খিদে ও ধূমপান

আজকাল মাইনের টাকা অশ্কাকেই দেয় বিজয়। টাকাটা মায়ের হাতে দেবার সময় ও মায়ের মাথা ছাড়িয়ে গেছে এখন, মায়ের কাঁধের ওপর দিয়ে একটু নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সুখী টাকাটা নেয়, ছেলের আনমনা মুখের দিকে একটু তাকায়, আঁচলের

গেরো খোলে, নয়ত হাঁড়ির ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটা পঞ্চাশ পয়সা তুলে আনে। 'লে নুনা।'

এবারে সুখী বলে, 'পাঁচ টাকাপয়সা কম কেনে?' 'কাপ ডিশ ভেঙ্গ্যে ছিলুম তাথেই।' বলেই অশ্‌কা মায়ের সামনে থেকে সরে যায়। কথা বলতে শিখলেই ত অসত্য ভাষণ শিখতে হয়, এমনই এক জীবন ওদের। এই অনৃতভাষণ তাই এত স্বাভাবিক। বেঁচে থাকার জন্যই এত প্রয়োজনীয়। বাবুদের মত অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয় মিথ্যাভাষণের বিলাসিতাটুকুও, যাতে পয়সা খরচ হয় না একেবারেই, করবার অধিকার এদের থাকে না। কিন্তু অশ্‌কাকে ত তার মায়েব কাছে মিথ্যা বলতে হয় নি। তেমন দরকার হয় নি বলেই হয়ত। তাই আজ মায়ের কাছে প্রথম মিথ্যাবাক্যটি বলে তার কেমন ভয় হয়। সে জামা-প্যান্ট ছাড়ে না, জবার কাছেও যায় না। নীরবে বেরিয়ে আসে। আজ এবেলা ওর ছুটি। দুটো দোকান বন্ধ করেই বিজয় গেছে গোপালপুর। দীনবন্ধুর পা ভেঙেছে, এই নার্সিং হোমে দেয় নি ওকে, কে জানে শঙ্করার কথা মনে ছিল কিনা—'ই ডাকতোরট হাড়ের ডাকতর লয়, গোপালপুরের রায় ডাকতর সিরেফ হাড়েরই ডাকতর'—এই বলে সে ছেলেকে নিয়ে চলে যায় একটা ভাড়া করা অ্যাম্বাসেডার চেপে। সকালে মুড়ি ঘুগনি খাবার পর অশ্‌কার আজ ভাত জোটে নি। বাড়িতে আজ শুধু শাকভাত হয়েছে। অশ্‌কা খেলে সুখীর ভাগে কম পড়বে কি জুটবে না। তাছাড়া অনেকদিন থেকেই ওর দুটো ইচ্ছে, সে দুটো আজই মেটানো যাবে এমন একটা ভাবনাও ওর মাথায় খেলে।

পাঁচ টাকার নোট পকেটে আর পেটে খিদে নিয়ে ও ডাবরমোড়ে আসে। একটু ইতস্তত করে ও রাজা মিস্টান্ন ভাণ্ডারে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে। এ সময় বসে খাওয়ার খদ্দের বিশেষ থাকে না। একটা টেবিলের দুধারে দুজন। কাউন্টারে তিনজন। ওর বয়সি এক ছোকরা ফ্রিজ খুলে একটা বড় দইয়ের ভাঁড় নামিয়ে রাখে কাচের শো-কেসের ওপর। আর একটা ছেলে কাগজের বাক্সে কালাকাঁদ ভরে ছুরি দিয়ে ট্রে থেকে তুলে তুলে। মিস্টির দোকান দিয়ে কেমন একটা গন্ধ বেরয়। ভাত-রুটি-তরকারির হোটেলের থেকে আলাদা একটা গন্ধ। বিজয় পালের দোকানের গন্ধও আলাদা। যেন প্রত্যেক মানুষের শরীরের নিজস্ব গন্ধের মত প্রত্যেক দোকানেরও আলাদা আলাদা গন্ধ। অশ্‌কা নাক টেনে নতুন, একেবারে আলাদা এক অচেনা গন্ধ শোঁকে। দোকানটা বেশ সাজানো। লাইনের ওপারে যদুর দোকানের মত কোনো প্রাচীন গন্ধ নেই এই দোকানে। দেয়ালে কালীঠাকুরের ছবি। ননীচোরা গোপালের ছবির নিচে শ্রীদেবীর ব্লোআপ একটা। 'কী দিব?' সরু ঘাড় অবদি চুল, গলায় স্টীলের চেন ছেলেটা কাঁধের গামছায় হাত মুছতে মুছতে জিগ্যেস করে। অশ্‌কা একটু থতমত খায়। সে ত এতদিন তার এই বয়সের বেশ কয়েকটা বছর এই প্রশ্ন করতেই অভ্যস্ত। ওর অস্বস্তি বোধ হয়। চেয়ারে বসা খদ্দেরের ভূমিকায় নিজেকে মানানসই করে তুলতে সে গম্ভীর হয়ে যায়। 'গরম কী আচে?' ওর গলার আওয়াজটা সরু মোটা ভাঙা ভাঙা এখন।

'এত বেলায় গরম কিচু নাই। সিঙাড়া আছে। গরম হবে না।'

'দুট্যা সিঙাড়া আর পঞ্চাশ পয়সার দুট্যা চমচম দাও।'

সিঙাড়া আর মিস্টি দুটো অনেকক্ষণ ধরে খায় অশ্‌কা যেন ফুরিয়ে যাবে এমন ভয়ে ভয়ে। কিন্তু তাহলেও একসময় ফুরিয়ে যায় তা। পরপর দুগ্লাশ ভরতি জল খায় ও। পয়সা মিটিয়ে বাকি তিন টাকা পকেটে পোরে। গুমটি দোকান থেকে মিষ্টি পান কেনে একটা, দুটো সিগারেট আর একটা দেশলাই—দীপিকা মার্কা। দেশলাইটা নিয়ে ও টিভি-র সীতাকে চিনতে পারে। রাস্তা পেরিয়ে বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে অনভ্যস্ত হাতে প্রথম সিগারেটটি ধরায়। বারকতক কাশার পর সে এমন টান দেয় আর নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে যে নিজেই অবাক হয়ে যায়।

এখন ওর কাছে দু-টাকাপয়সাও নেই। এ দিয়ে সিনেমা ত দেখা যাবেই না, ভিডিও পার্লারেও যাওয়া যাবে না। ও ভাবল স্টেশনে ওভারব্রীজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় সিগারেটটা খাবে।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম খুব লম্বা। ওপাশের প্ল্যাটফর্মে একটা প্ল্যাটফর্মের থেকেও লম্বা ময়লামত পুরনো চেহারার ট্রেন দাঁড়িয়ে। তার ইঞ্জিন থেকে কালো ধোঁয়া ওঠে। ওপর থেকে দেখবে বলে অশ্‌কা মাথা নিচু করে এক ছুটে ওভারব্রীজের ওপরে ওঠে। হাঁফায়। নিচে তাকিয়ে দেখল হুইশেলের সাথে সাথে সমস্ত কামরাগুলো দুলে উঠল। অশ্‌কা এখনো ট্রেনে চাপে নি।

ট্রেনটা দূরে ছোট হতে হতে মিলিয়ে যায়। অশ্‌কা সিঁড়িতে বসে। পকেট থেকে সিগারেটটা বার করে। একটু দুমড়ে গিয়েছিল বলে দুহাতের চেটো দিয়ে প্লেন করে। সিগারেট ধরায়। ওর খিদে পায়। খিদে মিটবে না জেনেও জোরে জোবে টান দেয়। হাতে ছ্যাঁকা লাগলে টুকরোটা ফেলে দেয়। মুখটা তেতো হয়ে গেল ওর। কিছুক্ষণ বসে থাকে হাঁটুতে মুখ গুঁজে। খিদেটা ছাগলছানার মত পেটে গুঁতো মারতে মারতে একসময় ঝিমিয়ে যায়। ও নেমে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে উপুড় হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুমের মধ্যে অশ্‌কার চোখের পাতা দুটি নড়ে। চোখের মণিও নড়ে। আর তাতেই বোঝা যায় পেট ভরতি খিদে নিয়ে ও এখন স্বপ্ন দেখছে।

তিরিশ

"সুখ সপ্‌নে। শান্তি শ্মশানে"

দুটো নাগাদ অশ্‌কার ঝাড়া হাত-পা। এক-দেড়ঘণ্টা সে যা খুশি করতে পারে। দীনবন্ধু আজকাল স্কুল থেকে বাড়ি যায় না। বিকেল পর্যন্ত বিজয়ের দোকানেই থাকে। দোতলা বাড়ির ওপরের এক ফ্ল্যাটের ভাড়াটের বউ রিক্তার কাছে পড়তে যায়। কলে জল থাকলে বিজয় ওকে চান করিয়ে দেয়। কলে জল না থাকলে অশ্‌কা ইঁদারা থেকে জল তুলে দেয়। সপ্তাহে পাঁচদিন করে মাসে কুড়িদিনে পঞ্চাশ টাকা নেয় রিক্তা। সন্ধ্যাবেলা

আরো এক পঞ্চাশ টাকা মাস মাইনের কাছে পড়ে দীনবন্ধু। বিজয়ের বউ সরলা বলে, আপার কেজিতেই যদি দুট্যা মাস্টার দাও আরো পইড়বেক না য্যাখন ত্যাখন কটি মাস্টার রাইখবেক শুনি? ইশকুলের মিসরা কী শিখায় তালে? বউ-এর এই সহজ গাণিতিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না বিজয়। কিলোর দাম জানলে সে আড়াইশ-তিনশ আলু, আটা, চাল, তেল এসবের দাম পলকে বলতে পারে। এমনকি আশি টাকা কিলোর পোস্ত যখন 'পঞ্চাশ পয়সার পস্ত দাও গ'র মাপে স্রেফ হাতের আন্দাজে দিতে হয়, বাটখারার ওজনে নয়, সেই হিশেবটা তার নির্ভুল থাকে প্রতিবার—সেটাও সে পারে। কিন্তু এই সরল প্রশ্নের উত্তর তার জানা নেই বলেই বোধহয় বউকে ধমকাতে হয়—, 'তুমি চুপ কর‍্যা থাকো। মেয়্যাছিল্যা, পড়ালিখার কী জানো?'

দীনবন্ধুর পেছন পেছন স্যাচেল কাঁধে দোতলার দবজা পর্যন্ত যায় অশকা। রিক্তা ওকে দুটো দশ পয়সা দিয়ে বলে, 'একটা মিষ্টি পান নিয়ে আয় ত।'

পান দিয়ে দুটো সিঁড়ি টপকাতে টপকাতে নামে অশ্‌কা। যেন ওর অনেকখানি সময় বাজে খরচ হয়ে গেল।

'ইঃ! ব্যাগটোও লিথ্যে লাইরব্যে! ডেরি হই গ্যালো কততি!

তা দেরি ত হলই। এখন ত ওর গাড়ি দেখার সময়। শুধু চোখ দিয়ে নয়, সর্বাঙ্গ দিয়ে দেখা। অন্ধের মত ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখা। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখা। প্রবল ইন্দ্রিয়জ দেখা। বাসন মাজতে আর মন লাগে না ওর। দোকান ঝাঁট দিতে ভাল লাগে না। ময়দা ঠেশতে, তরকারি বেনা করতে কি মশলা বাটতে ভাল লাগে না। ভাল লাগে না। ভাল লাগে না। না। না। না। এক্কেরে ভাল্লাগে না।

সারা দিনে ত এইটুকুই সময় ওর। নিজের মত সময়। নিজেব মত করে খরচ করার সময়। তাও এইটুকু সেই সময়ের এক মুহূর্তও ও অন্যর জন্য দিতে পারে না। এই নিজের মত করে পাওয়া সময়টুকু নিয়ে ও দোকানঘরগুলোর সামনের টানাবারান্দা নয়ত সামনে খোলা জায়গাটায় ঘুরঘুর করে। একটা না একটা গাড়ি ত থাকেই। বেশিও থাকে। টু হুইলার ওকে টানে না। ওর চোখ জিপ, ট্যাক্সি বা ডাম্পার নয়ত ট্রাকের ওপর। এখানে অবশ্য গাড়ির বডি বিল্ডিং হয় না। সেটা হয় পাঁচিলের ওধারে—চিনু সমীরের গ্যারেজে। আগে ইয়াসিন ছিল ওখানে, এখন ফিরোজের সঙ্গে এখানেই কাজ করে।

অশ্‌কা নিজের হাত দুখানা প্রসারিত করে চোখের সামনে তোলে। এই হাতে সে কি গাড়ি সারাবে না? বনেট খুলে গরম ইঞ্জিন ঠাণ্ডা করার জন্য জল দেবে—কলের জল, ইঁদারার জল। তাব ভারি বয়ে গেছে দীনবন্ধুর চানের জল আনতে—গাড়িগুলো কত দূর দূর যায়। কত দৌড়য়, কততি গরম হয় উয়াদের বডিগুলান। কততি ধুলা লাগে। অশকা সব মুছে দেবে। কলের মুখে পাইপ লাগিয়ে সব ধুলাকাদা সাফ করে দেবে। মা জানে না আজকাল ও পঁচিশ পয়সা, পঞ্চাশ পয়সা 'বশকিশ' পায়। একটা কৌটোতে পয়সা জমাচ্ছে ও। বেশি হয় নি। রোজ ত পায় না। পাচ্ছে তাও ত বেশিদিন না। তাও তেমন করে জমা হয় না। পারি আজকাল মাঝে মাঝে আসে। ওর ছেলে মিঠুনটা খালি বলে,

'বিশকুট দে মামা, চপ দে, আমি কুটুম ব্যাটি। লজেন দে বুনকে দিব।' ফলে এখনো পুরো পাঁচটি টাকাও জমে নি ওর। কবে হবে দেদার টাকা?

আজ শুধুই একটা শাদারঙের অ্যাম্বাসেডার দোকানের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। অশ্‌কা গাড়িটার পাশে এসে দাঁড়ায়। ধুলোর আস্তরণের জন্য শাদা রঙটা একটু ঘোলাটে দেখায়। গাড়ির গায়ে ধুলোর ওপর আঙুল দিয়ে ও নিজের নামটি লেখে—'অশোক কুমার বাউরি।' শ্লেটে লেখার মতই নামটি ফুটে ওঠে ক্ষণিকের মায়ায়। নিজের নামটির ওপরে ওর মায়াময় দৃষ্টি থাকে কয়েক পলক, তারপরই সে দৃষ্টি স্থির হয় স্টিয়ারিং-এর ওপর। ড্রাইভারের জানলার কাচ নামানো—সেখান দিয়ে ও হাত চালিয়ে স্টিয়ারিং ছোঁয়। শক্ত অথচ মসৃণ স্পর্শে ওর শরীর বেয়ে বিদ্যুৎ ছুটোছুটি করে। মাথা নিচু করে ওপাশের জানলা দিয়ে দেখল ফিরোজ আর সেন্টু এদিকে পিছন ফিরে গল্প করছে। বারান্দায় ইয়াসিন খুব মন দিয়ে একটা ব্যাটারি খুলছে। ও দরজা খুলে সিটে বসে। সিটের কভারের ওপরে হাত রাখে। অফ হোয়াইটের ওপরে চওড়া লাল স্ট্রাইপের নতুন কভার। স্টিয়ারিং-এ দুহাত রেখে ও বিড়বিড় করে, 'রোড দেখাইচেঁ না। কিন্তুক রোড আছে, রোড ধর্‌্যা যেছি—জি টি রোড। আসানসুল, কইলকাতা, দিল্লি, বম্বে যাবেক আমার গাড়ি।' তাহলে মেকানিক নয়, ড্রাইভার হবে 'অশক'।

পায়ের নিচে জুতোর সোলের মত কী যেন একটা। বাঁদিকে গীআর ও চেনে। গাড়ি খোলার চাবিটাও চেনে। ছোট ছোট লেখা গোল গোল জিনিশগুলোতে লাল কাঁটা আছে। লেখাগুলো পড়তে পারে না। ও ত ইংরেজি শেখে নি। কিন্তু লেখাটা যে 'ইংরাজি' তা জানে। ওর সামনে একটু পুতুল ঝুলে আছে। ও ওটাকে দুলিয়ে দেয়। বাবুঘরের মেয়্যাদের পারা জামাপরা পুতুলটা ওর, হাতের ঠ্যালায় দোলে। আপাতত এটাই ও ইচ্ছেমত দোলাতে পারে।

'কী মোবিল দিয়েছিলে হে? আওয়াজে কান ফাটে!' ও চমকে নেমে পড়ে লোকটার গলার আওয়াজে। লম্বা চওড়া লোকটাকে স্কুটার ঠেলে আসতে দেখে ফিরোজ চেঁচিয়ে বলে, 'বরুণ তোমার বালতিটা দাও ত।' গলা নামিয়ে বলে, 'শালার গলায় মোবিল ঢেলেছে কে?' লোকটা স্কুটার স্ট্যান্ড করিয়ে মোড়া টেনে বারান্দায় বসে। 'এক লিটার কেরোসিন মেশাবে। বেশ করে ঘষে ঘষে আগে বডিটা সাফ করো।' একটা সিগারেট ধরিয়ে পা দুটো টান করে লোকটা ওদের কাজের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হাঁ করে অশ্‌কা তাকিয়ে দেখে ফিরোজের নতুন শাকরেদ সিকান্দার কেমন চটপট বালতির তরলে ন্যাকড়া ডুবিয়ে হালকা সবুজ রঙের স্কুটারের বডি সাফ করছে। ওর ইচ্ছে হল সিকান্দারের সাথে হাত লাগায় কিন্তু বিজয় পাল বকবে ভেবে ও সিকান্দারের দুখানা ব্যস্ত হাত আর শরীরের ক্ষিপ্রতাব দিকে তাকিয়ে থাকে।

'আরে এ্যাই অশ্‌কা, হাঁ কর্‌্যা ভাইল্‌চিস কী? দে বাপ্পাকে আটটা জিলাবি দে।'

জোর করে নিজেকে তুলে নেয় অশ্‌কা। সে যেন এই দৃশ্যের বাইরের কোন বস্তুকণা। আলগা কোনো ধুলোবালির মত পড়েছিল, বিজয় পালের এক হাঁকেই তাকে তার

জায়গায় যেতে হয়।

জিলিপি নিয়ে তার সাথে একটাও কথা বলে না বাপ্পা। বিজয়ের হাতে পয়সা দিয়ে চলে যায়। বাপ্পা এখন হাইস্কুলে পড়ে। অশ্‌কা ত ইশকুলে যায় না।

উনুনের ওপাশে দোকানের বাইরে একটা মাটির বড় গামলা বা চারির তিনভাগ মাটিতে পোঁতা। চারিভরতি জল। সেই জলে বাসন ধোওয়া। জল ত সকালে একবারই পরিষ্কার করা হয়। সারাটা দিন তেল ভাসা জলে বাসন ধোয় অশ্‌কা। জল কমে গেলে ওর ওপরেই নতুন জল ঢালা হয়।

জলে ন্যাতা ডুবিয়ে কাপ-প্লেট, গ্লাশ-চামচ ধুতে ধুতে অশকাব পা টনটনায়। কদিন আগে একহাঁড়ি ডাল নামাতে গিয়ে পায়ের ওপর হাঁড়িটা পড়ে। দুদিন ছুটি দিয়েছিল বিজয়। আজকাল মাইনে কাটে বলে সুখী ছেলেকে জোব করে পাঠায়। তবে সুখী এসে হাত-পা নেড়ে পঁচিশটা টাকা আদায় করেছিল। বলে, 'বাগালী ছাড়াই তুমার দকানকে দিলুম, রাঁদাবাড়ার কতা ছিল্য না ত এক ডেগ ডাল রাঁধা করালে, ছুটো ছিল্যা কি পারে? পাটো পুড়্যা গেল ত মহ্‌লম দাও? লয় পয়সা দাও কিনে লি। লীডার কাকুব ঘরকে দিলে রোডের কাজ দিথ্য—পার্মেন্টি। ই কীরম্‌ ব্যবহার তুমার?'

বিজয় বলে, 'ই বাজারে খাওয়ার খর্চাটো ধইরবে না অশ্‌কার মা? ছিল্যা যে দিনকে দিন গায়ে গতরে বাইড়চ্যে, খুরাকী বাইডচ্যে, তাবাদে পাঁচ টাকাপয়সা বেতন বাঢ়াই দিলুম সেসকল খিয়াল রয় না?'

তবু বিজয় টাকা দেয়। ইদানীং লোক পাওয়া মুশকিল। একে ত এই মাইনেতে কেউ কাজ করবে না তাছাড়া টাকা দিলেও দু-চার-ছ মাসেব বেশি কেউ টেকে না। আগে বাউরি মরদরা বলত বিটিছিল্যা বাবুঘরে কামিন খাটবে না ত এখন দ্যাখো ডিম ফুইটতেই মেয়্যাগুলান হটরপটর চইলল পাট কইরথে।

দোকানের কাজের ছেলেগুলো হাতে-পায়ে একটু বড় হলেই নানা ধান্দায় ছোটে। সবারই ধান্দা চাকরি। চাকরি না জুটলে বেলাইন। বেলাইন ত পাড়াই আছে মদের ঠেকে, জুয়োর ঠেকে। বেলাইনেরও কি শেষ আছে? বার্নপুর কি আসানসোলে বেলাইনের মাটি পাবে। তার চুরি, কারখানার মাল সরানো, ওয়াগান ভাঙা—এই বেলাইনে ঢুকলে বেরনো মুশকিল। বেলাইনে আরো আছে মদ—লাইসেন্স ছাড়া মদ। বিহার ত হাঁটা দূরত্বে। দুই রাজ্যের সীমান্ত এত কাছে থাকলে কত যে রাস্তা টাকা রোজগারের। কাঁচা পয়সা উপার্জনের আর সে টাকা দিয়ে যা খুশি তাই করার অনিয়ন্ত্রিত, সংযমহীন, বিশৃঙ্খল স্বাধীনতার তা বিজয় জানে। সমীরের কথাটোই ঠিক ব্যটে—'চুরি করেই যদি এক সন্ধ্যায় পাঁচ-সাতশ টাকা ফোকটে মেলে ত ফালতু মাসভর খাটবে কেন লোকে?' বিজয় ভাবে জান চল্যা যাবেক কুনদিন ঠিক নাই তবু শালো চুরির লাইনেই চইলবেক সব। অশ্‌কা ছোঁড়াটা সেদিকে ভাল। একটু আলাকুলা ব্যটে কিন্তুক এখনো পয়সাকড়ি চিনে না। উয়ার মাটো বদমাইশ। এতসব কথা ত অশ্‌কার মাকে বলে না বিজয়, দুটো দশ টাকার আর একটা পাঁচ টাকার নোট ওকে দেয়। বলে, 'লিজের

বেটার মত বকাঝকা করি উয়ার ভালর ঝন্যি। কাজ বাইড়লে শিক্ষেও হয়। এট্রা ছিল্যা মানুষ করা ত সোজা লয় অশ্‌কার মা। ছিল্যা হলগ্যে চারাগাছের পারা। জল দাও, সার দাও, বেড়া দাও, তবে ত ফল দিবেক। ইটাকাটো অ্যাডভান্স লয়, উয়াকে অসুদ কিন্যা দিও। বেতন বাঢ়াই দিব্য টুকুদু সবুর কর। পাকা দকানের খরচ দেদার।' যে কথাটা বিজয় কাউকে বলতে পারে না আর হজমও করতে পারে না সেই কথাটাই ওর মনে পাক খায়। গগন তিনমাস ধারে জিনিশ নেয়। টাকা চাইতে গেলে সে একই রকম ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'তুমার দকানের সাইমনে যে অ্যাজবেস্টস দিয়্যা দিলুম তার কি দাম নাই? আম্‌িই ববং তুমার কাছকে দুশ পঁচিশ টাকাপয়সা পাই তা তুমি গাঁ-ঘরের ব্যাটি উ টাকাটো ছেড়্যা দিছি।'

টাকাটা নিয়ে সুখী আঁচলে বাঁধে। যাবার আগে ছেলেকে বলে, 'দুষ্টামি করিসনে। কাকুর কতা শুইনবি।' অশ্‌কা হেসে ঘাড় কাত করে। বিজয় দোকানে কাউন্টারের পেছনে চলে যায়। নিতাই বলে, 'আজ আমিই ময়দা মাখছি তুই রেশ্‌ট নে।'

রেশ্‌ট? তার মানে অশ্‌কাকে এখন সেদ্ধ আলুর খোসা ছুলতে হবে না? ময়দা ত নিতাইদাই মাখছে! 'সমীরদার কাছকে যেছ্যি গঁ।' বলে ও একটু খুঁড়িয়ে ছোটে। সমীরের ঘরে উঁকি মেরে দেখে সমীর চৌকিতে উপুড় হয়ে ঘুমিয়ে আছে। বুকে বালিশ, ডান হাতে আর একটা বালিশ খামচে ধরা, বাঁ হাত ঝুলে আছে শূন্যে। এক পা প্রসারিত, এক পা গুটনো—যেন দৌড়তে দৌড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে। দড়িতে শার্ট প্যান্ট লুঙি পাজামা গামছা। অশ্‌কা বালতির ঢাকা খুলে মগ ডুবিয়ে তুলে আলগোছে জল খায়। সমীরের ঘরটা খুব ভাল লাগে ওর। একটা ছোট জানলা। জানলা দিয়ে গাছগাছালি দেখা যায়। ও বাইরে আসে। একটা এন পি মার্কা ট্রাক দাঁড়িয়ে। ট্রাকের পেছনে বাংলায় লেখা টা টা। আরো কী লেখা আছে ও পড়তে পারল না। ঘুরে সামনে যায়। একটা মোড়ায় বসে চিনু খবরের কাগজ পড়ছিল। অশ্‌কাকে দেখে বলে, 'কিরে এখানে কি করছিস?' উত্তরে অশ্‌কা আঙুল তুলে ড্রাইভারের কেবিনের গায়ে দেখায়—'চিনুদা উখানকে কী লিখা আছে? সুক সপওনে শান্‌তি কী উটো?'

রোজ এত গাড়ি আসে যে এরা খেয়াল করে না। ডাকতার যেমন রোগীর হৃদপিণ্ডের শব্দ, ফুসফুসে রক্তশোধন, লিভার, প্লীহা, পাকস্থলী এইসবের সুস্থতা অসুস্থতাই পরীক্ষা করে নিস্পৃহ মনোযোগে, রোগীর ভ্রূপল্লবে কী লেখা আছে খেয়াল করে না এরাও তেমনি স্টার্টার, গীয়ার, কারবুরেটর, ব্রেক, অ্যাক্সিলেটর এসবই দেখে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে, গাড়ির গায়ে কী লেখা আছে তা লক্ষ্য করে না।

অশ্‌কাব কথায় চিনু কাগজ থেকে চোখ তুলে অবহেলায় তাকায়। আর তারপরেই হো হো করে হেসে ওঠে, 'জব্বর লিখেছে ত—সুখ স্বপ্‌নে, শান্তি শ্মশানে! খাঁটি কথা! শ্মশান ছাড়া শান্তি নেই, স্বপ্ন ছাড়া সুখ নেই। বাহ্‌ বাহ্‌!'

সেদিন রাতে নির্মেঘ আকাশের নীচে অশ্‌কা খাটিয়াটা পাতে। ববিতা বলে, 'ঘরে শু, তর শরীলটো ঠিক নাই!'

অশ্‌কা তার নিজস্ব মায়াবী হাসিটি হাসে। তার মুখখানাই হাসি হাসি। ঠোটের দুপ্রান্ত ঈষৎ বঙ্কিম, যেন ঢেউ তোলা, ফলে মুখ টিপে থাকলে মায়াবী হাসি ফোটে। চোখের করুণ মায়াময়তা সেই হাসিতে অন্য এক অলৌকিকতা পায়। তেমনি হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলে, 'সপন্ দেইখব ববিদি। সুখ আছে সে সপনে!'

'কী?' ববিতা চোখ বড় বড় করে বলে, 'সুক? সুক ত আমাদিগের কপালে লিখা নাই, ত সিনমায় আচে, দেদার সুক, তাই দেইখবি?'

'ধুর, সিনমার সুক লয়, টেরাকে লিখা আছে, চিনুদা বইল্লেক, আর যা লিখা থাকে তা সত্যি।'

তা সেই সত্যি সুখের আশায় অশ্‌কা চিৎ হয়ে শোয়। শরীরটা টসটসে হয়ে আছে বলেই হয়ত গা শিরশির করে ওর। চাদরটা বুক পর্যন্ত টেনে দেয়। বর্ষা শেষের আকাশ ঝকঝক করে তারার আলোয়। সেই আকাশভরা তারার নিচে একটি মলিন শয্যা ও তাতে এক বাউরি বালক নির্নিমেষ—আকাশপানে ভালে। উত্তরের ধ্রুব আর তাকে ঘিরে প্রদক্ষিণরত সপ্তর্ষি দূরে ক্রম অদৃশ্য ছায়াপথ, নীহারিকা জানা অজানা কত সহস্র নক্ষত্রের, চোখ যেন বালকের চোখে প্রতিফলন পায়। সেই প্রতিফলনে এই বালকের কোনো বিপুল বিস্ময় জাগে না—যে বিস্ময়ের বিস্তারে অনির্বচনীয় বিশ্বরহস্যের অনুভব আসে, ও যেন দুই চোখের মণির প্রতিফলনে দেখে আকাশ জুড়ে অসংখ্য গাড়ির আলো। ওর মনে হয় কেউ একজন 'ইসটার্ট' বইললেই সবগুল্যান গাড়ি চইলবেক। এই কাল্পনিক গতির অনুভবে ওর ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, ওর দশ আঙুল আকাশে ওঠে যতটুকু আকাশ ওর দখলে রাখতে পাবে। সেই শূন্যতায় কাল্পনিক স্টিয়ারিং ধরে ও ট্রাক চালায়—ভারী দূরপাল্লার ট্রাক। ট্রাক ছুটে চলে জি টি রোড ধরে ওর চেনাজানা শহর ছাড়িয়ে দূরে! আরো দূরে। আরো। আরো। ধীরে ধীরে ওর আঁখিপল্লব নত হয়। হাত দুখানা আড়াআড়ি বুকের ওপরে স্থিত হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি মন্থর হয়ে আসে। শুধু স্বপ্নে গতি থাকে। সেই গতিতে ও ওর দৈনন্দিন পেরিয়ে যায়। ওর নিরানন্দ দৈনন্দিন। অপমানের দৈনন্দিন। সেই স্বপ্নে আলো থাকে। সে আলোতে ওর নিত্যদিনের অন্ধকার আলোকিত হয়। সেই স্বপ্নে সুখ থাকে। সেই সুখে ওর নিত্যদিনের মলিনতা ঘুচে যায়। জাগরণে যা পারে না স্বপ্নে তা অনায়াসে পারা যায়—ওর প্রতিদিনের অপমান আর বঞ্চনার অন্ধকার অতিক্রম করে ও চলে যায় আকাশ মাটি জুড়ে থাকা এক আলোকিত স্বপ্নের ভেতর।

একত্রিশ

মৃত্যুকে শরীর দিই

জবা শুয়েছিল। গত পনের দিন একনাগাড়ে এভাবেই শুয়ে আছে ও। আর এই পনের দিনের শেষ সাতদিন অশ্‌কা কাজে যায় নি। বিজয় পাল ওকে ছাটাই করে দেবে জেনেও

যায় নি। ও কাজে যায় নি বলেই সুখী আর ববিতা কাজে যেতে পারে। সাময়িক ভাল হয়ে কলে জল আনা, ঘরদোর নিকনো কি কাপড় কাচা বাসন মাজার সামর্থ্যে পৌঁছে যাওয়া জবা এতদিন একটানা পড়ে থাকাতে সুখী বলে, 'দু-টাইম হমিপাথি দেখা করালুম ত দু-টাইমই ঘুর‍্যা জ্বরে পইড়লি। ইবারে ঝাড়া করাব।'

'সেনগুপ্তর কাছকে দেখা করাও।' ববিতা বলে।

'অতটি টাকাপয়সা কে দিবেক? তাবাদে ধরো ওষুদ, তাবাদে সুঁই। জোবার ডর লাগে।' ববিতা উত্তর দেয় না। মা না বললেও সে জানে জবার জন্য সুখী আর টাকা খরচা করবে না। সেই-বা কী করবে? তার বিয়ের সম্বন্ধ আসছে। তাতেও ত টাকা লাগবে। ভাইটার হয়ত জবাব হয়ে যাবে। কিছু ভেবে না পেয়ে ও ওর এক বাড়ির শাড়ি ব্লাউজ শায়া বোনকে দিয়ে দেয়। বলে, 'ভাল হয়্যা ঝাবি। এই লথুন শাড়ি বেলাউজ পর‍্যা ঠাকুর দেইখবি।' নতুন শাড়িজামা দেখে জবার সমস্ত মুখ আলোয় ভরে যায়। ও দুহাতে প্যাকেটটা নেয়। ববিতা ভেতর থেকে কাপড়জামা বের করে দিলে ও দুহাতে তুলে ধরে তা। লাল হলুদ সবুজের শাড়ি জামা শায়ার ওপর সকালের আলো পড়ে। সেই আলোক রশ্মির রেখাগুলি জবার শরীরে পড়ে। আলোকিত হয়ে যায় ওর শরীর, বিছানা ও মুখমণ্ডল। 'আড় কর‍্যা রাখ দিদি, আমি এট্টু ঘুমাই।' ববিতা প্যাকেটটা তুলে রাখে।

সপ্তমীর দিন জবা ভাইকে বলে খাটিয়াটা বাইরে উঠনে বার করে দিতে। দুদিন আগে সুখী দেয়াসীর কাছ থেকে মাদুলি এনে মেয়ের হাতে বেঁধে দেয়। গুণিন এনে ঝাড়া করিয়েছে তার আগেই। গুণিন ঘরেই বন্ধন দিয়ে গেছে ঘরের তিনদিক ঘুরে চতুর্থ দিকটিতে পাশের ঘরের দেয়াল বলে সম্পূর্ণ ঘোরা যায় নি। কালীপুজো পর্যন্ত জবার বাইরে যাওয়া বারণ। শুধু পায়খানা পেচ্ছাপ ফিরতে ঘরের পেছনের খালি জায়গাটায় যেতে পারে সঙ্গে লোক নিয়ে। পেঁয়াজ-রসুন-মাছ-মাংস-ডিম-মশুরি আর কলাই সিজ্যা খাওয়া বারণ মাদুলির কারণে। এসব করার পর আজ সকালে মেয়ে একটু উঠে বসাতে সুখী স্বস্তি পায়।

নিজের খাটিয়াটাই অশ্‌কা বের করে। নিজের শিথানটিই দেয়। কাঁথা দেয়। জবাকে দুহাতের বেড়ে তুলতে গিয়ে এক মুহূর্ত থমকায়। 'দিদিরে গুণিনের মানা আচে যে।' 'উ গুণিন কি ঝানে আমার মরণ কবে হব্যাক? আমি বাইরে ঝাব রে ভাই। ঢাকের বাজনা শুইনব। মাইকের গান শুইনব।'

আকাশের নিচে জবা শুয়ে থাকে। তার শরীর দিয়ে যেন মৃত্যুর গন্ধ বেরয়। সকালের রোদও সেই গন্ধ দূর করতে পারে না। ঢাকের বাজনা আজকাল তেমন শোনা যায় না কিন্তু রূপনারায়ণপুর গ্রামের দুর্গামণ্ডপে তিন ঢাকি এসেছে যেন কোথা থেকে সেই বাজনার আওয়াজ শোনা যায় মাইকের গান ছাপিয়ে।

বেশ কিছুক্ষণ দু-ভাইবোন কথা বলে না। একসময় অশ্‌কা বলে, 'আমি জল

আইনথে ঝাই দিদি?'

'হঁ, যা, এক ঘড়িতে আইসবি।'

কলসি-বালতি নিয়ে অশ্‌কা বেরিয়ে গেলে জবা একটু উঠতে চেষ্টা করে। আজ সপ্তমী তবু তার নতুন শাড়ি পরে ঠাকুর দেখা হল না। তার বয়সি মেয়েদের অনেকেরই বিয়ে হয়ে গেছে, তারা সব নতুন শাড়ি জামা আলতা সিঁদুরে সেজে কেমন ঠাকুর দেখতে যাবে সন্ধ্যাবেলায়। যাদের বিয়ে হয় নি তারা সেজেগুজে সকালবেলাতেই বেরিয়ে পড়েছে। ওর শাড়ির রঙটা ওর খুব পছন্দ। কেমন হলুদ জমিতে লাল ফুল সবুজ পাতা। লাল বেলাউজ। সবুজ শায়া। ওর নাকের পাথরটা লাল। কানেব পাথরটা লাল। হাতে লাল কাচের চুড়ি। লাল ফিতে আছে। লাল পেলাসটিকের জুতা আছে। আজ ওর ভাল লাগছে। কেমুন লীল দেখাইচেঁ আকাশটো। তুলার পারা মেঘ। নিশ্বাসে আজ আর কষ্ট নেই। মুখের তেতো ভাবটাও নেই। মাথাটা হালকা। হাত দুখানি মেলে দেখল কী শাদা করতল। বাহু দুটি শীর্ণ, শিরা দেখা যায়। 'মা মাদুলি আনা করাইচেঁ—গুণিন দিযা ঝাড়া করাইচেঁ তাথেই অমোন হালকা লাগে। কাল অষ্টমীতে ঝদি নাও পারি নবুমীর দিনকে ঠিকেই যাবো।' ও চোখ বোজে।

জল নিয়ে এসে অশ্‌কা দেখে শরতেব রোদে সারা শরীর ডুবিয়ে জবা ঘুমিয়ে আছে।

অষ্টমীর দিন রাতে জবা বলে, 'কাল আমি ভাল হঁই যাব মা।'

কিন্তু রাত শেষ হবার আগেই সে মাকে বলে, 'কত ঘুমাস মা? কপাটটো খুল? খুল কেনে, বাতাস পাছি না যে!'

তীব্র চিৎকারে সুখী ববিতা আর অশকাকে ডেকে তোলে। ববিতা আলো জ্বালে। সুখী মেঝেয় আর জবা খাটিয়ায় শুয়েছিল। অশ্‌কা বাবান্দায়। ববিতা ওদিকের ঘরে। 'ই ঘরে কপাট নাই ত খুইলব কী? ই দুয়ার দিয়্যা বাতাস ঢুক্যা ত উ দুয়ার দিয়্যা বারাই যায় আর উ বাতাস পাছে না? ববিতারে কী হব্যাক?'

জবার মাথায় হাত বুলিয়ে ববিতা বলে, 'ভাই জল আন, উয়ার বিকার হইচ্যে।'

রেতের বেলিতে কখুন এতটি জ্বর এল জবার? আঁচল ভিজিয়ে বোনের মুখ মাথা ভিজিয়ে দেয় ববিতা। কানের কাছে মুখ এনে বলে, 'কুথা কষ্ট হচ্যে বুন? কী কষ্ট বল?'

'কুনো কষ্ট নাই দিদি, কপাটটো খুল।'

'কপাট খুল্যা দিছি। জল খাবি?' জবা হাঁ করে। ছোট করে। ববিতা সন্তর্পণে গেলাশ কাত করে অল্প অল্প জল দেয়। তিন চার ঢোঁক খেয়ে ও ঠোঁট বন্ধ করে। ববিতা আঁচল দিয়ে ঠোঁট দুটি মুছিয়ে দেয়। অশ্‌কা বলে, 'নাসিং হোম যাই ববিদি?' সুখী এতক্ষণে কথা বলে, 'ঝা ডাকতর বাবুকে বল'... বাকি কথা আটকে যায় উঠে আসা কান্নায়।

ববিতা টের পায়, হাত দিয়ে দেখে জবার শরীরেব অস্বাভাবিক উষ্ণতা কমছে। আর সেই উষ্ণতা তরল স্রোতে ওর জামা, কাঁথা, বালিশ ভিজিয়ে দিচ্ছে। আর এত দ্রুত জবার

ছটফটানি থেমে যায় আরো নিঃসাড় হয়ে যেতে থাকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যে ববিতার ঘাড়ের নিচ থেকে এক হিমশীতলতা মেরুদণ্ড বেয়ে বিদ্যুৎ চমকে নেমে যায়। ও ভয়ার্ত গলায় বলে, 'মা কাকীকে ডাকো।' সুখী আলুথালু ঝুঁকে পড়ে জবার ওপর, 'জোবা? জোবারে? ভাল্ মা ইদিকপানে ভাল্। জোবা?' অশ্‌কা ছুটে বেরিয়ে যায়।

•

ভোরবেলা দিগন্তে ভাল করে আলো ফুটে ওঠার আগেই জবা খুব নীরবে, ধীরে ধীরে দিদির কোলে মারা যাচ্ছিল। খাটিয়া থেকে ওকে নামানো হলে ববিতা ওর মাথাটা কোলে তুলে নেয়। অশ্‌কা তখনো ফেরে নি। পাড়ার বউ-ঝিরা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে ছিল। ভাদু সুখীকে জড়িয়ে, বলে, 'ডাকতরবাবু ঘর গেছেন। উয়ারা পিঠাই কিয়ারীর ডাকতরবাবুর কাছকে গেল।' 'অ দিদি আমার জোবা বাঁইচবে ত?' কান্নার দমকে হেঁচকি উঠে যায় সুখীর। ববিতা আরো চোখ তুলে বলে, 'চিঁচাও কেনে?' জবার মরণ আসছিল ধীরে ধীরে। ভয়ে ভয়ে। অনধিকার প্রবেশকারীর মত। আর সে মরণ এত ধীরতার সঙ্গে সম্পন্ন হচ্ছিল যে যেন সে নিজেই নিজের জন্য এক শবযাত্রা রচনা করে। এক শোকগাথা রচনা করে। জবার চোখ দুটি স্থির ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়া ববিতার চোখে। ঠোঁটের প্রান্ত দুটি ভাইয়ের মত বঙ্কিম বলে মরণ শয্যাতেও হাসি ফুটে থাকে। যেন মৃত্যুকে ও শুধু শরীরই দিচ্ছে। শুধু শরীর—ওর রোগজীর্ণ শরীর। ওর আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, দুঃখ, ভালবাসা প্রতিদিনের নিয়ত বেঁচে থাকা কোনো কিছুই সে যেন এই অনভিপ্রেত আগন্তুককে দেবে না।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তরুণ ডাকতারবাবুটির স্কুটার সাড়ে ছটা নাগাদ আসে। তার একটু আগেই ঘনার সাইকেলের পেছনে বসে অশ্‌কা ফিরেছে। অশ্‌কা, সুখী, ববিতা, রসিক আর ভাদু ছাড়া জবার মরতে থাকা শরীর ঘিরে আর যারা ছিল তাদের সবাইকে বের করে দিয়ে জবার শান্ত, ঠাণ্ডা নিশ্চল হাতখানা তুলে প্রায় স্পন্দনহীন নাড়ি দেখেন ডাকতার। নিষ্ফল, তবু স্টেথো লাগান। ঘাড় না ঘুরিয়েই বলেন, 'জল আর চামচ।' ডাকতার ঘরে ঢুকতেই জবাব মাথাটা নামিয়ে দিয়েছিল ববিতা, ও-ই জল আর চামচ নিয়ে আসে। বাঁ হাতে জবার মাথাটা তুলে ধরে ববিতাকে জল দিতে বলেন ডাকতার। ববিতা মুখে আঁচলচাপা দিলে একটা গোঙানি বেরয়। সুখী ভাঙা গলায় বলে ওঠে, 'আমার ছিল্যাটা বাঁচাই দাও ডাকতরবাবু।' 'চুপ কর মা' অশ্‌কা চামচে করে জল তোলে। জবার ঈষৎ ফাঁক হওয়া ঠোঁটের ভেতরে, ডাকতারই কী এক কৌশলে ওই হাঁটুকু করিয়ে দেন, চামচে করে জল দেয় অশ্‌কা। দুবার। ও যেন দেখতে পায় দিদির গলার শিরায় দেখা যায় কি যায় না এমন স্পন্দন। সেই শেষ স্পন্দনটুকুও থেমে যায় ডাকতার হাত দিয়ে গলা বুক মালিশ করে জলটুকু, এই পৃথিবীর দেওয়া শেষতম গ্রহণটুকু জবার শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিলে।

জবার মাথাটা বালিশে নামিয়ে দিয়ে ডাকতার ওর স্থির হওয়া চোখ দুটি বুজিয়ে দেন। দু-চোখের কোল দিয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে জবার, যেন নিজেই নিজের

জন্য এক শোকযাত্রা সম্পূর্ণ করে এই অশ্রুপাতে।

ববিতার গোঙানিটা কান্না হয়ে যায়। সুধীর আর্ত চিৎকারে বাইরের মেয়েদের কান্নাও মিশে যায়।

অশ্‌কা কাঁদে না। সে ত বিশ্বাস করতে পারছে না যে এই শায়িত শরীর প্রাণহীন। আর বিশ্বাস হলেও ত সে কাঁদতে পারে না। সে ত তার বাপের কাটাছেঁড়া চাদরে বাঁধা শবের ওপর শৈশবের অমল অশ্রু ঢেলে দিয়েছে। সেই অশ্রুপতন ত এখন সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয় ও জানে না কিন্তু উঠে আসা কান্নাটাকে ও আবার উৎস মুখেই ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

বত্রিশ

বাবুর বাঁধে অশ্‌কা ও জবা

পুকুরের জলে হাঁটু অবদি ডুবিয়ে দাঁড়িয়েছিল অশ্‌কা। গোড়ালি অবদি কাদায় ঢুকে গেছে, পোকাগুলো কামড়াচ্ছে না এমনিই পা চুলকোচ্ছে ও বুঝতে পারে না। দূরে কোথাও মাইকে গান বাজছে, রাতের নিস্তব্ধতা ভাঙতে ভাঙতে সেই ধ্বনি এমনভাবে ছুটে আসে যে কানের পরদায় যখন কম্পন ওঠে, ধ্বনি প্রতিধ্বনির কম্পন তখন মনে হয় বুঝি কাছেই। পুকুরের ঠিক ওপারে যেমন তেমন করে বানানো একটা চিতা। সেই চিতাশয্যায় জবার কিশোরী শরীর ঘিরে আগুনের শিখা আর ধোঁয়া। কেউ কেউ মাঝে মাঝে লাঠি দিয়ে আগুন উশকে দেয়। একটু দূরে কয়েক জন বসে মাটির ভাঁড়ে মদ খায়।

অশ্‌কার চোখ শুকনো। জলেই দাঁড়িয়ে, তবু ওর মনে হয় একডোল জল পেলে ওর পিপাসা মেটে। অল্প জ্যোৎস্না আর তারার আলোয় পদ্মপাতাগুলো কালো দেখায়। ও ভেবেছিল পদ্ম তুলে চিতায় দেবে। বাবুঘরে কেউ মইরলে ফুল দেয়, মালা দেয়, ধূপ দেয়। জোবাদিদি মায়ের থানে ফুল দিথ্যে খুঁজ্যাছিল ত আমি দিথে লাইরলুম। এত বড় পুখরটিতে একটিও পদ্দ নাই? কেনে নাই? আজ নবমী ব্যটে তাথেই বাবুরা সব, সব ফুল উঠাই লিছে, ত একটি পদ্দও ঝদি পাথুম দিদির কাছকে দিথুম, উয়ার সাধটি পুন্‌নো হত।'

জবার মৃত্যু ত কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়, তবু তা শেষপর্যন্ত অপ্রত্যাশিতই হয়ে ওঠে তার এমন বিলম্বিত মৃত্যুতে। বনমালীর মরণে যেন জবার জীবন বাজি ছিল, তখনই ত জবার মরবার কথা। কিন্তু এই কটা বছর শুধু বেঁচে থেকে, শুধুমাত্র দিনের পর দিন বেঁচে থেকে সে বড় অপ্রস্তুত করে দিয়েছিল তার প্রত্যাশিত মরণকে। আর দিনের পর দিন বেঁচে থাকাই শেষপর্যন্ত দিনের পর দিন বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে দেয়। অন্তত কারো কারো জন্য। সেই আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার কাছে মৃত্যু বড় বেশি শারীরিক হয়ে ওঠে। যে মানুষ বাঁচার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত মরণের কাছে শুধু

শরীর সমর্পণে বাধ্য হয় মরণ ত শেষপর্যন্ত তার কাছে হেরে যায়। তাই বুঝি অশ্‌কা তার জিতে যাওয়া দিদির অগ্নিশয্যায় পদ্ম দিতে চায়। মরণজয়ী জীবনের জন্য বেঁচে থাকা জীবনের শেষ পুষ্পার্ঘ্য।

আজই অশ্‌কা জেনেছে বিজয় পালের দোকানে তাকে আর যেতে হবে না।

'এ্যাই অশ্‌কা, জল লিয়ে আয় এক কলসি।' একটু এগিয়ে হাতের কলসিটা জলে ডুবিয়ে দেয় অশ্‌কা।

ক্রমাগত শব্দে শূন্য কলসি পূর্ণ হয়ে ওঠে আর অশ্রুহীন নির্ণিমেষে দিদির পুড়তে থাকা শরীরটির দিকে তাকিয়ে থাকে অশ্‌কা।

তেত্রিশ

ট্র্যাফিক জ্যাম

বৃষ্টিতে রাস্তাটার গায়ে বহু পুরনো ক্ষতগুলো জেগে ওঠে। প্রতিবছরই এমনি। মার্চে সরকারি হিশেবনিকেশের ঠিক আগে পঞ্চায়েত আর পি ডাবলিউ ডি একযোগে যে যার ভাগের রাস্তা সারায়। রাস্তা সারানো মানে গর্তগুলো আলকাতরা মাখানো পাথরকুচি বা গিট্টি দিয়ে ভরাট করে রোড রোলার চালিয়ে দেওয়া। তাতে মাসদুয়েক রাস্তাটাকে বেশ সুশ্রী দেখায়। জোড়ের দাগগুলো বোঝা গেলেও বেশ ঝকঝকে লাগে কিছুদিন। কিন্তু বৃষ্টি হলে ত বটেই, বৃষ্টি না হলেও, রাস্তাটা ত দিনরাত ব্যস্ত থাকে—ভারী ভারী ট্রাক, লরি, ডাম্পার, অয়েল ট্যাঙ্কার আর বাসের যাতায়াতে—পাথরকুচি কদিন বাদেই সরে সবে গর্তগুলো বেরিয়ে পড়ে।

তেমনি একটা জল জমা গর্তে একটা ডাম্পার কাত হয়ে আটকে যায়। ঝুলে থাকা আর ছাদভরতি যাত্রীসমেত একটা পুরনো চেহারার বাস দাঁড়িয়ে যায় ডাম্পারটার পেছনে। মেয়েরা চেঁচিয়ে ওঠে বাসটা কাত হয়ে গেলে আর সঙ্গে সঙ্গেই ড্রাইভার ব্রেক কষে দেয়।

ডাম্পারের ড্রাইভার, খালাসি আর দোকানের ছেলেরা খানিক ঠেলাঠেলি করার পরেও ডাম্পার যেমন আটকে তেমনি আটকে থাকে। সামনের চাকা দুটোই গর্তে। সমীর দুটো লোহার রড নিয়ে আসে। খালাসিকে দেয় একটা। দুজনে দুটো চাকার তলায় রড দিয় ওঠাবার চেষ্টা করে। ড্রাইভার ইঞ্জিন চালু করে কিন্তু অবাধ্য ছেলের মত গাড়িটা নড়ে না—শুধু ইঞ্জিনের গোঁ গোঁ আওয়াজই শোনা যায়।

রাস্তার ওপারে সিমেন্টের দোকানের সামনে অনেকগুলো বোল্ডার ডাঁই করা। কিছু বোল্ডার ফেলা হয়েছে শ্যামাপদর বাড়ি আর রাস্তার মাঝখানের জমি ভরাট করতে। ঘনা একটা বোল্ডার তুলে গর্তটায় ফেললে ছলাৎ করে জল চলকায়। উৎসাহিত হয়ে আর একটা পাথর তুলতে গেলে শ্যামাপদ দেখে ফেলে। শ্যামাপদ ব্যাপারটা দূর থেকে দেখছিল—যেমন ও দেখে সকাল বিকেল নিজের চেয়ারটিতে বসে। সেন্টু সিমেন্টের

দোকানের সামনে পাতা বেঞ্চিতে পা তুলে বসে স্বদেশের সঙ্গে আড্ডা দেয়। স্বদেশ শ্যামাপদর নীচের তলার একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে "দুর্গাপুর সিমেন্ট—স্টকিস্ট"—লেখা সাইনবোর্ড টাঙিয়েছে। 'রোডটো যা হইচোঁ কোনদিন অ্যাক্সিডেন্ট হব্যাক' শ্যামাপদ এদের দিকে তাকিয়ে বলে। তার বলার ধরনে কোনো উত্তরের প্রত্যাশা ছিল না কিন্তু স্বদেশ বলে, 'আপনি উড়িষ্যা গেছেন কখনো? ফ্যানট্যাসটিক! ঘরের মেঝের মত রাস্তা! সেবার বাণীকে নিয়ে ভুবনেশ্বর, বাণী আমার ছোটবোন, পড়াশুনোয় ফ্যানট্যাসটিক—' এ পর্যন্ত বলা হতেই সেন্টু হঠাৎ 'স্বদেশ দাঁড়াও আসছি' বলে এক দৌড়ে জটলার মধ্যে মিশে যায়।

ঘনা আবার আসে। এবারে শ্যামাপদ চেয়ার থেকে উঠে পড়ে। ডান হাতের তর্জনী তোলে, যেন বন্দুকের নিশানায ঘনা এমন স্থাণুবৎ পাথরগুলোর মধ্যে ঈষৎ নত হয়ে প্রোথিত হয়ে যায়, যেমন পাথরের মধ্যে আর এক পাথর—'এ্যাই, এ্যাই হারামজাদা পাথরটো উঠাইচিঁস কেনে? রাখ্ রাখ্ উটো।'

ঘনা প্রস্তরবৎ নিশ্চল। পাথর থেকে হাতটুকু শুধু ওঠাতে পারে। আমতা আমতা করে বলে, 'আঁইজ্ঞা উনারা বইল্লেক...'

'রোডে পাথর দিয়্যা কী হব্যাক? আমার পাথর আমি দিব না—ব্যস।'

ঘনা শক্তিমান হলেও নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। যতটা শক্তি দিয়ে সে অবলীলায় ভারী পাথরটা তুলেছিল ততটা শক্তি নিয়েই ফ্রিল্যান্স মুনিষ খাটে। সে কারো বাঁধা মাহিন্দর কি মজুর মুনিষ নয়। যেদিন যেদিন কাজ পায়, তার হাজরির টাকা পায় সেদিন সে ভরপেট খাওয়ার ওপর কয়েক পাত্র মাড়ি অথবা পাকি মদ খায়। এত খায় যে পরের দিন ঘুম ভেঙে দেখে কাজের বেলা গড়িয়ে গেছে। এভাবেই তার যৌবনের দিনগুলি যায়। এভাবেই তার শক্তিময়তার দিনগুলি যায়। ঘনার বউ হলগে টিলি—আট বছর বয়স থেকেই সে নিজের শ্রমের পয়সায় শখ-আহ্লাদ বল শখ-আহ্লাদ, ভাত-কাপড বল ভাত-কাপড় জুটিয়ে আসছে। আগে ছিল নিজের এখন মাঝে মাঝে স্বামীরও। ঘনার বাড়ি বনজেমারি, সেখানে তার পার্মেন্টি কাজ নাই, তাই টিলির মা তাকে ঘরে নিয়ে আসে। বিয়ে হওয়া টিলি, এখনো মা না হওয়া টিলি হাত ঘুরিয়ে, মেলায় কেনা কাচের চুড়ি ঝমঝমিয়ে বলে, 'ভাত দেয় কি ভাতারে? ভাত দেয় গতরে।'

অশ্‌কা হাঁ করে দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল, দোকান মানে জগন্মাতা ভাণ্ডার। তার ব্যাগে দুকিলো চাল, আড়াইশ মসুর ডাল, পাঁচশ আলু, একশ পেঁয়াজ, এক টাকার পোস্ত আর এক টাকার জিরাগোলকী। পারি এসেছে তার ছেলেমেয়ে রেখা মিঠুনকে নিয়ে। সুখী ববিতা কেউই বাড়িতে না থাকায় উনুনে আগুন দিয়ে সেই ভাইকে দোকানে পাঠায়।

'টিলির বরটো ডরপুক ব্যটে।' টিলির বিয়েতে ওরা ভোজ খেয়েছিল। টিলির বাড়িতে লাইট আছে। একটা বাল্ব জ্বলে। গাঁয়ের কারো কারো বাড়িতে একটা করে ডুম জ্বলে। রাস্তা থেকে নাকি কারো বাড়ি থেকে এমন লাইন টানার পারমিশান পঞ্চায়েতই দেয়।

কেন দেয় তা অশকা জানে না। ওদের কেন দেয় নি এটাও যেমন জানে না। টিলির রেডিআ আছে। বাবুঘর থেকে দিয়েছে। সস্তোষা রেডিআ। টিলি একশ টাকায় সেটি সারিয়েছিল। ঘনা সেটাকে এত চালাত, এত শুনত যে সেটা আবার খাবাপ হয়েছে। 'আবারো একশ টাকাপয়সা লাইগবেক।'—টিলি বলে। রেডিওটাকে ও তাকে তুলে রেখেছে। মাটির হাঁড়ি আর প্লাস্টিকের কৌটোর পাশে।

ইতিমধ্যে আটকে পড়া ডাম্পাবেব এপাশে, ওপাশে গাড়ির পরে গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়—বিভিন্ন মডেলেব, বিভিন্ন রঙের ট্রাক, ট্যাক্সি, বাস, মিনি, ভ্যান। টু হুইলারগুলো কোনোরকমে গলে বেরিয়ে যায়। মিনি, মারুতি আর ট্যাক্সি, যেগুলো পরে আসে রূপনগরেব কাঁচা রাস্তা দিয়ে সীমান্ত পল্লিব ভেতব দিয়ে ডাবরমোড়ে ওঠে। ওদিক থেকেও কিছু গাড়ি এভাবে এদিকে আসে।

অশকা এক দৌড়ে ব্যাগটা বাড়িতে রেখে আসে। ডাম্পারটা ওঠাবার জন্য নাকি বিড্ডু আর মোহনকে খবর দিতে লোক গেছে। ডাম্পারটা বিড্ডুর। এবারে অশকার সঙ্গে পারির ছেলে মিঠুনও আসে।

ডাববমোড়ের দিক থেকে একটা তাগড়াই চেহাবার মুখ থ্যাবড়া ট্রাক আসে। অশকা পা উঁচু কবে দেখে নেয় গাড়িটা চালাচ্ছে মোহন। মোহন ট্রাকটাকে ডাম্পারের মুখোমুখি দাঁড় করায়। মোহন নামার আগেই উলটোদিকের দরজা খুলে বিড্ডু লাফিয়ে নামে। বিড্ডু আর মোহন দুজনেই রূপনাবায়ণপুরে জন্মেছে, লেখাপড়া শিখেছে, লেখাপড়া ছেড়েছে। এভাবেই দুজনের বয়স তেইশ-চব্বিশ হয়ে গেল। ওদের দুজনেরই বাবা-মায়েরা পাঞ্জাব থেকে কবে যেন এখানে এসে থিতু হয়ে গিয়েছিলেন। মোহনের চেহারাটি ছিপছিপে, উচ্চতা মাঝারি, রঙ শ্যামলা। ট্রিমড দাড়িগোঁফ আব ধাবালো নাকচোখ চিবুকে ড্রাইভার হিশেবে বেমানান লাগে। ড্রাইভাব মহলে ওর নাম অ্যাক্সিডেন্ট মাস্টার। শেষবারের ধাক্কায় ওকে তিনমাস হাসপাতালে থাকতে হয়। এখনো ডান পা টেনে টেনে চলে। মিনিবাসের মালিক ওকে ছাঁটাই করলে বিড্ডু ওকে ডেকে নেয়। হাইওয়েতে এমন ড্রাইভাবই দরকাব। এমন সাহস আর খাটবাব শক্তিই দরকাব।

বিড্ডু ট্রাক ডাম্পারের মালিক হলেও নিজে বিশেষ স্টিয়ারিং ধরে না। চিত্তরঞ্জনে পেট্রল পাম্প আছে---সেখানেই ও বসে। তাব শরীবেব দৈর্ঘ্য প্রস্থ তার বিশাল ট্রাকের সঙ্গে বেশ মানানসই, মাথাভরতি পোষ না মানা কোঁকড়া চুল। বড় চুল আর আছাঁটা দাড়িগোপে তার মুখখানা রহস্যময় লাগে।

বিড্ডুব হাতে একটা মোটা নাইলনের দড়ির বান্ডিল। সেই বান্ডিল তার চওড়া কবজিতে ঝোলে। একটু ঝুঁকে সে ডাম্পারের চাকাব অবস্থান দেখে নেয়। রড দুটোর একটা দিয়ে গর্তের জল ও কাদার মাপ আন্দাজ করে। তারপর উৎসুক জনতার দিকে তাকিযে, ইতিমধ্যে রাস্তায় গাড়ির সাথে সাথে কিছু পথ চলতি লোকও দাঁড়িয়ে পড়েছে। তাছাড়া দুপাশের দোকানের লোক, ফ্ল্যাটবাড়ির লোকেবা, আটকে পড়া গাড়িগুলোর ড্রাইভাব, খালাসি, কন্ডাকটব আর যাত্রীরাও ত এই জনতার অংশ, বলে, 'হো যায়েগা।'

ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ একজন বলে ওঠে, 'ক্যায়সে হোগা?' ভিড়ের মধ্যে থেকেই উত্তর আসে, 'আবে শালো চুপ!'

বিড্ডু দড়ির পাক খোলে। একপ্রান্ত ডাম্পারের সামনের বাম্পারে আর অন্য প্রান্ত ট্রাকের সঙ্গে দুটো গিঁট দিয়ে শক্ত করে বাঁধে। ইতিমধ্যে মোহন নেমে কোমরে দুহাত রেখে দাঁড়ায়। বিড্ডু ওর কানে কানে কিছু বলে। মোহন ঘাড় নাড়ে আর ঘাড় নাড়তে নাড়তেই নিমেষে ড্রাইভারের আসনে উঠে পড়ে। বিড্ডু চোখ সামনে রেখে ট্রাকের গা ঘেঁষে পিছু হটে এমন জায়গায় দাঁড়ায় যেখান থেকে ঘাড় ফেরালে পেছন দিকটা পুরো দেখা যায়। মোহন স্টিয়ারিং-এ হাত, গলা বাড়িয়ে ওকেই দেখছিল, বিড্ডু চোখ মটকে বলে, 'লাগাও ইয়ার।'

ঝটিতি মুখ ফিরিয়ে মোহন স্থির। ডান হাত স্টিয়ারিং-এ, বাঁ হাতে গিয়ার, ডান পা অ্যাক্সিলেটরে, শরীরের সব ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ ও সংহত। ইঞ্জিন চালু হলে ডাম্পারের ড্রাইভারও স্টার্ট দেয়। বিড্ডু দৌড়ে এসে কিছু বলে যায় ওকে। গতির নিয়ন্ত্রণ ডাম্পারের ড্রাইভারের হাতে, মোহনের ট্রাক পিছু হটছে পূর্ণ গতিতে। মুখোমুখি গাড়ি দুটো একে অপরের গতির লয়ের অর্ধেকে থাকে।

দুটো গাড়িব গর্জনে ডাম্পারের চাকা দুটো অবাধ্য ছেলের মত এক জায়গায় পাক খায় বারকতক। মোহনের চোখ সরু হয়। দাঁতে দাঁত চেপে ও ডান পায়ে চাপ দেয়। খুব ধীর গতির ছবির মত, সিনেমার কোনো কোনো শটকে যেমন হঠাৎ ধীর গতি দেওয়া হয় তেমনি ধীর চলনে ডাম্পারটা জলকাদা ছিটিয়ে রাস্তার ওপর উঠে আসে। আর উঠে আসতে আসতেই সমবেত ধ্বনি ওঠে, 'উঠছেরে, সাববাশ মোহন! আরে হো হো' আর এই ধ্বনির মধ্যে দুটো গাড়িই গতি কমায়। দুরকম লয়ে কমায়। অথচ একই ছন্দে কমায়। দুই ড্রাইভার যেন দুই শিল্পী—তাদের হাতের পেশির নিয়ন্ত্রণে, পায়ের পেশির নিয়ন্ত্রণে, স্নায়ুর স্থিতাবস্থা রক্ষায়, মনঃসংযোগে আর পারস্পরিক বোঝাপড়ায় যেন সুর-তাল-লয়ের এক এমন যুগলবন্দি যা তৈরি হয় সুর-তালের বিভিন্নতাব সঠিক সমন্বয় ও প্রয়োগে।

মিঠুনের 'মামা, ঘর যাবি না?' ডাকে অশ্‌কা নিজের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু বাইরের সঙ্গে নিজের পুনর্বিন্যাস ঘটাতে পারে না। নিজেকে স্থিত করতে পারে না। মিঠুনের হাত ধরে যেতে যেতে ভাবে—'ইঃ ডাম্পারটো কেমুন উঠাইলেক। কঠিন বুদ্‌ধি ব্যটে উয়াদের!'

চৌত্রিশ

অশ্‌কা ও মিঠুনের মাছ ধরা

এখন অশ্‌কা শিবুর দোকানে কাজ করে। শিবুর দোকানে ভাত নেই—রুটি, পাউরুটি, ঘুগনি, কচুরি, জিলিপি, চা এইসব পাওয়া যায়। রাতে, অশ্‌কা ত থাকে আটটা-সাড়ে

আটটা পর্যন্ত, শিবু নিজে দোকানের পেছনের ঘর থেকে এনে তেমন তেমন খদ্দেরের হাতে একটা বোতল গুঁজে দেয় অশ্‌কা বোঝে "উটো মদের বোতল ব্যটে" আর বুঝে খুশি হয় এই ভেবে যে এই কাজ ওকে করতে হয় না। বাউরিছেলে চোখ মেলেই মদ খাওয়া দেখে, মাতাল দেখে, তবু অশ্‌কার মদ আর মাতালে সমান বিতৃষ্ণা। গ্যারেজের ছেলেরা কেউ কেউ খায়। ড্রাইভার খালাসিরাও খায়। না খেলে নাকি চলে না। একঘেয়েমিতে ভরা দৈনন্দিন, সেই দৈনন্দিনতায় অবিবত চলা থাকলেও গতির পুলক হারায় অথচ ঘরেও থাকতে পারে না—পেট্রল ডিজেল মবিলের গন্ধ ছাড়া ঘুম হয় না।

জল আনতে অশকাকে বিজয়ের দোকানের সামনের কলে আসতে হয়। আগে ও একটিন জল বইতে পারত না—ছোট বালতি করে এনে জালা, ড্রাম বোঝাই করত। এখন ডান হাতে টিনের ভেতবে আড়াআড়ি লাগানো কাঠ ধরে কেমন বাঁয়ে হেলে গতি পায়। ইচ্ছানিরপেক্ষ ভাবে শরীর আর কাজের সম্পর্কের সূত্রেই গতি পায়। শিবু বলেছে আব কদিন পরে বাঁক করে দেবে—একেবারে দুটিন করে জল আনবে। অশ্‌কা মনে মনে বলে, 'আইনছি দুটিন জল! কাজ ছেড্যা দিব তুমার।'

কলে জল নেবার হুড়োহুড়ি। কলতলা জুড়ে, কলতলা পেরিয়ে এই সকালবেলাই ছায়া ঘনিয়ে আছে। এমন মেঘ অশ্‌কা জন্মে দেখে নি। ওর মনে হচ্ছিল দোতলা বাড়ির ছাদে উঠে লাফ দিলে ওই ঘনকালো নরম মেঘটা ছোঁয়া যাবে। কোনোমতে টিনটা কলের নিচে পেতে ও আকাশে মুখ তোলে।পেছন থেকে একটি বউ বলে, 'মররে ছোঁড়া উধাবে ভাইলছিস কি? টিন উপচাঁই যায় খিয়াল পড়ে না? আমরা জল লিব না? জল চলে আল যে!'

সত্যিই ত! টিন নিয়ে দোকানে যেতে যেতেই দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি অশ্‌কার বাহুতে, পিঠে, গালে পড়ে।

বারতিনেক জল নেবার পরে অশ্‌কা একটু সময় পায়। শিবুর এক নতুন কারিগর এসেছে। সুনীল। তাতে অশ্‌কাকে বাড়তি কাজগুলো করতে হয় না। তার শুধু বাইরের কাজ। এই বৃষ্টিতে 'খরিদ্দার' বিশেষ হবে না জেনে ও ভিজতে ভিজতে এদিকে আসে। ফিরোজ খুঁটির গা থেকে বড় পাইপটা খুলে ঘরের ভেতরে রেখে একটা স্টিলের চেয়ার টেনে বসে। চেয়ারটার নীল রঙ জায়গায় জায়গায় উঠে মরচে দেখা যায়। পেছনে হেলান দেবার জায়গায় ওয়েল্ডিং-এর দাগ। ও অশ্‌কাকে চোখের ঈশারায় ডাকে। অশ্‌কা এই চাহনির অর্থ জানে। চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে ফিরোজ ওর হাত বাড়িয়ে দেয়। হাঁটু গেড়ে বসে অশকা একটা একটা করে ওর আঙুল টেনে দেয়। এক একটা আঙুল ফোটে মট মট শব্দে আব অশ্‌কা দেখে আরামে ফিরোজের চোখ বুজে আসছে। গায়ে বৃষ্টির ছাট লাগলে ফিরোজ উঠে চেয়ারটা তুলে ঘরে যায়। ইয়াসিন বারান্দা থেকে ব্যাটারি, রেঞ্জ, হাতুড়ি, প্লাস উঠিয়ে দোকানের ভেতরে চৌকির নিচে রাখে। আরো কিছু জিনিশ সিকান্দার উঠিয়ে রাখে। সেন্টুও ওর দোকানে ঢুকে যায়। দোকানে টেবিল আছে। লম্বা। ও সেটাতে হেলান দিয়ে পাদুটো ক্রশ করে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখে। বরুণের

দোকানে মোড়া ছাড়া অন্য আসবাব নেই। বরুণ দেয়ালে পিঠ দিয়ে একটা মোড়ায় বসে অন্যটায় পা তুলে দেয়। পাশের দোকান থেকে বিজয় এসে আর একটা মোড়ায় বসে পড়ে। 'ই শালা ভাল জল হব্যেক মনে লিছ্যে।' বিজয় বলে।

'জল হলে হোক সন্ধের আগে ছেড়ে গেলেই ভাল সকাল থেকে মোটে দুটো পার্টি!' কথাগুলো এমনভাবে বলে বরুণ যেন বৃষ্টি কতখানি হবে সেটা ও ঠিক করবে।

'মামা?' অশ্‌কা দেখে ভিজতে ভিজতে মিঠুন ছুটে আসছে। খালি গা, একটা গামছা পরনে। 'কীসকে আলি?' অশ্‌কা চেঁচিয়ে বলে। মিঠুনের স্বাস্থ্য খুব ভাল, বয়সের তুলনায় তাকে বড় দেখায়। পারি যে বাড়ি কাজ করে, সেখানে ভিডিও দেখানো হয় প্রায়ই, সেসব দেখে দেখে মিঠুন অনেক গানই ফিল্‌মি স্টাইলে নেচে গেয়ে দেখাতে পারে।

'মাছ ধইরব মামা, আয়।' ও কালভার্টের কাছে দাঁড়ায়। কালভার্টটা মাটিতে চাপা পড়ে গিয়েছিল। দোকানঘরগুলো করবার সময় গগন ওটাকে সাফসুতরো করিয়ে নতুন করে সিমেন্টবালিব আস্তর দিয়ে পুনরুদ্ধার করে। রাস্তায় এপাশে-ওপাশে জমি নিচু। এদিকে নালাটা বেশ চওড়া। এমনিতেই নালাটায় সারাবছরই জল থাকে। ফাটা পাইপ ওপচানো আর মুখ না লাগানো কলের জলে সারাবছরই কিছুটা জল আর কাদা থাকে। এখন বৃষ্টিতে সেটা ঝরনার মত লাগে। রাস্তার ধারে স্টোন চিপ্‌স্ আর ডাস্ট ডাঁই করা। অশ্‌কা হাত নেড়ে মিঠুনকে নালায় নামতে বারণ করে। একবার বৃষ্টির ভেতর দিয়ে আকাশ, মাটি, রাস্তার ধারের ভেজা গাছপালা দেখে নেয়। তারপর বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে নেমে সেই গতির ধাক্কাতেই নালাব ভেতর নেমে পড়ে। পা দিয়ে কাদা ছানে। পায়ে সুড়সুড়ি লাগলে নিচু হয়ে কাদার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে তুলে আনে ছোট ছোট পিচ্ছিল চ্যাং মাছ। মিঠুন নেমে আসে গোড়ালি-ডোবা জলকাদা পর্যন্ত। ও হাত বাড়ায়, 'মাছ পালি? আমাকে দে।' অশ্‌কা গেঞ্জিটা কোমরে গুঁজে নেয়, গায়ে বড় হওয়াতে ওর বুক-পেটের জায়গাটা ঢলঢল করে। ও গেঞ্জির গলার ফুটো দিয়ে মাছ গলিয়ে দেয় আর পেটে সুড়সুড়ি লাগে বলে নিজেই হেসে ওঠে। ওর প্যান্টের দু-পকেটেও মাছ!

বৃষ্টি এখন জোরে নেমেছে। পায়ের পাতার ওপর দিয়ে এত বেগে জলস্রোত চলে যায় যে ও মাছের যাওয়া টের পায় না। কখনো কোনো মাছ শরীর মোচড়ালে টের পায় কিন্তু ধরতে পারে না। স্টোন ডাস্টের এক একটা চাঙড় জলের তোড়ে পাহাড়ি ধসের মত সশব্দে পড়ছে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেগুলো জলে ভিজে শ্লেটপাথরের মত লেপ্টে যায় নালার ধারে সেখানে মুহূর্তে মুহূর্তে আঁকাবাকা রেখা আঁকা হয়। ঝরনার মত মোটা জলধারা রাস্তা থেকে যেখানে নালায় পড়ে, সেখানে শাদা ফেনা তৈরি হয়। কালভার্টের তলা দিয়ে জলস্রোত চলে যাচ্ছে রাস্তার ওপারে—মাঠে। সেখানে একটা অস্থায়ী ডোবা। এখন সেই ডোবা উপচিয়ে পাগলের মত জলধারা ছুটে চলে ঘাস ডুবিয়ে, আলের ওপর দিয়ে দূরে।

রাস্তা দিয়ে বাস, মিনিবাস, মালবোঝাই লরি জল ছিটিয়ে চলে যায়। বৃষ্টির মধ্যে সব

আবছা দেখায়। যেন ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে দেখা অন্য কোনো জায়গার দৃশ্য।

অশ্‌কা যেন উছলে ওঠে। মিঠুন জলে দাপায় আর কচি গলায় নির্ভুল সুরে আধো উচ্চারণে গেয়ে যায়, 'দিল দিবানা দিল সজনাকে মানে না/ ইয়ে পাগলা হ্যায়/ সমঝানেসে সমঝে না।' অশ্‌কা দু-একবার গলা মেলাতে গিয়ে থমকে যায়। এই আকাশ, এলোমেলো বাতাসে ছুটে যাওয়া জলকণা, এসব যে অচেনা বিস্ময়ের অনুভব আনছে ওর শরীর ছেয়ে সেই অনুভবের তীব্রতায় এ সুর মেলে না। অথচ কী সুর যে মেলে, কী সুর যে ওর শরীর মন থেকে বেরিয়ে আসতে খোঁজে তার প্রকাশ ওর জানা নেই। আজন্ম নদী-সমুদ্র না দেখা, উঁচু-নিচু রুক্ষ ভূমির দেশে বেড়ে ওঠা এই বালক তার জীবনের এই অনির্বচনীয়ের অনুভব বোঝে না। পায়ের নিচে ছুটন্ত জলস্রোত যেন নদীর ধ্বনি নিয়ে আসে ওর দুই শ্রবণে। ও বোঝে না। বালক অশ্বত্থামার মুগ্ধতায় ও সেই ধ্বনি শোনে, বরং এই মায়া মনুষ্যসৃষ্ট না হওয়াতে তাতে এক সরলতা থাকে। যে জলধারা প্রাকৃতিক তার শ্রবণও ত প্রাকৃতিক। তার স্পর্শ গন্ধও প্রাকৃতিক। এই মেঘও ত কোনো নদীবাহিত, সমুদ্রবাহিত জলধারার বায়বীয় রূপ—বিশুদ্ধ ও প্রকৃতিজ। অশ্‌কা সেই বিশুদ্ধতায় থাকে। সেই প্রাকৃতিকতায় থাকে।

বৃষ্টি কমে আসে। মিঠুনের হাত ধরে অশ্‌কা দোকানের বারান্দায় উঠে আসে। ওর পেটের কাছটা ফুলে আছে। ঢেউ খেলছে গেঞ্জিতে। সর্বাঙ্গ জলকণা ও আনন্দে মাখামাখি। সেন্টু ওর পেটে খোঁচা মেরে বলে, 'কী মাছ ধরলি?'

'চ্যাং।'

সুনীল রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে বলে, 'জলদী আয় অশ্‌কা. শিবুদা ডাইকছে।'

বারান্দা থেকে নেমে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যে যায় অশ্‌কা। পেছন পেছন মিঠুনও নামে।

'যেছি গ সুনীলদা।' বলে ভাগ্নের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসে অশ্‌কা। 'মিঠুন, তর গামছাটো খুল্যা ফেল।'

'কেনে মামা? ন্যাংটো হব যে!'

'মাচ লিবি গামছাটোয়।'

বড় বড় চোখ তুলে একবার অশ্‌কার মুখে, একবার ঘাড় মাথা ঘুরিয়ে, চারিদিক দেখে নেয় মিঠুন। তারপর একটানে গামছাটা খুলে দুই খুঁট ধরে ভেজা মাটির ওপর পাতে। অশকা হাঁটু গেড়ে বসে। এক হাতে গামছার অন্য খুঁট দুটো জড়ো করে ধরে, অন্য হাতে প্যান্ট থেকে গেঞ্জির গোঁজা অংশ খুলে দিলে ছোট ছোট ল্যাঠা মাছগুলো গামছায় পড়ে। সবগুলো মাছ পড়লে পকেটের মাছগুলোও দেয়। গামছাটা গিঁট দিয়ে পুঁটলি বানায়। ভেতরে মাছগুলো নড়েচড়ে বলে পুঁটলিটার জ্যামিতিক আকৃতি সামান্য পালটে পালটে যায়। পুঁটলিটা মিঠুনের হাতে দিয়ে বলে, 'মাকে বইলবি ঝাল রাঁইদথ্যে। আর আমার লাল জামাটো আর কাল প্যান্টটো দিথ্যে বইলবি। এক ঘড়িতে আইসবি মিঠুন।' শেষটুকু চেঁচিয়ে বলতে হয় কেননা ততক্ষণে পুঁটলি কাঁধের ওপর দিয়ে পিঠের ওপর ফেলে মিঠুন ছুটেছে।

পঁয়ত্রিশ

দশে মিলি করি কাজ

'রাস্তাটা সারানো দরকার' কথাটা কে যেন বলে একদিন। সামনের মার্চ পর্যন্ত এভাবে থাকলে যে কোনোদিন একটা বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এ ভাবনাটাও বলে ফেলে আরো কেউ কেউ। যে রাস্তা পাঁচ মিনিটও চুপচাপ থাকে না তেমন কোনো কারণ না ঘটলে সে রাস্তা এমনভাবে ফেলেও রাখা যায় না। বনধ কিংবা অন্য কোনো কারণে গাড়ি না চললে মিনিটে গড়ে তিন থেকে পাঁচটা গাড়ি যায়। কখনো কখনো এত পর পর গাড়ি যায় যে মনে হয় কনভয় চলেছে। বৃন্দাবনীর আগে এম পি টি সি-র একটা প্রজেক্টের কাজ শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন। থার্মাল পাওয়ারেরই ব্যাপার ছিল ওটা শুরুতে কিন্তু সেটা কোনো এক কারণে চলে গেল বিহারে আর এখানে হচ্ছে পাওয়ার ট্রান্সমিশনের কাজ। বারো-চোদ্দ চাকার লম্বা ক্যারিআরগুলো অজানা সব ভারী ভারী যন্ত্রপাতি নিয়ে যায়। ক্রেন যায়। মাটি তোলার গাড়িগুলো যায়। এখানকার মানুষজন এসব যে একেবারে দেখে নি তা নয়। কেব্‌ল্‌স, কলিআরি আর রেলইঞ্জিন বানানোর কারখানার কাজে ত কত ধরনের যন্ত্রপাতি বোঝাই ট্রাক, ক্রেন, ক্যারিআর যায়। এখন সেগুলোর সঙ্গে এইসব অত্যাধুনিক মেশিন আর সেইসব যন্ত্রপাতি বইবার আধুনিক গাড়িও যাচ্ছে। যেদিন অমনি এক লম্বা প্ল্যাটফর্মের মত ক্যারিআরের ওপরে বিশাল ক্রেন নিয়ে আগুপিছু সরকারি লোক নিয়ে দুটো তিনটে গাড়ি যায়, সেদিন রাস্তার দুধারে ভিড় করা বাচ্চাদের মধ্যে পথচলতি বড় মানুষও দু-চারজন থাকে। দুজন লোক আগে আগে লম্বা লাঠি নিয়ে রাস্তার তারগুলো উঁচু করতে করতে যায় পেছন পেছন ক্রুদ্ধ জন্তুর মত গর্জন করে অতিকায় গাড়িগুলো চলে।

অশ্‌কাও হাঁ করে দেখে। কাজের মধ্যে থেকে দেখে। রাস্তার ধারে ভিড়ের একজন হয়েও দেখে। ও ভাবে কার জোর বেশি—গাড়িগুলোর না ঠ্যাঙ্গা হাতে লকদুট্যার?

তা একটা যেমন তেমন করে বানানো রাস্তার শরীর অত ভার দিনের পর দিন সইতে পারবে কেন? রাস্তাটা ত সেরকম কোনো পরিকল্পনা করে বানানো হয় নি। বরং যখন যেমন দরকার, তেমন দরকারমত যতটুকু না হলে নয় ততটুকুই বানানো হয়। রাস্তা বানাবার টাকা সরকার দেয়। রাস্তা সারাবার টাকাও সরকার দেয়। সে টাকা দেবার নিয়মকানুন আছে। যদিও সরকারের টাকা আসলে পাবলিকেরই টাকা—সে টাকা পাবলিকই দেয় নানাভাবে, জেনে অথবা না জেনে, সেই সব টাকার একটা অংশ ত ফিরে আসে পাবলিকেরই হাতে, পাবলিকের সেই অংশের হাতে যাদের সমগ্র পাবলিকই নির্বাচন করেছে সেইসব টাকা পাবলিকের হয়ে খরচ করার অধিকার পাবার জন্য। ত সেই টাকা যারা খরচ করে, রাস্তাটাস্তা বানায় বা সারায় তাদের, আর সেই রাস্তা দিয়ে যারা হাঁটে বা গাড়ি চালায় বা চাপে তাদের ধারণা—এই খরচ, পাবলিকের টাকা খরচ

আর সেই খরচ অনুযায়ী কাজের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কিত ধারণা একসময় প্রায় বিপরীতে চলে যায়।

কাজে কাজেই অসময়ে রাস্তা সারানোর টাকা পাওয়া যায় না। টাকা দেওয়ার নিয়মকানুনে পাবলিক ওআর্কস ডিপার্টমেন্ট তার এলাকায় বাঁধা। পঞ্চায়েতও একইভাবে তার এলাকায় নিয়মবহির্ভূত কাজ করতে পারে না। তাছাড়া টাকাও নেই। সেসব টাকার হিশেবনিকেশ কাগজেপত্রে নিখুঁত করে বুঝিয়ে দেয়া আছে।

শেষ পর্যন্ত দোকান গ্যারেজের ছেলেরাই উদ্যোগ নেয়। দোকান, আশেপাশের বাড়ি আর চলতি গাড়িগুলো থেকে পাঁচ টাকা করে চাঁদা তোলা হল কয়েক দিন ধরে—তাতে যে টাকা উঠল সে টাকায় পাথরকুচি আর ডাস্ট দিয়ে দুরমুশ দিয়ে পিটিয়ে রাস্তা তিনদিনে ভরাট। কম খেতে পাওয়া বছর বিয়োনী নারীর মত রাস্তাটার যেমন অল্পেই ধস নামে বর্ষায় বা অসময়ের বৃষ্টিতে, তেমনি একটু যত্নআত্তি পেলেও আলগা লাবণ্য ফিরে পাওয়া সেই নারীর মতই চকচকে হয়ে ওঠে রাস্তাটা কিছুদিনের জন্য।

রাস্তা সারানোর ব্যাপারটা এমন সমবেত উদ্যোগে ঘটে যায়, এমন সাফল্য ও স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে ঘটে যায় যে সেই বিভ্রমের অবকাশ ঘটে, যে বিভ্রমে মনে হতে পারে এমন সমবেত উদ্যোগে এমনই সাফল্য পাওয়া যেতে পারে অন্য কোনো সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও। কেবল স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত কোনো আবেগের ধাক্কায়। যেন সেই অলৌকিক বিভ্রমে ভেঙে যেতে পারে এখানকার মানুষজনের বসবাসের নানা অলিগলির প্রাচীর ও বদ্ধ দরজা। এই প্রাচীর যারা বানায় তাদের প্রাচীন দুর্গ ও অট্টালিকা। আর সেই ধ্বংসস্তূপের ওপরে এমন সমবেততায় গড়ে উঠবে শুদ্ধ আলোবাতাস জলের এক অন্য ভুবন।

কিন্তু হঠাৎ কোনো আবেগের আকস্মিকত্তায় অথবা আঘাতে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা—ভাঙা বা গড়ার কোনো ঘটনা শুধুমাত্র ঘটে যেতে পারে। একক ও বিচ্ছিন্ন সেই ঘটনা কোনো ধারাবাহিকতায় স্থাপিত হয় না। সেই আপাতসাফল্যকে, সেই ঘটে যাওয়া কর্মকাণ্ডকে সচল রাখতে হলে আবেগের আকস্মিকতাব সঙ্গে যুক্তি, বুদ্ধি ও স্থির মননের চলমানতা যুক্ত করতে হয়। আর তা হয় না বলেই এইসব হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে না। তার সাফল্য বা ব্যর্থতাও কোনো অভিজ্ঞতা হয় না। তাই মজুর কামিনদের পাওনা মিটিয়ে বাকি টাকায় ছেলেরা মিষ্টি খায়। এই আবেগ ও উদ্যোগকে জীইয়ে রাখার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না।

দুটো রসগোল্লা খেয়ে অশ্‌কা সেন্টুকে বলে, সেন্টুই হাঁড়ি থেকে মিষ্টি দিচ্ছিল সবাইকে, 'সেন্টুদা, বছব বছর রোডটো তুমরা সারা কর‍্যালেই ভাল। পি ডাবলিউ ডি মিষ্টি দিবেক নাই।'

ফিরোজের প্রসারিত হাতে দুটো রসগোল্লা দিয়ে সেন্টু বলে, 'বছর বছর আমরা করলেও মিষ্টি পেতিস না। হঠাৎ করলে এমনিই হয়, বুঝলি?'

তা অশ্‌কা অতশত বোঝে না। কেমন সবাই মিলে রাস্তাটা মেরামত করল, কেমন

সবাই মিলে মিষ্টি খাওয়া হল—এতে এক আনন্দপ্রবাহ থাকে। সেই আনন্দ বিহ্বলতায় অশ্‌কা সমীরের সাইকেলটা নিয়ে মসৃণ রাস্তার ওপর দিয়ে একবার এদিকে যায়, একবার ওদিকে যায় যে পর্যন্ত সুনীল ডেকে নিয়ে না যায়।

ছত্রিশ

"নেমকহারাম!"

পিঠাইকেআরির কাছে পাইপ ফেটেছে—সারিয়ে-সুরিয়ে তিনদিন পর কলে জল এল। এ-কদিন কুয়ো থেকে জল তুলে তুলে অশ্‌কার হাতে ফোস্কা পড়ে গেছে। সুনীল খালি হাঁক পাড়ে—'জল নিয়ে আয় অশ্‌কা।' দোকানের পেছনে একটা টালিছাওয়া ছোট ঘরে শিবুর বউ আর মদ থাকে। গাঁয়ে নাকি ওর বিয়ে করা বউ আছে। বাচ্চা নেই। এ বউটা কেমন করে যে জুটে গেল কেউ জানে না। তা বউ যখন আছে শিবুর সংসারও একটা আছে। সেই গৃহস্থালির জলও এ-কদিন অশ্‌কাকে বাঁকে করে বইতে হয়েছে। বিজয়ের দোকানের পেছনে বড় ইঁদারাটার পাড়ে দাঁড়িয়ে ভরা বালতি তোলার সময় অশ্‌কার পিঠ বেঁকে যায়। খাবার জন্য হয় হারান মাস্টারের বাড়ির কুয়োর জল, তারা গেটে তালা দিয়ে দিলে ডিপ টিউবওয়েলের জল আনতে দশ-বার মিনিট লাগে।

আজ জল আসাতে কলপাড় থিকথিক করছে মানুষের ভিড়ে। অপরিচ্ছন্ন শ্রীহীন রমণীশরীরের গন্ধে আর ঠ্যালাঠেলি চ্যাঁচামেচিতে এক বিশৃঙ্খল জটলা।

দোকানের টিনটা কলের নিচে পেতে অশ্‌কা একছুটে বাড়ি যায়। ছুটতে ছুটতেই ফিরে আসে একটা কলসী আর বালতি নিয়ে। সুনীল দ্বিতীয় টিনটা পেতে দেয়। অশ্‌কাকে বলে, 'ঘরের জল বাদে লিস। জলদী আয়।' অশ্‌কা তবু গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সুনীল টিন সরাতেই পেছন থেকে চট করে বালতি পেতে দেয় বরুণ। কলের মাথাটা ধুয়ে তামার ঘটে জল ভরে। মনটা প্রসন্ন হয়ে ওঠে ওর। বলে, 'নিজেদের কল ত ঝগড়া করে ভাঙলি ত গ্রামের কলে যা।'

পবি বলে, 'গেরামে কত জল লিথ্যে দেয় সরাকরা!'

'তাহলে পঞ্চায়েতকে বল কল বসাতে।'

'পঞ্চেৎ কল দিবেক? ভুটের সোময় মাসি গঁ, দিদি গঁ, ভুট পিরাইলেই চিনতে লারে!' পবির বলার ধরনে সব মেয়েরা হেসে ওঠে।

বাউরিপাড়ার কাছাকাছি দুটো কলই অকেজো। গ্রামের ভেতরের কল ত মাজিবাবু, ঘোষবাবু আর বামুনদের। সে কলের জল নেয় এমন সাধ্যি বাউরি মেয়েমরদদের নেই। সরাকদের, ঘোষদের আর বামুনদের কাছে তাদের অনেকেরই অন্নজল বাঁধা। যে কলটা একেবারে বাউরিপাড়ার ও-মাথায় সেটায় ঠিকমত জল ওঠে না বহুদিন এমনই মুচড়িয়ে ভেঙে গেছে সেটা নিজেদেরই ঝগড়ায়। দুনম্বর কলটা এতদিন ভাল ছিল। কলের ঠিক সামনের বাড়িতে জলের তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে রাস্তার কলে সর্বদাই একটা

পাইপ লাগানো থাকে। অফিস টাইমে সেই পাইপ খুলে কেউ একজন কাপড় কাচতে বসে। তা থেকে ব্যাপারটা শাবল দিয়ে কল ভাঙা পর্যন্ত গড়ায়। এখনও জল ওঠে তবে এত নিচুতে যে কলের তলায় বড় হাঁড়ি বা কলসী পাতা যায় না।

সুনীল অশ্‌কাকে তাড়া দিয়ে শেষে নিজেই বাঁক উঠিয়ে নিয়ে যায়। অশ্‌কা হিশেব করে—এখনো দুটো কলসী, একটা বালতি আব তিনটে হাঁড়ি ভরার পরে ওর পালা। ও বারেবারে রাস্তার দিকে তাকায়। একটু পরে দুহাতে দুটো অ্যালুমিনিআমের হাঁড়ি দোলাতে দোলাতে ববিতা আসে। অশ্‌কা বালতি পেতে বলে, 'জলদি কর ববিদি।'

ববিতা হাঁড়িদুটো পরিপাটি মাজে। ও এখন বাগানঅলা বাবুর বাড়ি কাজ করে। কাজটা পেয়ে ওর ভালই হয়েছে, এবাড়ি-ওবাড়ি ছুটতে হয় না। দুবেলা খাওয়া পায়। ভরপেট। মাইনেও বেশি। ভাদু ওর এক সম্বন্ধ এনেছে। আর একমাস পরেই ওর বিয়ে। অশ্‌কা শুনেছে বিয়্যার পর ববিদিকে আর কামিন খাইটতে হবেক নাই। বর দোকানে কাজ করে। দুই ননদ আছে, তারা মাছ বিকে। শ্বশুরের জমিজিরেত আছে অল্প-স্বল্প। শাশুড়ি নাই। ফলে ঘরে ভাত রাঁধার লোক নাই—ননদরা দুজনেই বয়স্কা, বিধবা, মাছের ব্যবসা সামলে ঘরদোর সামলানো তাদের পক্ষে মুশকিল। ববিতার মত শক্তসমর্থ জোআন মেয়েকেই তারা বউ হিশেবে পছন্দ করে গেছে। মাথায় হাঁড়ির ওপরে হাঁড়ি চাপিয়ে ববিতা চলে। মাটি দিয়ে মাজা হাঁড়িগুলোর ওপরে সূর্যালোক প্রতিফলিত হয়। সেই প্রতিফলিত রশ্মি নানা কৌণিক বিন্দুতে বিচ্ছুরিত করতে করতে ববিতা হেঁটে যায়। বাঁ কাঁকালে কলসীর গায়ে জড়ানো বাঁ হাতের আঙুলগুলি রচিত থাকে যে মুদ্রায়, মাথায় চাপানো হাঁড়ির গায়ে, ডান হাতের আঙুলগুলিরও যেন তার পরিপূরক মুদ্রায় ধারণ। পেছন থেকে চলনের দোলনে, ভরা গাগরির কারণে বাঁদিকে ঠেলে ওঠা তার শরীরের ধারক রেখাটির বক্রতাও যেন ছন্দ পায়। জলের ভারে সেই ছন্দে একটা দ্রুততা আসে। নিশ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বাড়ে। স্বাভাবিক নিয়মেই বাড়ে। সেভাবেই এক নিশ্বাসপতনের হাঁ মুখে ঘরের দোরগোড়ায় হাঁক পাড়ে, 'মা, হাঁড়িটো নামাই দে।'

উঠনে বালতিভরা জল নামিয়ে অশ্‌কা দোকানে ছোটে। সুনীল বকেই যায়, 'ই ছোঁড়া আর পাইরবেক নাই। উয়ার মন উইড়ছে পাখির পারা। চা দিব ত গিলাশ এখুনো ধুয়া হয় নাই বাবুর। ঝা ঘরকেই ঝা।' সুনীল এত বকে যে শিবুর কাজ বেঁচে যায়। তার বিনীত ভাবটি, নিজের দোকান হওয়া সত্ত্বেও যায় নি। যেন সে এখনো পরের দোকানে চাকরি কবছে।

অশ্‌কার এসব কথা কানেই ঢোকে না। জল ভরতে গিয়ে ও দেখে এসেছে রুস্তম একটা মহেন্দ্র অ্যান্ড মহেন্দ্রর জিপের বনেট খুলে ওয়াটারকুলার চালাচ্ছে আর বন্ধ করছে। ইয়াসিন চলে গেছে কুলটি—রুস্তম তার জায়গায়। সেই গাড়িটার ইঞ্জিনের গন্ধ, শব্দ আর কত নতুন নতুন জায়গার ধুলো মাখা শরীরটা ওর মন ছেয়ে থাকে। ওর নতুন কৈশোরের নতুন জেগে ওঠা আবেগে আর বিস্ময়ে এই জীবনের টান থাকে। ডিজেল পেট্রলের গন্ধ তার ভাল লাগে, এত ভাল লাগে যে, নাক উঁচু করে বাতাস থেকে সেই

গন্ধ যেন শুষে নেয় ও, ধুলো উড়িয়ে চলে যাওয়া গাড়ির পেছন পেছন। এই অনুভব সে তার শরীর দিয়েই পায়। সেই শরীরের শক্তি দিয়ে এই জীবনের বহমানতা পেতে চায়। অথচ সেই শক্তি যেন এক অনাকাঙ্ক্ষিত বর্তমানে বাঁধা। এই বর্তমানে তার ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে শক্তি আর শ্রম বিক্রি হয়ে যায়। তাব মা হাতে ধরে পুত্রের শ্রম বিক্রি করে দিয়ে গেছে। সেই শ্রমবেচা পয়সা তাকে এক মাতৃস্নেহনিরপেক্ষ বাঁচার জীবনে ঠেলে দিয়েছে। তার বেঁচে থাকার দিনগুলিতে, রাতগুলিতে আকণ্ঠ তৃষ্ণার মত এক ইচ্ছা থাকে। এক না-বোঝা ক্রোধ ও প্রতিবাদ তার এই অনিচ্ছাকৃত দৈনন্দিন ভেঙে ফেলতে চায় অন্য কোনো দৈনন্দিন স্বপ্নে আর আবেগে। অথচ ভাঙার কোনো অস্ত্র তার হাতে নেই। ভাঙার কোনো উপায় তার জানা নেই। এ এমনই বন্ধন যে দেখা যায় না। আর যা দৃশ্যমান নয় তাকে ছিঁড়বার কোনো উপায় থাকে না। ও ডান হাত তোলে—অদৃশ্য শিকল বাজে ঝমঝম। বাঁ হাত তোলে—আবার বাজে ঝমঝম। প্রতি পদক্ষেপে শিকল বাজে ঝমঝম। এদিকে ছুটে যায় অদৃশ্য দেয়ালে ধাক্কা খায়, ওদিকে ছুটে যায় নিরেট, নিরেট—এতটুকু ছিদ্র নেই যে ও আকাশ খুঁজে পায়।

ঝনঝন করে দুটো গেলাশ ভাঙে। তুলতে গিয়ে হাতের ধাক্কায় আর একটা। শিবু আসার আগেই সুনীল দৌড়ে আসে, ঠাস করে এক চড় কষায় ওর গালে। 'ভাইগুলি ত! শিবুদাকে বইলব পয়সা কাটে লিথ্যে।'

মুখ নিচু করে অশ্‌কা ভাঙা কাচগুলো জড় করে। হাত দিয়ে তুলতে গিয়ে তর্জনীতে একটা টুকরো বিঁধে যায়। ওটা টেনে বের করলে টপটপ রক্ত পড়ে। কপালে চুল ঝেঁপে থাকে বলে ওর অশ্রুপতন দেখা যায় না।

শিবু বেরিয়ে আসে। ভাঙা কাচগুলোর দিকে তাকিয়ে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'মাইনে থেকে কী আর কাটব তোর? দশ টাকা পাঁচ টাকা করে নিয়ে নিয়ে তোর মা কি কিছু বাকি রেখেছে? এই বাউরি জাতটাই এমন। কাজে মন নেই খালি পয়সা চেনে খুব।' সুনীল বলে, 'আরো মাইরব নাকি শিবুদা? কেমুন জিদ্দী দ্যাখো, ঘাড় গুঁজ্যা বস্যা আছে ত আছেই? উঠ? উঠ কেনে?' ও অশ্‌কার হাত ধরে টেনে ওঠায়। 'লে, আর তিনটা গেলাশ নামা আর ভাঙ! কীরে? কয়লা নাই, এক পিছা ভেঙে লিয়ে আয়।'

অশ্‌কা এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। রক্তমাখা হাতের উলটোপিঠে গড়িয়ে আসা অশ্রুচিহ্ন মোছে। কয়লা আনতে ওকে ভেতরে যেতে হবে। ঝুড়িটা তোলে। একটু পরে এক ঝুড়ি কয়লা এনে উনুনের পাশে রাখে। সুনীল নতুন গেলাশে চা ছাঁকছিল; শিবু দোকানের ভেতরেই একটা চৌকিতে বসে। এসময়টা সে এরকমই একটু বসে। ভাজাভুজি, ঘুগনি সবই তৈরি এখন খালি চা তৈরি করা আর এইসব ঠিকমত প্লেটে নয়ত শালপাতায় দেওয়া। এসব সুনীল করলেও শিবুকে দেখভাল করতে হয়। নজর রাখতে হয়। তেমনি দেখভাল করছিল ও, অশ্‌কা এসে দাঁড়ায়। 'কারিগরকাকু, আমি কাজ কইরথে লাইরব। আমার বেতনটো দাও।'

এই প্রথম অশ্‌কা তার শরীরের শক্তি, শ্রম, তার নিজের নিয়ন্ত্রণে পায়। না বুঝেই

পায়। অপমানের মধ্য দিয়ে পায়। প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে পায়। অথচ প্রতিবাদ বোঝে না। প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে পায়। অথচ প্রত্যাখ্যান বোঝে না। আর তার এ হেন প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যানের ভাষা শিবুকে বিচলিত করে। 'কাজ ছেড়ে দিচ্ছিস ত খাবি কি? বেতন পাবি নাকি এক পয়সা? তার ওপরে গেলাশ ভাঙলি। যা যা পাগলামী করিস না কাজে যা।' অশ্‌কা তবু দাঁড়িয়ে আছে দেখে একটা পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে বলে, 'নে। যা ভাগ, নেমকহারাম!'

সাঁইত্রিশ

কী কঠিন প্রতিদিন

অশ্‌কা কাজ ছেড়ে দেবার পরে আস্থা ভোট হারিয়ে মিলেমিশে সরকারের প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তার মানে আবার ভোট। সরকার আসে সরকার যায়। এই যাওয়া আসার মাঝখানে ভোটের প্রস্তুতিপর্বের আর ভোটের দিনগুলোতেই সুখী ভারতবর্ষের মানুষ হয়ে ওঠে। সে ত ভারতবর্ষের সেই মানুষদের একজন যার নাম ভোটার লিস্টে আছে এবং ভোট দেয়। ভারতবর্ষে যারা ভোট দিতে সক্ষম তাদের শতকরা আশি জনের নাম ভোটার লিস্টে থাকে। সেই আশি জনের শতকরা পঞ্চাশ থেকে ষাট জন ভোট দিতে যায়। সেই ভোটের অন্তত শতকরা চল্লিশ ভাগ পেলে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়ে দেশ চালানো যায়। সুখী আবার সেইসব ভোটারদেরও একজন যে তারই ভোটে নির্বাচিত সরকার কেন ভেঙে যায়, কোন দায়িত্বজ্ঞানহীনতা থেকে ভেঙে যায় জানে না। সে যা জানে বা তাকে যা জানানো হয় তা হল আবার ভোট দিতে হবে। সেই ভোটের প্রস্তুতি শুরু হবার আগেই কোথায় জানি যুদ্ধ বেধে গেল।

যুদ্ধ ত কোথাও না কোথাও হয়ই। সেসব যুদ্ধের খবর যারা কাগজটাগজ পড়ে তারা জানে। সেসব যুদ্ধের খবর সুখীর জানবার কথা নয়। কিন্তু এই যুদ্ধের খবরটা ও শোনে। অশ্‌কাও জেনে যায়। সুখী শোনে বাবুঘরে। ছেলেকে বলে, 'চালের কিলো পঁচিশ টাকা হব্যাক। এ বেতনে আর চইলবেক নাই।' ববিতার বিয়ে হয়ে গেছে মাসখানেক আগে নইলে সে আরো খবর আনত। হয়ত টিভি-তে দেখেও আসত একটা সত্যিকারের যুদ্ধ: সত্যিকারের গুলি। বোমা। মৃত্যু। হত্যা। সিনমার ঢিসুম ঢুসুম নয়। রামায়ণ মহাভারতের তীর, গদা নয়। রেশনে তেল দেবে না পরের সপ্তাহে। পেট্রল, ডিজেল, গ্যাস সব মাহাঙ্গা। সব বন্ধ। তাহলে? অশ্‌কা ভাবে তাহলে ও গাড়ির কাজ কী করে পাবে! এ-কটা মাস ত ও কোনো বাঁধাধরা কাজ ধরে নি। মজুর খাটছে। আজ এর বাগান সাফ, কাল ওখানে ইঁট নামানো, পরশু আর একজনের মাল উঠানো এইসব করে যাচ্ছে এই আশায় যে একদিন গ্যারেজে কাজ পাবে। তা বাস টেস্‌কি, টেরাকই যদি নাই রইল ত খালাশি লিবেক? ডাইবর লিবেক? মেকানিকগুল্যান্ ত সব বেকার বস্যা থাইকবেক।'

এখন আবার বাগানের কাজটাও কমে.এসেছে। আবার বষার পরে পাবে। পুজোর আগে পাবে। বর্ষায় বাগানে ঘাস আগাছা জন্মাবে। গোয়ালাদের বউগুলো মাথা বোঝাই করে কেটে নিলেও অশ্‌কার কাজ থাকবে। কিন্তু এখন কী করবে ও? এই শীতে জাড় লাগে—সন্ধ্যাবেলাতেই আগুনের ধারের গুমটি চাই। খিদে লাগে, সেই খিদে ত সব দিন মেটে না। তবে জাড়ের দিন প্রায় ফুরিয়ে এল এই যা!

পারি কিছুদিন ছিল। ববিতার বিয়েব পরপরই চলে গেছে। মনোজের সঙ্গে একদিন রাস্তায় দেখা। মনোজ তাকে বলে সে পারিকে চায়। কেমনভাবে চায় সেটিও বলে। মনোজ ডাম্পারের ড্রাইভার। বাপের ঘরে তার সাঙা করা বউ থাকে। একটা বাচ্চাও থাকে। তা থাকুক, মনোজকুমার পারিকে ভালবাসে। তার সিঁদুর দেয়া বউকে ভালবাসে। সে ভালবাসায় পারিকে ছেড়ে যাবার পরেও, সাঙা করার পরেও পারির শরীরে সন্তান আসে। সে মাঝে মাঝে গাড়ি থামিয়ে রোডের ধারে পারির ঘরটিতে যেত। যেদিন যেদিন যেত সেদিন পারি পেটভরে চপ, মিষ্টি খেত। স্বামীকে দিত। মিঠুনকে দিত। তাতেই ত রেখা হল। তাতেই ত রেখার পরে তার গর্ভমোচন হল। অকালে এবং স্বেচ্ছায়। এই গর্ভমোচনের ব্যবস্থাটা ও তার গর্ভধারিণীই করে দিয়েছিল। নইলে পারি খাওয়াবে কি? সন্তান হলে, কাজে না গেলে রেখা মিঠুন খাবে কি? এক দু-রাতের চপ মিষ্টিতে কি ভাতের খিদা যায়? অথচ সেই স্বামীর কথায় পারি চলে গেল। মনোজ নাকি মাস গেলে টাকা দেবে। ঘরভাড়া দেবে। এক বাড়ি কাজ কবলেই আপাতত পারিব চলে যাবে। বাবুঘরের কাজটা থাকলে পুরনো জামাকাপড় পাওয়া যায়। বচ্ছরকার দিনে নতুন শাড়ি ব্লাউজশায়া পাওয়া যায়। তাছাড়া আজকাল মাইনেও বেড়েছে। তেমন ঘরে কাজ পেলে চা রুটির সাথে একবেলা ভাতও পাওয়া যাবে। তাই আর একবার গর্ভ ভরে না ওঠা পর্যন্ত স্বামী পুত্রকন্যা নিয়ে স্ত্রী হয়ে, জননী হয়ে থাকবার লোভ পারি ছাড়তে পারে না। সে ত সাঙা করে নি। অন্য পুরুষের আশ্রয় নেয় নি। সে একটু থিতু হতে চায় তবু তার স্বামীর সংসারে স্ত্রীর পদটি পাকাপাকি হয় না কিছুতেই। স্বামীর আসা যাওয়ার পথটি তার ছোট ঘরটির সামনে। রোডের ধারে মাঝে মাঝে বাত কাটাবার জন্য যদি নিজের বউয়ের শয্যা থাকে ত মনোজ লছিপুর গেটে যাবে কেন বারোআরি শয্যায়? স্টিয়ারিং ধরে যে হাত তার কবজির জোর অনেক। দু-দুটো সংসার সে সামলাতে পারবে—তার নিজের তৈরি সংসার। তার বাপের দেওয়া সংসার।

অশ্‌কা পারিকে বলেছিল, 'পঞ্চেৎ থিক্যা ফিরি পড়াচ্যে দিদিমণিরা, মিঠুনকে ভত্তি কর্যা দে।'

'হঃ' পারি ঠোঁট উল্টায়, 'উ ত সাইকখরতার ইশকুল ব্যটে। আমাদিগকে যাথ্যে বলে নাই বুজি? তা লিখাপড়িতে কী চাকরি দিবেক? না দশটো হাত পা গজাবেক? মিঠুনকে তর জামাইদাদা বড় ইশকুলে দিবেক।'

অশ্‌কা নিজে কয়েক সন্ধ্যা যায়। ভাল লাগে না। লেখার পুরনো অভ্যাস ফিরে আসে না। ইংরাজি পইড়তে হব্যাক তবে ত ভাল মিকানিক, ভাল ড্রাইভার হবেক অশকা। আর

ইংরেজি পড়তে হবে বলে ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রকল্প থেকে বেরিয়ে আসে। উচ্চমাধ্যমিকে দুবার ব্যাক পাওয়া সুলেখা রাত্রের ইশকুলে বয়স্কদের সাক্ষর করার ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যায়। মেয়েরা বিশেষ যায় না। বাউরি মরদরা পছন্দ করে না এটা একটা কারণ আবার সারাদিন ঘরে বাইরে খেটে সইনঝাবেলিতে হাতেপায়ে ছাঁচি তেল লিয়ে টুকদু না বইসলে হয় না। আসলে এই সন্ধ্যাবেলাতেই বাউরি মেয়েবউরা বড় বেশি পারিবারিক হয়ে ওঠে। উনানশালে নিজেদের মত করে রাঁধাবাড়া করে, ছেলেপুলেকে দেখভাল করে, কোলেরটাকে আদব করে, কাঁধে ফেলে আস্তে দোলায়। চাপড়ায়। তখন কি ভাল লাগে লণ্ঠনের হলুদ আলোয় শ্লেটের ওপর পেনসিল দিয়ে অর্থহীন রেখা টানতে? ভাদুর নানা ব্যাপারে উৎসাহ। কি নাকি গরমেন্ট থেকে একবার 'নাসিং' আর "মিডোফারি" শিখাই গেল। তা গ্রামের কয়েক জনের সঙ্গে ভাদুও যায় ধাত্রীবিদ্যার প্রাথমিক পাঠ নিতে। কতটি টাকাও যেন পেয়েছিল ভাদু। ববিতা বলত, 'ও জেঠি কী শিখলি?'

'শিখি নাই কিছু।'

'ত পয়সা দিলেক?'

'হঁ।'

'উয়ারা বুঝে নাই?' ববিতা জিগ্যেস করে।

'না। কী বইলথ হটরমটর বুঝা যায় না। তা বইলথ বুঝেছ? বইলথুম হ অ অ। টেনিং হল্য ত পয়সা দিলেক।'

'কত?'

'মনে নাই।'

তা ভাদুও যায় ইশকুলে। সন্ধ্যাবেলাটা তার ভালই কাটে ঠিক সাতদিন। তারপর তার মনে পড়ে যায় মদের বিজনেসের কতা। তবে সে সাতদিনে দীর্ঘ-ঈ পর্যন্ত লিখতে শেখে। বাউরি মরদ, যারা একটু বয়স্ক ভল্যান্টিআরদের বলে মদ না দিলে তারা আসবে না। তবু এরই মধ্যে কেউ কেউ সত্যি নাম সই করতে শেখে; গ্রামের প্রাইমারিতে পড়েছে এমন দু-তিনজন কিশোর বানান করে সরকারি বই পড়তেও শিখে যায়।

পারি চলে গেলে অশ্‌কা আর সুখীর দিন যেন কাটে না। দিন যদিও-বা কাটে রাতগুলো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। যেদিন অশ্‌কা পয়সা পায় সেদিন ভালমত খাওয়া। সুখী সব বাড়িতেই আগাম নিয়ে রেখেছে। ববিতার বিয়ের ঋণ বাবদ মাস গেলে কাটা বেতনের পয়সা চলে যায় চাল ডাল তেল নুনের ধার শোধ করতে। সবটা শোধ হয়ও না আবার নতুন করে ধার হয়। মাসের অর্ধেক পার হলে আবার এটা সেটা বানিয়ে বলে কাজের বাড়ি থেকে পনের-বিশ টাকা চেয়ে পাঁচ-দশ টাকা আগাম নেয়া। তাতেও দারিদ্র্য বা অভাবটা মিথ্যে হয়ে যায় না। বড় বেশি করেই সত্যি থাকে।

এ ভাবেই চলে দিনগুলো। আবার এভাবে ত চালানো যায় না দিনগুলো। প্রতিদিন সকালে পেটভরতি খিদে নিয়ে অশ্‌কার জাগরণ। সেই খিদে যেদিন মেটে সেদিন তার

সমস্ত অনুভব তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। সেই অনুভবে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা গাঢ় হয়। তীব্র হয়। দুঃখ বঞ্চনাবোধ তীব্রতর হয়। যেদিন মেটে না সেদিন তার অনুভব ভোঁতা হয়ে যায়। কিংবা একটাই অনুভব থাকে। খিদে ছাড়া অন্য কোনো বোধ তার থাকে না। খিদে! খিদে! তার শরীর মন জুড়ে শুধু এক অতলান্ত খিদে থাকে।

মা বেটায় খালিপেটে খাটিয়ায় পাশাপাশি শুয়ে থাকে। মা ডাকে, 'অশ্‌কা? এ নুনা, ঘুমালি বেটা?'

ছেলে বলে, 'না।'

মা বলে, 'মাইন্দারি কইরবি?'

ছেলে বলে, 'উঁ ম্‌ম্‌ হুঁ, না।'

সুখী ঝেঁজে ওঠে, 'বাপের পারা হইচ্চিস ব্যটে! কুনোখানে ফিট হবি নাই। বাগালী গেল দকানের কাজ গেল ত খাবি কি?'

'রোডের কাজ ধইরব।'

'কে দিবেক তকে রোডের কাজ?'

'লীডারকাকুকে বল—উয়ার হাত আচে।'

'লীডার কি একার বিচারে চাকরি দিবেক? কত লক ঘুইরছে উয়ার কাছকে চাকরির লেগে।' একটু দম নেয় সুখী তারপর ওপাশ ফিরে বলে, 'বাবুঘরে কইরবি? কাজ? চখের ডাকতরবাবু দুশ টাকা বেতন দিবেক।'

'উ ত চাকরের কাজ মা।'

'তবে লহরাগে যা!' সুখী চুপ করে যায়।

একটু পরে, কতক্ষণ ও জানে না ওর চোখ জ্বালা করে। মৃদু নাক ডাকার আওয়াজে বোঝে মা ঘুমাইচ্যে। জবাদিদির কথা মনে পড়ে ওর। জবাদিদির মরে যাওয়া ঠিক হয় নি। কত খাত্যে খঁইজথ্য—চপ-জিলাবি-পাঁরুটি। দিদি ওর কথাটি বুঝত। পারিদি, ববিদি সব ওকে ভালবাসে কিন্তু ওর কথাটা বোঝে না। শাটিদি ত আসেই না। ওর শ্বশুরবাড়ির এগুতেই এন পি টি সি-র কাজ হচ্যে। ওখানে একটা চাকরি পেলে বেশ হত। কী ভারী ভারী গাড়ি! একটা গাড়ির সামনে একটা যন্ত্র মাটি কেটে আনে। ওটাকে কী বলে সমীরদা চিনুদাকে জিগ্যেস করতে হবে।

অশ্‌কা শব্দ না করে কপাট খুলে বাইরে আসে। রাত বেশ নিশুতি। দরজার ঠিক নীচে, উঠনে একটা কুকুর শুয়ে। বাদামি শাদা মেশানো লোম। রোজ খেতে পায়, পেট ভরে না হলেও, তাই অভ্যাসেই রোজ আসে। পায়ে পায়ে ঘোরে কখনো কখনো। বেশি রাতে অন্য কুকুরগুলো চিল্লালে রাস্তায় গিয়ে চ্যাঁচায়। কুকুরটাকে টমি বলে ডাকলে সাড়া দেয়।

আটত্রিশ

টমি সম্পর্কিত দু-চারটি কথা

টমির বয়স দুবছর। অশ্‌কার পেছন পেছন একদিন এই অ্যাত্তোটুকুনি কুকুরছানাটা চলে আসে। দেখতে মোটাসোটা, শাদার ওপরে বাদামি ছোপ, সবে মায়ের দুধ ছেড়েছে। ছানাটাকে 'আ তু তু' করে ডাকতে বাদামি শাদা ল্যাজ নাড়তে নাড়তে চলে আসে। কদিন পাড়ের দড়ি দিয়ে ছানাটাকে বেঁধে রাখে অশ্‌কা। তাতে সারারাত 'কেঁউ কেঁউ' করে কী পরিত্রাহী চিৎকার ওটার। যেন কলজেটা ওর ফেটে যাবে। ঘুমতে না পেরে সুখী ছেলেকে বকাবকি করল। তারপর দড়ি খুলে দিলেও ছানাটা রয়েই গেল। আধপেটা খায় বলে দিনমানে ঘুরে বেড়ায় আবার ওই আধপেটা খাওয়ার জন্যই ফিরে আসে।

দুবছরে কুকুরটা বড় হয়েছে ঠিকই, তবে ছোটবেলার মত গাবলা গোবলা ভাবটা আর নেই। কানদুটো খাড়া, বেশ বড় বড়। গলাটা সরু হওয়াতে মাথাটা বড় দেখায়। ল্যাজটা সত্যি সত্যিই লম্বা, না সরু বলে লম্বা দেখায়, এত লম্বা আর এত সরু যে ওটাকে কুকুরের ল্যাজ বলে মনে হয় না। মনে হয় একটা বড়সড় গিরগিটির ল্যাজ কুকুরটার পেছনে কেউ আটকে দিয়েছে। দুবছরে টমি কয়েকটা খেলা শিখেছে! বল, ন্যাকড়ার পুঁটলি এমনকি কাগজের গোল্লাও ছুঁড়ে দিয়ে নিয়ে আসতে বললে ঠিক নিয়ে আসবে। 'টা টা' বললে দরজায় দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়বে। মিঠুন যতদিন ছিল দিনের বেলায় কুকুরটা বাইরে বাইরে থাকত। মিঠুনের ঠেঙার বাড়ি খাওয়ার ভয়েই কুকুরটা একটু উঁকি মেরে ল্যাজ গুটিয়ে বাইরেই ফিরে যেত। তেমন করেই কুকুরটা, এ বাড়ির সবাই যেমন নিজের নিজের খাবার জোগাড় করতে বাইরে যায়, সেই অভ্যাসটা রপ্ত করে নেয়। ও যেন নিজে নিজেই বুঝে নেয় এ বাড়িতে টিকে থাকার এটাই প্রধান এবং প্রাথমিক শর্ত। কিন্তু এতসব গুণ থাকা সত্ত্বেও সুখী কুকুরটাকে দেখতে পারে না। কুকুরটা নাকি কুকুরের পারা লয়। অন্য কুকুর তেড়ে এলে পেছনের দুপায়ের ফাঁকে ল্যাজ ঢুকিয়ে, পিঠ বেঁকিয়ে, দাঁত বের করে চ্যাঁচাতে—বীরত্বের গর্জন নয় ভয়ের আর্তনাদ! কিন্তু নতুন মানুষজন দেখলে আবার একটুতেই আহ্লাদে চিৎ হয়ে শুয়ে চার পা উঁচু করে দেবে। সাহসের মধ্যে ইঁদুর মারা। বড় বড় মেঠো ইঁদুর মেরে বারান্দায় নয়ত উঠনের কোণে রেখে দেওয়া টমির স্বভাব। অথচ যে ইঁদুরগুলো কারো খাদ্য নয় সেই নেংটি ইঁদুরের পেছনে দৌড়বে না। সুখী কুকুরের মারা ইঁদুর দেখে আর বলে, 'লষ্ট! কেমন পিঁয়াজ রসুন দিয়া গুগুলির পারা ঝাল হত!'

এভাবে টমি খানিকটা পাড়ার কুকুর আর খানিকটা বাড়ির কুকুর হয়ে থাকে।

ঊনচল্লিশ

অশ্‌কার একাকিত্ব

কুকরটাকে দেখে অশ্‌কার হঠাৎ রাগ হয়। রাগের চোটে আচমকা লাথি কষায় ওটাকে। অশ্‌কা ভেবেছিল এমন হঠাৎ ব্যথা পেয়ে কুকুরটাকে স্বাভাবিকভাবেই ওকে কামড়ে দেবে। সেই ভাবনাতে লাথিটা মেরেই ও প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় একটা পেছু লাফ দেয়। কিন্তু কুকুরটা শুধু 'কেঁউ' করে শব্দ করে। ল্যাজ গুটিয়ে মাথা নিচু করে আড়ে আড়ে দেখে অশ্‌কাকে। কুকুরটা তেড়ে এল না দেখে, এমন ভয় পেল দেখে অশ্‌কার রাগ কমে না। আরো বেড়ে যায়। যেন কুকুরটা তেড়ে না আসা পর্যন্ত, প্রতিরোধে, প্রবল প্রতিরোধে প্রতি আক্রমণ না করা পর্যন্ত ওর রাগ পড়বে না এমন আক্রোশে এদিকে-ওদিকে তাকায়—দেয়ালের পাশে শুয়ে থাকা একটা গাছের ডাল পায়। ত সেটাকেই তুলে নেয়। সেটা দিয়ে এলোপাথাড়ি পিটায কুকুবটাকে। এমন আক্রমণে কুকুরটা তেড়ে আসার বদলে যেন হতভম্ব হয়ে খানিক মার খায় তারপব প্রবল আর্তনাদ করতে করতে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে মাটির দেয়াল ডিঙিয়ে, নালা পার হয়ে রাস্তার আধো অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

'শালা হারামীর বাচ্চা! নেমকহারাম!' ডালটা ছুঁড়ে ফেলে অশ্‌কা। যতখানি জোরে ছুঁড়লে ওটা উঠনের একপাশে পাঁচিল ঘেঁষে পড়তে পারে তার চাইতে অনেকটা বেশি জোরে ছুঁড়ে দেওয়াতে ডালটা পাঁচিলে লেগে ছিটকে উঠনের মাঝামাঝি পড়ে। পা দিয়ে ওটাকে ঠেলে দিয়ে ও দড়ির ফাঁস আলগা করে। বাঁশের দরজা খুলে রাস্তার ধারে শরীরের তরল নির্গত করে। ডালটা ছুঁড়ে ফেলার সময় অনাবশ্যক জোর দেওয়াতেই ওর রাগ খানিকটা কমে এসেছিল এখন হালকা হয়ে উঠনে দাঁড়িয়ে ওর অল্প শীত লাগে। আবার সেটুকুতে ওর শরীর, মাথা আর স্নায়ুর আরামও হয়। কপাল থেকে ঝাঁপানো চুল সরিয়ে ও আকাশে তাকায়। তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। পাতলা মেঘে ঢাকা গোটা আকাশে কোনো গাড়ির আলো দেখা যায় না। সব গাড়ি কি একসঙ্গে আলো নিভিয়ে দিয়েছে আজ? অথচ গোটা দুনিয়াটো তেমুন আঁধার দেখায় না ত! আবার কুহুরা যে লয় এটা ও বুঝতে পারে। গেল বছরে ফাস জানুয়ারিতে সমীরদার স্কুটারে চেপে ও চিত্তরঞ্জন গেল আর এল দিনের বেলায় লাইট জ্বালিয়ে। ওর মুখে 'কুহুরা' শুনে সমীরের কী হাসি! 'ব্যাটা ভূত, এটা মেঘ—দার্জিলিঙের মেঘ।' পাহাড়ের ওপরে দার্জিলিঙ। সমীরদা গেছে আর তাই সেই দার্জিলিঙের মেঘের ভেতর দিয়ে সমীরদা আলো জ্বালিয়ে গাড়ি চালাতে মজা পাচ্ছিল। 'রূপনারায়ণপুরে শালা দার্জিলিঙের ফগ্, ভাবা যায়?' চিনুকে বলে সমীর। চিনু কিছুতেই অবাক হয় না। 'এক সময়ে নকশাল ছিল ত, হেভি জ্ঞান আছে ওর।' এমনকি সেবার শিলাবৃষ্টিতে নিউমার্কেটের, অবশ্যই রূপনারায়ণপুরের নিউমার্কেট থেকে আরো ঢালে অনেকটা রাস্তায় বরফ জমে যাওয়াতে সমীর ছুটেছিল গাড়ি নিয়ে

আরো অনেকের সাথে। চিনু খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে বলেছিল, 'যা শালা গুলমার্গ দেখে আয়।'

সমীরদা সেই পাহাড়ে গেছে! সেখানে মেঘের ভেতরে হাত দিলে হাত ভিজে যায়, মেঘের ওপরে উঠে যায় রাস্তাগুলো—ঘুরে ঘুরে, ঘুরে ঘুরে। সে পাহাড় কত বড়ো? কতটা উঁচু অশ্‌কা জানে না—ও ত দেখেছে কানগোই পাহাড নামে টিলা। মাইথনের কাছে ছোট পাহাড়সদৃশ টিলা। মাটিতে দুই পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে মুখ উঁচু করে মেঘ দেখতে গেলে ঘাড় টনটন করে—অতটি উঁচা পাহাড়' তাহলে ত ওকে যেতেই হবে। পাহাড়ের আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে মেঘের মধ্য দিয়ে ভিজে ভিজে হেডলাইট জ্বালিয়ে ওর গাড়ি চলে যাবে দার্জিলিঙ। কিন্তু এখন ওর ভেতরে কী যেন একটা মেঘের মত জমে। মেঘের মত ওর সর্বাঙ্গ আবৃত করে। আর শেষে মেঘের মতই মেঘ হয়ে থাকতে পারে না—বাষ্প থেকে জলকণা। জলকণা থেকে বৃষ্টিবিন্দু হয়ে নেমে আসে—একেবারে জলপ্রপাতের মত ওর দু-চোখ দিয়ে অঝোবে ঝরে। ও দুই হাত তুলে মুখ ঢাকে। উঠনেই বসে পড়ে। জলধারা পড়তেই থাকে, শুধু মুখে হাত চাপা দেওয়াতে গোঙানীর মত আওয়াজ বেরয়।

অশ্‌কার এই অশ্রুপাতের প্রয়োজন ছিল। এমন নির্জন অশ্রুপাতের। এমন নিষ্ঠুর একাকিত্বে কান্নাই ত মানুষকে নতুন করে। এই কান্না কোনো পরাজয়ের চিহ্ন বহন করে না। নির্জনে অবগাহনের পবিত্রতা আনে বরং। প্রকৃতিতে এখন উত্তুরে বাতাসের দিন শেষ হয়ে আসছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত কান্নার পরে কান্নায় অশ্‌কার বিষাদ ঝরে, ক্রমে ঝরতে থাকে শোক, দুঃখ, হতাশা, ব্যর্থতা ও অন্ধকারের ভয়, অনিশ্চিতের আশঙ্কা। মাথায় হাওয়া লাগে। মায়ের স্পর্শের মত হাওয়া। সান্ত্বনার মত হাওয়া। ও হাঁ করে সেই বাতাস টেনে নেয়। যতখানি বাতাস ওর দরকার ততখানিই নেয়। দুই ফুসফুস টাটকা বাতাসে ভরতি কবে ও ঘরে গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

চল্লিশ

ললিতা

অশ্‌কাকে ললিতা বলে, 'তুই কাগজ কুড়াস না কেন? পলিথিনের পাকিট এককেজি চার টাকা—আমি কত কুড়াই। টিন, কৌটা, লোহা এসবের দর কম, তবে ওজনে ত বেশি হয়। ব্যাটাছেলে কাজকাম করবি না ত খাবি কি?'

বাউরিপাড়ায় ছেলেমেয়েরা দিনভর কত কি কুড়িয়ে বেড়ায়। স্কুলে যারা যায় তারাও কুড়ায়। যারা যায় না তারা ওই তিন-চার ঘণ্টা ফাউ পায়। সেইসব কুড়নো জিনিশ বেচে ওদের নিজেদের সাধ আহ্লাদ খানিক মেটে। লজেন্স, পাঁপড়ভাজা, কুড়মুড়ে বিস্কুট, কাটা নারকেলেব ফালি বা গোলাপী রঙের হাওয়াই লাড্ডু! ওদের মা-বাবারা এ পয়সায় ভাগ বসায় না। তাদের ছেলেমেয়েরা ত একটু গা হাত-পা ছাড়লেই খুঁটে খেতে শেখে।

ছেলেরা দোকানে নয়ত বাগালীতে ঢোকে—মেয়েদের চাকরি ত বাঁধাই—'বাবুঘরে পাট কইরথ্যে যেছি গঁ' এই চাকরি বাউরি মেয়েরাই দখল করে রাখে। দু-চারজন যায় পাথর মিশিন বা রোডে বা রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে হিশেবে কামিন খাটতে। ধান রোয়া আর তোলার কাজও থাকে, যারা বাবুঘরে খাটে তাদেরও কেউ কেউ উপরি রোজগার হিশেবে একদিন সবেতন ছুটি নিয়ে মাঠে যায়।

অশ্‌কার বয়সী ছেলেবাও বসে নেই। সুবল ওর নিজের পিসীর বাড়িতেই বাগালী করতে চলে গেছে। কতদিন করবে কে জানে—পয়সা-কড়ি ত পায় না, শুধু চারবেলা খাওয়া আর পুজোতে জামা প্যান্ট। আরো ডাগর হলে এতে চলবে না—বিয়্যা বইসবেক, তা বাদে মদের পয়সা ত গরু-মোষের পিছনে ছুটে পাওয়া যায় না। আজকাল অবশ্য বাগালীতেও পয়সা বেশি পাওয়া যায়—একবেলা মুড়ি বা ভাত পাওয়া গেলে ওতেই হপ্তায় একদিন নেশা করে বাকিদিনের অর্ধেক পেট ভরাবার পয়সাটা উড়িয়ে দেয়ার স্বাধীনতাটুকু অন্তত পাওয়া যায়। সেরকম একপাল গরু-মোষ নিয়ে সাতটার সময় উতাকে দেখা যায় রূপনগরের রাস্তা দিয়ে যেতে। বাঁকে করে জল দেবার কাজও হয়েছে বিস্তর। এত ছোট বড় হোটেল আর মিষ্টির দোকান আছে বলেই বিহার থেকে কিছু লোক এসে এ কাজটা দখল করে। তারা সব নাকি যাদব। তাদের হাতের জল নাকি বামুনরাও খায়।

এত লোক তাই এত জিনিশ, আর এত জিনিশ তাই এত দোকান। কাগজের ঠোঙা, শালপাতার ব্যবহার কমেছে। মাছের দামের ওপরে পয়সা লাগে না পলিপ্যাকে মাছের টুকরো দেয় মেছুনী। মিষ্টির দোকানে শালপাতার ঠোঙার বদলে, ভাঁড়ের বদলে ওই পলিথিনের প্যাকেটই দেয়। ফলে আগে যেমন প্যাকেট ধুয়ে যত্ন করে রাখা হত টুকটাক কাজে লাগবে বলে, এখন ইউজ অ্যান্ড থ্রো ডটের কায়দায় ফেলে দেওয়া হয়। আর মিহিজাম থেকে পর্যন্ত বস্তা ঘাড়ে ছেলেমেয়েরা আসে এইসব কুড়োতে। ছেলেই বেশি, বউ কয়েকজন আর ললিতার মত মেয়ে ওই এক ললিতাই, তাছাড়া ওর থেকে ছোট তিন-চারজন আছে। ললিতার বাড়ি কেলাহী—মিহিজাম ছাড়িয়ে। ললিতার ছিপছিপে অস্ফুট শরীর। ফরশা ঘেঁষা রঙ, মুখখানা যেন কেউ খুব যত্ন করে, ধ্যান দিয়ে তৈরি করেছে, এমন সুন্দর, এমন নিখুঁত যে সে যখন কোনো বাড়ির গেট খুলে ঢুকে এটা-ওটা কুড়িয়ে নেয় কেউ কিছু বলে না, এমনকি জল চাইলে 'কাকিমা' বলে, তার নাম-ধাম পরিচয় জানতে চায় অনেকে। নিজেকে বাপ-মা মরা ছোট ভাইয়ের একমাত্র দিদি বলে পরিচয় দিলে খানিকটা করুণা ফাউ পাওয়া যায়—কখনো গুড় মুড়ি, কখনো বাসী রুটি তরকারি, কখনো-বা একটা রঙজ্বলা ম্যাক্সি—এইভাবে সেই করুণা জোটে।

ললিতার মা নেই কথাটা সত্যি, ভাই আছে এটাও সত্যি, বিমল, ললিতার ছোটভাই-ই ত কুড়নো জিনিশগুলো আসানসোলে বিক্রি করতে যায়। তবে ললিতা বাদবাকি আর যা যা বলে তা সত্যি নয়। ললিতার বাবা আগে কয়লা চুরি করত। তখন ললিতার মা বেঁচেছিল আর একটা সাইকেল ছিল। এসব কাজ পেটের দায়ে অনেকেই

শুরু করে কিন্তু অনেকে আবার পারেও না। রাত থাকতে উঠে সাইকেল ঠেঙিয়ে অতটা যাওয়া, রোজই ত যেতে হয়, রোজ গেলেই যে রোজ বস্তা বোঝাই হবে আর সেই বস্তা পাহারা-টাহারা এড়িয়ে নিয়ে এসে বেচে দিতে পারবে এমন নয়, এটা জেনেই। তার ওপরে আছে ধরা পড়ার ভয়, জরিমানা দেয়ার ভয়, সাইকেল সিজ করে নেবার ভয়, ঠেঙানী খাবার ভয়, জেলখাটার ভয় এমনকি মরারও ভয়। তা কেউ কেউ মরেও যায়, তেমন পাহারাদার থাকলে। যে পাহারাদারের সাথে দেওয়া-নেওয়ার কথা, কোনো কারণে তার যদি ডিউটি বদল হয়, তখন ত বদলি পাহারাদার, বন্দুকের নিশানায় যদি পেয়ে যায় কাউকে ত মেরে দিতেই পারে। সবাই যে মেরে দেয় এমন নয়, গুলিফুলি চালালেও মানুষ নাও মরতে পারে, তেমনভাবে সরকারি বন্দুকের গুলি খরচ করে, অন্তত মানুষটাকে প্রাণে না মেরে যদি এইসব কাজ কারবার বন্ধ করা যায়, চাকরি রক্ষা করে এমন পাহারাদারও আছে। সংখ্যায় তারাই বেশি। কিন্তু এতসব ভয় নিয়ে টিকে থাকতে গেলে একটা মরীয়া ভাব দরকার সাহস যদি নাও থাকে। ললিতার বাবারও ছিল। নইলে মানুষটা ছোটখাট নিরীহ। বউ মরার পরেই, অসুখে অসুখে আর ঠিকমত ওষুধপথ্যি না পেলে মরে যাওয়া ছাড়া আর ত কোনো উপায় ছিল না ললিতার মায়ের, ত সেই মরতেই হবে এমন মরণে মরে যাবার পরে ললিতার বাবা একবার ধরা পড়ে। ধরা পড়ে সাইকেল যায়। মারও খায় প্রচুর, তারপরে সে আর ও লাইনে যায় নি।

সে তখন হাটে তরকারি বেচে। শাক বেচে। হাট ত সপ্তাহে মোটে একদিন। অন্যদিনগুলোতে সে রূপনারায়ণপুরে বাজারের ঢোকার মুখে, রাস্তার ধারে চট পেতে শাক, তরকারি বিক্রি করে। ছেলেমেয়ে কী করে সে অত খোঁজ রাখে না। ভোরে উঠে সে তার ছোট খেত থেকে শাক, বেগুন, লঙ্কা, এইসব তোলে। ঢ্যাড়শ আর কুমড়োও হয় ওই একফালি জমিতে। সারাবছর কিছু না কিছু ত হয়। বেশি হয় না অবশ্য। সেই সব্জি আর শাক তুলে সে ঝুড়ি বোঝাই করে। ললিতা চা মুড়ি নয়ত রুটি দেয়। যেদিন দেরি হয় সেদিন বাসের ছাদে চাপে। তা হলেও মিহিজাম পর্যন্ত হাঁটতে হয় ওকে। অবশ্য সকালবেলা ঝুড়িটি কাঁধে বা মাথায়, চারপাশে গাছগাছালি, পাখির ডাক, হাওয়া, এসবের মাঝখান দিয়ে হেঁটে আসতে তার ভালই লাগে। শুধু মনে হয় পায়ে টায়ারের চটির বদলে যদি হাওয়ায় চপ্পল থাকত! যেদিন সঙ্গী হিশেবে ওরই মত খুচরো তরকারি বেচনেআলা আরো দু-চারজন জুটে যায় সেদিন গল্প করতে করতে রূপনারায়ণপুর পর্যন্তই হেঁটে আসে।

ললিতা আর বিমল বেরয় আর একটু পরে। ওরা কোনোদিন চা মুড়ি বা রুটি খেয়ে বেরয়। কোনোদিন গেরস্তবাড়িতে চেয়েচিন্তে খায়। কিন্তু সেভাবে ত পেট ভরে না। যেদিন খুব খিদে থাকে, মানে খিদেটা মরে না, থেকেই যায় সেদিন ওরা ঠ্যালাআলাদের কাছে কিছু মাল বেচে দেয়। তাছাড়া রূপনারায়ণপুরেও এখন এসব কেনার লোক আছে। সেই টাটকা পয়সায় ওরা দোকানে চা পাঁউরুটি ঘুগনী খায়। পয়সা বাঁচলে দোকানে কেনাকাটা করে। ললিতাকে বাসভাড়া দিতেই হয়—বিমল পেছনে ঝোলে। তেমন

বুঝলে নেমে যায়। আবার ঝোলে।

ললিতার সাথে অশ্‌কার আলাপ হয় স্টেশনে। বিমল আর অশ্‌কা ওভারব্রিজে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। বিমল সেদিন প্রথম খেল। অশ্‌কা সিগারেট, মাঝে মধ্যে খেলেও বিড়ি টানার হাতেখড়ি সেদিন। দুজনেরই খুব খারাপ লাগছিল, কিন্তু কষ্টের পয়সা দিয়ে কেনা বলে দুজনেই ছাড়তে পারছিল না। দুজনের কেউ কাউকে চেনে না তবু বিড়িতে টান দিয়ে বারকতক কাশার পরে দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে।

'আজই ফাস্‌ট্‌ খেলি?' অশ্‌কা জিগ্যেস করে। বিমল মুখ টিপে হাসে আর মুখ টিপেই বলে, 'ম্‌হুঁ।'

'তালে কাইশলি কেনে?'

'বললাম ত আজ ফাস্‌ট্‌ খেলাম।'

আলাপ কিছুটা এগবার পর ললিতা আসে। অশ্‌কা উঠে পড়ে, 'আমি ঝাই।' বিমল বলে, 'যাবে কেন? আমরাও যাব—একসঙ্গে যাব', ললিতার দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমার দিদি। লজ্জা কোরো না, খুব ভাল।' ললিতা ভাবে আর একজন বুঝি তাদেরই মত। সে খুব একটা খুশি হয় না। অশ্‌কাকে বলে, 'তোমার মাল কই? কোথায় বেচ?' অশ্‌কা জবাব দেবার আগেই বিমল চেঁচিয়ে ওঠে, 'ও কুড়ায় না। বেচেও না! কী মজা!'

ললিতা সরু চোখে অশ্‌কাকে দেখে তাতে ওর ভুরুদুটো ওপরে উঠে যায় আর ঠোঁটের কোনা এমন বেঁকে যায় যে অশ্‌কার শরীর এক অজানা অস্বস্তিতে ভরে ওঠে—'তুই কী করিস?' ললিতা বলে।

'যেদিন য্যামুন কাজ পাই করি। মজুর খাটি।'

'কাজ না পেলে?'

'ঘরকে থাকি।'

'খাস না?'

'থাকলে খাই।'

'ঘরে কে আছে?'

'মা আচে।'

'বাবা? ভাই, বোন?'

'বাবা মর‍্যাচে ঢের দিন হল্য। তিন বড়দিদি শ্বশুরঘরকে আছে। তা বাদে আর এট্টা দিদি ছিল।'

'কী হয়েছিল?'

'টিবি ব্যাটে।'

এরপর ললিতার আর কিছু জিগ্যেস করবার থাকে না। জানবার থাকে না। বরং জানাবার ইচ্ছে হয় তার। এসব কথা বাবুদের বাড়িতে তাকে বলতে হয় এক আধদিন, তার চোদ্দ বছরের জীবনকাহিনী। সে কাহিনী এমনিতে করুণ হলেও বাবু-কাকিমাদের করুণা উদ্রেক করার মত যথেষ্ট করুণ মনে হয় না তার নিজের কাছে। তাই সে জীবিত

বাবাকেও মৃত বানিয়ে নিজে অনাথ হয়ে যায়। আর তার নিজের বানানো জীবন চরিতটা তার এত পছন্দ যে সে নিজেও ভাবে নি এই অচেনা ছেলেটার কাছে সে তার বানিয়ে তোলা নয়, বাস্তবতার তৈরি হতে থাকা জীবনচরিত। যেটুকু এখনো পর্যন্ত সে জানে, বলে ফেলার তাগিদ অনুভব করবে। এই ছেলেটা ওর বাবার মরণ, দিদির মরে যাবার কথা কেমন অবলীলায় বলে গেল ত ললিতা বলতে পারবে না তার মায়ের অমন মরে যাবার কথা? মা জানত মরবে, বাপেও জানত, কিন্তু বিশ্বাস করত না—ললিতা বিমল কেউই জানত না। জানবার মত বয়স হয় নি বলেই জানত না।

অশ্‌কাকে এইসব শোনানোর পরে ললিতা বলে, তুই একটা বস্তা আনবি—'এই রকম,' ও নিজের বস্তাটা দেখায়, অশ্‌কা সেদিকে উদাস তাকিয়ে বলে, 'অত বড় চিকচিকি ঘরকে নাই।' 'নাই ত কিনবি। ললিতা নিজের বস্তাটা ভাঁজ করে মাথায় চাপায়। নীচে স্টেশনে ঘণ্টা বাজে। বিমলও ওকে নিজের বস্তা বগলে নিয়ে। বলে, 'আজ গাড়িতে যাব।'

ওরা নেমে গেলে অশ্‌কা দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। ওভারব্রিজের ওপর থেকে ট্রেন দেখতে ওর খুব ভাল লাগে। কতদূরে চলে যায় ট্রেনগুলো। সব গাড়িই কি কলকাতা থেকে আসে? আর উধারের সব গাড়িই কি কইলকাতা যায়? কোন গাড়ি দিল্লি যায়? বোম্বাই যায় কোন টিরনটো? ট্রেনটা এসে পড়ে হুইশ্‌ল দিতে দিতে। স্টেশনের ঢোকার আগে ট্রেনটা একদিকে কাত হয়ে দোল খেতে খেতে ঢোকে। অশ্‌কা এখনো ট্রেনে চাপে নি।

ওভারব্রিজ থেকে নামতে নামতে ওর মনে পডল ললিতা কোথায় থাকে জিগ্যেস করা হয় নি।

একচল্লিশ

রাজীব গান্ধীর হত্যা ও অশ্‌কার খিদে

অশকাকে দেখে মিঠুন ছুটে আসে—'মামা! মামা!' গেটের কাছে অশ্‌কা দাঁড়িয়ে, একটু অপ্রস্তুত হাসি তার মুখে। সে আজকে ঘুরতে ঘুরতে এদিকে এসে পড়েছে। এই বাগানঅলা বাড়িতে পারি কাজ করে ও জানত না। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দেখল বাগানে ঘাস আর আগাছা, তাই সে হাঁকতে যাচ্ছিল—'বাগান সাফ করাবেন বাবু?' মিঠুন দৌড়ে এল। বলে, 'মামা ভিতরকে আয়। কতটি দড়া মেরাচি দেইখবি।' অশ্‌কা ইতস্তত করে। পারি ছেলের গলা শুনে এদিকে আসে, হাতে বালতি। অশ্‌কাকে দেখে বলে, 'তুই?'

'কাজে যেছিলাম ত মিঠুন হাঁকাইল্যেক।'

'কাজ পালি কিছু?' খোঁপা থেকে একটা বিড়ি বের করে পারি, মিঠুনকে বলে, 'কাকিমার কাছকে মাচিস লিয়ে আয়।'

এক হাতে খুলে খুলে পড়া প্যান্টটা ধরে মিঠুন ছুটে যায়। অশ্‌কা একটু অবাক হয়। তাদের পাড়ার কোনো কোনো মেয়ে বিড়ি খায় কিন্তু সুখী, ববিতা, শাটি খায় না। পারিদিও খেত না। মুখে ও কিছু বলে না।

'পাছি কই? বাবুদের জিগাস কর বাগান সাফ করাবেক কিনা।' 'ডাঁড়া।' বলে পা বাড়াতে গিয়েও থমকে যায় পারি। বাবুরা সোব টিভি দেইখচ্যে কাল রাজীব গান্‌ধি মাডার হইচ্যে—আজ তর কাজ হব্যাক নাই ভাই।' মাডার! খুন! রাজীব গান্‌ধি! অশ্‌কা কেমন হতভম্ব হয়ে যায়। এগুতে যে ভুট হল্য তাথে দিয়ালে উয়ার ফটোক ছিল। তখন অশ্‌কা প্রধানমন্ত্রীকে চিনত না। ভোটের পবে পরাজিত প্রধানমন্ত্রীর ছবিটা এই এক বছরে রোদে জলে বিবর্ণ হয়েও ঝুলছিল কোনা ছেঁড়া অবস্থায়। কদিন আগেই আসানসুলে রাজীব গান্‌ধির মিটিং ছিল নাকি আবার ভুট হব্যাক। সমীর যাচ্ছিল সেই মিটিং-এ গগনের মিস্ত্রির রাজদূতের পেছনে বসে। অশ্‌কা দেখে বলে, 'কিরে ব্যাটা ভূত যাবি নাকি?'

এসব ওদের মজাকী অশোক জানে। ও দুহাত তুলে বলে—'রোককে, রোককে!' সমীর কী বলে বোঝার আগে প্রবল গর্জনে গাড়ি বেরিয়ে যায়।

একটা কাগজে অনেকগুলো মরা ডেঁয়ো পিঁপড়ে নিয়ে মিঠুন আসে। পারি দেশলাই নিয়ে বিড়ি ধরায়। অশ্‌কা বলে, 'কী দিয়্যা মাইরলি?' 'এই ঠ্যাঙ্গাটো দিয়্যা' মিঠুন একটা ছোট লাঠি দেখায়। ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় শোনা যায়, 'বউ চা নিয়ে যাও।'

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে মিঠুন বলে, 'চুপ্‌ মামা, রাজীব গান্‌ধি মাডার হইচেঁ চিঁচ্যাস না। চা লিয়ে আসি।'

দুহাতে একটা বড় বাটি, মাঝখানে অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাশে চা, ধরে মিঠুন পাদুটো একটু বেশি ফাঁক করে আস্তে আস্তে হাঁটে। চোখদুটো বাটিতেই যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ওই বাটি ছাড়া আর কিছুই দেখার নেই। ওভাবে হাঁটাতে ঢলঢলে প্যান্টটা কোমরের ঠিক নীচে আটকে থাকে আর চায়ের গ্লাশও সোজা থাকে।

পারি চায়ের গ্লাশটা তুলে নেয়। ভাইকে বলে, 'চা খাবি?' এমনভাবে বলে যেন নিজের বাড়িতে বসে বলছে। অশ্‌কা 'না' বললে, সে হঠাৎ গলা তুলে ডাকে, 'রেখা? রেখারে, ইদিকে আয়।' কুয়োপাড়ে একরাশ এঁটো বাসনের মাঝখানে বসে রেখা মাটি দিয়ে একটা বাটি মাজার চেষ্টা করছিল। মায়ের ডাক শুনে সে তার ঈষৎ ব্যাঁকা সরু পা দুটোর এলোমেলো পদক্ষেপে চলে আসতে থাকে। পাতের ভাত মুঠোতে নিয়ে ডাকলে যেমন টমি আসে, অশ্‌কার টমি, অবিকল সেই ভঙ্গিতে 'দা, দা, দা, দা' বলতে বলতে মুখে হাতে সর্দি আর কাদা মাখিয়ে পুরনো লাল ড্যাঙ্গিং ফ্রক উড়িয়ে রেখা আসে। এসেই বাটিতে হাত দেয়। মিঠুন, ইতিমধ্যেই তার একটি রুটি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, রেখা দ্বিতীয়টি তুলে নিলে সে বলে, 'দে?' উত্তরে রেখা রুটিটা দুহাতে নিয়ে মুখটা সরিয়ে একটা তীব্র চিৎকার দেয়। পারি বলে, 'চিঁচ্যাস না, কাকু বইকবেক।' মিঠুন একটু সরে যায় তারপর কোমরে দুহাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, 'ঠিক তিনবার বইলব। আমি মিঠুন বটি,

গুলি চালাই দিব্য না দিলে।' রেখা ওর দিকে তাকায়। ওর চোখে চোখ রেখে মিঠুন বলে, 'দেগা? থাড! দেগা? থাড! দেগা? থাড়!' মিঠুন বলে যেতেই থাকে। পারি ওর হাতের আধখাওয়া রুটিটা দিলে ও চুপ করে।

অশকা বলে, 'মিঠুনকে ইশকুলে দিলি না দিদি?' পারি কিছু বলবার আগেই মিঠুন বলে, 'ইশকুলে যাব নাই।' 'কেনেরে?' 'চা-রুটি পাব নাই ইশকুলে গেলে।'

নিচু হয়ে রেখাকে কোলে তুলে নেয় অশ্‌কা। কাঁধের গামছাটি দিয়ে সর্দি মুছিয়ে দেয়। চুমু খায় গালে। মিঠুনকেও চুল ঝাঁকিয়ে আদর করে। 'গেটটো লাগাইদে', বলে ও বাইরে যায়। আস্তে আস্তে ডাবরমোড়ের দিকে হাঁটে।

ডাবরমোড়ে আসতে আসতেই অশোক দেখে রোডে গাড়ি 'জামপ' হই গিইচোঁ। যেন ওর স্বপ্নের সব গাড়ি আকাশ থেকে নেমে এসেছে। যেন কেউ মন্ত্র পড়ে থামিয়ে দিয়েছে গাড়িগুলোকে। গাড়ির পর গাড়ি—বাস, টেম্পো, ডাম্পার, ট্যাক্সি, অয়েল ট্যাঙ্কার, জলের গাড়ি, লরি, ট্রাক, ট্রেকার, জিপ, অটো সব চুপ—যেন যতদূর দেখা যায় গাড়ির হাট বসে গেছে। কিংবা গাড়ির মেলা। কিন্তু হাটও নয় মেলাও নয়। সেখানে মানুষজন থাকে। হাসিমশকরা চিৎকার, হুল্লোড় থাকে। এখন ত সকাল আটটাও বাজে নি ডাবরমোড়ের চারদিকে যে রাস্তা চলে গেছে সেইসব রাস্তার যতদূর দেখা যায় ছবি হয়ে গেছে। টিভি-তে এমনটি হয় অশ্‌কা দেখেছে। খেলাতেও হয়, সিনমাতেও হয়। একটা দিনে লোকগুল্যান চইলছে ফিরচে হঠাৎ 'ইশটপ' হয়্যা যায় যেন ফটোক। এও যেন তাই। এখানে-ওখানে মানুষ জটলা পাকিয়ে আছে—নির্বাক। বাস স্ট্যান্ডের পাশে শাদা কাপড়ে ঢাকা একটা বেদি তাতে রাজীব গান্ধির হাসিমুখের ছবি ফুলে, মালায়, চন্দনে। যুব কংগ্রেসের ছেলেরা এক দুজন নিচু স্বরে এক আধটা কথা বলে বাকিরা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। তাদের কারো কারো চোখ আরক্ত ও স্ফীত।

রাস্তার দুধারে দোকানপাট বন্ধ। অশ্‌কা নীরবে হেঁটে যায়। এবার ভোটের দিন ও ভোট দেবার আপিশে যায় নি। যায় নি কারণ ওর দিদিরা যে যার ঘর থেকে এসে ভোট দিয়ে গেছে। দিদিরা আসে নি বলেই ও রোজকার মত কাজের ধান্দাতেই বেরিয়েছে। ওর কাছে ত সপ্তাহের প্রতিটা দিনই একরকম। কোনো একটা দিনও অন্য একটা দিনের থেকে তেমন করে আলাদা নয় যে ও আলাদা করে মনে রাখবে। তাছাড়া ওর নাম ভোটের লিস্টে নেই। অশ্‌কার ভোট নেই তাই ভোটের, দেশজুড়ে ভোটের দ্বিতীয় পর্বের আগে পরাজিত প্রধানমন্ত্রীর এ হেন মৃত্যুও কোনো বিশেষ তফাত আনে না ওর আজকের এই দিনটিতে। তবু ত ও বেদনা বোধ করে। অশ্‌কার যদি ভোট থাকত তাহলেও ওর দিন এমনিই কাটত। তাহলেও ওর এই বেদনা—মৃত্যু মাত্রেই যে বেদনা জাগায়, থাকত। কিন্তু এসবের মাঝখান দিয়ে, এই আপাত নিশ্চলতার মাঝখান দিয়ে ও হেঁটে যায় এমন উদাসীনতায় যেন শান্ত এক নদীর নীরবে বয়ে যাওয়া। এত নীরবে যে ওপর থেকে দেখলে এই বহমানতা বোঝা যায় না। কিন্তু এই নিরাসক্তি আর বেদনার সঙ্গে সঙ্গেও এক দংশন টের পায়। এই দংশন ওর শরীরের ভেতরে। কাল সুখী কাজে

যায় নি। অশ্‌কাকে বলেছিল বাবুঘর থেকে পয়সা আনতে, ও যায় নি। বাড়ি যেতে যেতে ও ভাবছিল দিদির চা রুটি খালুম না কেনে?

বেয়াল্লিশ

শোকমিছিল

সন্ধের একটু পরে ও বাজারে যায়। বিকেল বিকেলই রেখা মিঠুনকে নিয়ে পারি চলে আসে মায়ের কাছে। চাল, ডাল, তেল, মশলা আধখানা কুমড়ো ছাড়া কাজের বাড়ি থেকে পাওয়া একবাটি ডাল আর একটা পেঁপে--থলে বোঝাই করে মিঠুনের মাথায় চাপিয়ে রেখাকে কোলে নিয়ে এতটা পথ হেঁটে হেঁটে আসে। ভাইকে দুটো টাকা দিয়ে বলে, 'হাপকিলো আলু আন্যে দে।'

আলু গ্রামের দোকানে পাওয়া যায় ত দোকান বন্ধ। জগন্মাতা ভাণ্ডার বন্ধ। বিজয় পালের দোকান বন্ধ। অশ্‌কা তাই বাজারে যায়। গিয়ে দ্যাখে ছেলেরা বলছে, 'দোকান বন্ধ করো, দোকান বন্ধ করো।' মাটিতে বস্তা পেতে বসা খুচরো সবজিআলারা তাদের বস্তা গুটিয়ে ফেলছে। গুমটি দোকানগুলো একটা বাদে সব ঝাঁপ ফেলা। সেই দোকানের বাল্বটা রুমাল দিয়ে ধরে একজন খুলে নিলে জায়গাটা আধো অন্ধকার হয়ে যায়। 'তাড়াতাড়ি কর ফণী ঢের বেচেছিস, আর না।' মুখ দেখা না গেলেও গলা শুনে অশ্‌কা বোঝে পঞ্চায়েতের বলাই মণ্ডল ওদেব গেরামেরই ব্যটে। সে থলিটা বাড়িয়ে দেয়, 'কাকু আমাকে হাপকিলো আলু।'

'এঁকে দিয়ে দাও ফণী, ওজন করতে হবে না ' বলে বলাই নিজেই আলু তুলে পাশে এক মহিলার বাড়ানো থলেতে ফেলতে থাকে। ফণী চট করে থলিটা তুলে হাতের আন্দাজে ওজন বুঝে দুটো আলু তুলে নেয়। মহিলা, নিজেই চারটে কাঁচকলা নিয়ে নেন। বলেন, 'কত দেব?'

'সাত টাকা।'

'কত করে নিলে?'

'আলু ছটাকা, কাঁচাকলা চার টাকা।'

'এ্যাত?'

'আসানসোলে আলু আট টাকা কিলো।'

ফোনে খবর আইসচ্যে আসামসুলের। অশ্‌কা মনে মনে ভাবে। 'কাকু হাপকিলো আলু দ্যান।'

'বাড়িতে আয় দেব। এত লোক, এদিকে দোকান বন্ধ করার হুড়াহুড়ি, যা ভাগ্‌।' ঝাঁপ ফেলে দিলে আরো অন্ধকার হয়ে যায় জায়গাটা। ভিড় ঠেলে শূন্য থলি নিয়ে অশ্‌কা বাজারের গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে থমকে যায়। রাস্তাটা

পেরতে পারে না। আধো অন্ধকারে একটা মিছিল চলেছে। দোকানপাট বন্ধ বলে ও অন্ধকারে লোকগুলোর মুখ দেখতে পায় না শুধু চলাটা দেখতে পায়। শরীরের আকৃতি খানিকটা বুঝতে পারে বলে মিছিলে বালক আছে বোঝে। যুবক আছে বোঝে। বয়স্ক মানুষ আছে বোঝে। শুধু পুরুষমানুষই আছে এটাও বোঝে। কিন্তু কিসের মিছিল সেটা বোঝে না। কেননা, এ মিছিলে ধ্বনি নেই। পতাকা নেই। আকাশে উদ্যত কোনো মুষ্টি নেই। এ রাস্তায় বসতবাড়ি কম তবু কোনো কোনো বাড়ির জানলা দিয়ে ছিটকে আসা আলোয় মিছিলের মানুষের বুকে আঁটা কালো ব্যাজটি দেখা যায়। সবার দেখা না গেলেও অশ্‌কা বোঝে সবার বুকেই ওই কালো কাপড়ের টুকরো আটকানো আছে আর ওই কালো কাপড়েই মিছিলের ধ্বনি আছে। ও ডাইনে তাকায় মিছিলের শুরু দেখতে পায় না। বাঁয়ে তাকায় মিছিলের শেষ দেখতে পায় না। ধ্বনিহীন এই মিছিল এমন নিঃশব্দে চলে যে সমবেত পদধ্বনিও সেই নৈঃশব্দ ভাঙতে পারে না। সমবেত পদধ্বনিও নৈঃশব্দের প্রতিধ্বনি হয়ে ওঠে এমন সাবধানে পা ফেলায়। এমন সতর্কতায় পা তোলায়। এই নৈঃশব্দেই মিছিলটা সমবেত হয়েও এত ব্যক্তিগত হয়ে ওঠে। মিছিলের সব মানুষই যেন এক ব্যক্তিগত শোক ও ধিক্কার বহন করে চলে। কোনো ব্যক্তির জন্য শোক নয়, মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস হারাবার শোক। কোনো ব্যক্তিকে ধিক্কার নয়, এই বিশ্বাসের মর্যাদা না রাখার জন্যই এক আত্মধিক্কার।

এই নীরব শোক ও ধিক্কারে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। আকাশ কালো হয়ে যায়। রাস্তার দুধারে দাঁড়ানো লোকেরা জিগ্যেস করতে সাহস পায় না কোথা থেকে এল এই মিছিল যেন দাঁড়িয়ে থাকলেও তারাও এই মিছিলেব অংশ। যেমন মিছিলের মানুষের একটাই রঙ ছিল—কালো, তেমনি দাঁড়ানো মানুষজনেরও একটাই শব্দ ছিল—নীরবতা। সব বঙ মিলেমিশে যায কালোতে। সব ধ্বনি প্রতিধ্বনি খোদিত হয়ে যায় নীরবতায়।

কিন্তু অশ্‌কা ত এই মিছিলের কেউ নয়। ও যদি মিছিলে চলত তাহলেও কেউ হয়ে উঠত না। এই মিছিল ওর জন্য নয়। ও-ও এই মিছিলের জন্য নয়।

তাই মিছিলটা চলে না যাওয়া পর্যন্ত শূন্য থলি নিয়ে ও অপেক্ষা করে। ওকে অপেক্ষা করতেই হয়।

দুপুরে খেয়েছিল বাসী রুটি আর আলুর দম। চা। বাত্তিরে দিদি রান্না করলে দেড়দিন পরে ডাল আর ডিংলার ঝাল দিয়ে পেট ভরে ভাত খাবে অশ্‌কা।

তেতাল্লিশ

অশোককুমারের অসহায়তা

সমীর খাটিয়ায় বসে চা খাচ্ছিল। দোকানগুলো বন্ধ বলে স্টোভে চা বানায়। রুস্তম আর লালু খায় মাটির ভাঁড়ে। সমীরেব গেলাশ আছে। চিনু খুব অসুস্থ। কলকাতায় কোনো নার্সিং হোমে নাকি ভরতি আছে সমীর ঠিক জানে না। চিনুর বাবা রেলের ডাকতার

ছিলেন, চিনুর রাজনীতি করা তিনি পছন্দ করেন নি, কিন্তু ছেলেকে আটকাতেও পারেন নি। পুলিশ হেফাজত থেকে ছেলেকে ছাড়িয়ে রাতারাতি পাহাড়ি শহরের কলেজে ভরতি করেন। চিনু পরীক্ষা না দিয়ে পালিয়ে এল দুবছর বাদে। সঙ্গে মদের নেশা। সমীরের সঙ্গে এই গ্যারেজের কাজ নিয়ে আলাপ। বন্ধুত্ব। অথচ চিনুর বাবা চান না সমীর চিনুব নার্সিং হোমের ঠিকানা জানুক। যদিও চিনু রক্তবমি করলে সমীরই ওর বাড়িতে খবর দেয়। এই নার্সিং হোমে ভরতি করে। যে দু-তিনদিন চিনু এখানকার নার্সিং হোমে ছিল দুবেলা দেখতে গেছে। কেউ না বললেও রাতে থেকেছে। নার্সিং হোমে সবাই ওদের চেনে বলেই হয়ত চিনুর বাবা আগ্রহ না দেখালেও আপত্তি করেন নি, কিন্তু চিনুকে কলকাতায় নিয়ে যাবাব পরই উনি যেন সমীরকে চিনেও চেনেন না। এর কারণটা অবশ্য সমীর আন্দাজ করতে পারে। চিনু গ্যারেজে কাজ করলেও চেহারায় মিস্ত্রি মজুরের আন্দাজ আসে না। সে ধবধবে পাজামা পাঞ্জাবি পরে যখন কাজ থাকে না। কাজের সময় দামি জিনস্-এব শার্ট প্যান্ট পরে। মাথায় সামান্য টাকের আভাস, তার চেহারার মধ্যে একটা গাম্ভীর্য এনে দিয়েছে। মোটকথা চিনুর চেহারা ভাল, পোশাক ভাল আর তার পয়সা আছে। সমীরেরও আছে তবে সমীরের লম্বা চওড়া চেহারায় এই সাত-আট বছরেই কেমন মিস্ত্রিমজুরের ছাপ পড়ে গিয়েছে। অথচ সে মিস্ত্রি বা মেকানিক হবার জন্য বাঁকুড়া থেকে এখানে আসে নি। বাঁকুড়ায় তার বাপ-কাকাদের যৌথ পরিবার। সে পরিবারের প্রধান বন্ধন জমি। সেই বন্ধনে তার ব্যাঙ্কে চাকরি পাওয়া দাদাও বাঁধা। সমীর দুর্গাপুর থেকে আই টি আই পাশ করবার পর এই গ্যারেজের মালিক কাদেরশাহেবের সঙ্গে এইখানে আসে। কাদেরশাহেবেব জামাই সমীরের একবছর আগে পাশ করে। দুজনকেই উনি চাকরি পাইয়ে দেবেন বলে নিয়ে আসেন। ইনটারভিউ হয়। চাকরি পায় কাদেরশাহেবের জামাই। সমীরও পায় তবে কারখানায় নয়—কাদেরশাহেবের গ্যারেজে। পাশ করা মেকানিক বলে পুরো গ্যারেজটার দেখভালের দায়িত্ব ওকে ছেড়ে দিয়েছেন কাদেরশাহেব। সমীর একটা লরিও কিনেছে বছরতিনেক হল। বছরে একবার বাড়ি যায়। বাড়িতে ওর ভাল লাগে যেমন, তেমনি আবার অস্বস্তিও লাগে। ও বেশি কথা বলে না সেখানে যেন এই ভয়ে যে কথা বললেই পেট্রল, ডিজেলের গন্ধ বেরবে। অথচ এখানে হোটেলের ভাত তরকারি খেতে খেতে মায়ের হাতের পোস্তর বড়ার কথা মনে পড়ে। গাড়ি চালাতে চালাতে দাদার ছোট্ট মেয়েটার মুখ মনে পড়ে। কাকিমার বোনা পুলওভারটা গায়ে দিলেই কানের কাছে বেজে ওঠে কাকিমার গাওয়া গানের প্রায় ভুলে যাওয়া কোনো কথা বা সুর। 'এ শালা ভদ্রলোকের জায়গা না!' কথাটা ও প্রায়ই বলে আর মনে মনে হিশেব করে আর কতদিন ওকে এইভাবে থাকতে হবে।

ওর লরির নাম 'বাবাই'—ওর ছোটকাকার অকালমৃত ছেলের নাম। আজ 'বাবাই'-এর কাজ নেই তাই ও ওটাকে চান করাবে। লরিটার গায়ে হাত বোলায় ও—'কাল ব্যাটার বড্ড ধকল গেছে।' বালি তুলতে গিয়ে ভিজে বালিমাখা হয়ে আছে বডিটা। চিনু নেই, থাকলে ও স্টিয়ারিং ধরে বসত সমীর ধুত। এখন ও অশকাকে বলে,

'কলে জল এসেছে কিনা দেখে আয়, গাড়িটা ধোব।'

অশকা লম্বা পাইপ দিয়ে জল ছিটিয়ে 'বাবাই'-কে চান করায়। সমীর ন্যাকড়া দিয়ে কাদা ওঠায়। একটু পরে সমীর গাড়িতে উঠে ওটাকে আগুপিছু করে। সর্বাঙ্গ ধোওয়াতে লরিটাকে একটা জ্যামিতিক ক্ষেত্রের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থানে, কখনো এগিয়ে, কখনো পেছিয়ে কখনো এদিকে কখনো বা ওদিকে ঘোরাতে হয়। সম্পূর্ণ ধোওয়ানো হলে সমীর নিজেও চান করে। ভেজা শার্ট প্যান্ট দলা করে রাখে পাশের সিটে। অশ্‌কাকে বলে, 'কাজ আছে, উঠে আয়। '

এক মিনিটও লাগে না ওরা গ্যারেজে পৌঁছে যায়।

আজ অশ্‌কা কাজ পায় নি। সকালে চা মুড়ি খেয়ে বেরিয়েছিল। পেটে সাতমাসের বাচ্চা নিয়ে পারি মাসখানেক হল মায়ের কাছে। তার দিন কুড়ি আগে রেখা মারা যায়। পেটে বাচ্চা নড়েচড়ে, পারি ওই একচিলতে উঠনে পা ছড়িয়ে বসে বিনবিন করে মরা মেয়েব জন্য কাঁদে। তার ড্রাইভার স্বামী ত অনেকদিনই তার ঘরে আসে না। সুখী বলে, 'উ হাবামজাদাকে ঘরকে ঢুকতে দিব্য না। তু ইখানকেই থাক।' পারি ঘরটা ছেড়ে দ্যায়। রেখা এমনিতেই কমজোরী ছিল, তার মরণটাও হঠাৎ, কোনো শোরগোল না তুলেই ঘটে যায়। খেলতে খেলতে পড়ে যায়, তাতে পারি বিচলিত হয় না। মাথায় চারটে সেলাই পড়ে যখন রক্ত বন্ধ হয় না বলে তখন সে ডাক ছেড়ে, গলা ফাটিয়ে কেঁদে ওঠে। তারপব থেকেই নাকি মেয়ের মুখে কিছু রুচ্যে না। মেয়েকে চড় মেরে মেরে বাবুঘরের ভাত খাওয়াত ত বমি করে দিত। 'মা, শরীলে ত হাড় কখানিই ছিল। ভাঁড়াইত্যে লারত গঁ মা, আমার কী হল্য, রেখা রে!' সুখী বলে, 'আমার কাছকে আলি না কেন? ভাত দিথিস কেনে? হর্লিক, টন্নিক দিথ্যে হত। এট্টা আপেল কি আঙ্গুরও দিস নাই ত বাইচবেঁক উ?'

'কোথা পাব? মিঠুনটোকে খাওযাতে হব্যাক নাই?'

এসব প্রশ্ন ত নিজেকেই করা, কাজে কাজেই এর কোনো জবাবও হয় না।

তবু পারি থাকাতে সকালে চা মুড়ি বা পাউরুটি খায় মিঠুন আর অশ্‌কা। প্রসব ব্যথা ওঠার আগে পর্যন্ত পারি কাজে যেতে পারে।

কাজ না হওয়াতে ও ঘুরেফিরে এই গ্যারেজে আসে। 'বছর ঘুর্যা গেল জন খাটি আজ সোমীরদাকে বইলব কাজের কথা'—

ইদানীং ওর একটু ভয় করে। এতটি ডাগর হল ত কোনো পার্মেন্টি কাজ নাই ওর। বাউরে ঘরে জন খাটে এমন মরদ অনেক আছে। তারা হপ্তা পেলে মদ খায়, বউকে পেটায়, জুয়ো খেলে। কোথাও যায় না তারা। ভিডিও দ্যাখে। লম্বা চুল রাখে। ভ্যান চালায় কেউ। দু-চারজন রেল কারখানা আর তার বানাবার কারখানায় কাজ করে। অশ্‌কা সে চাকরিও চায় না। সে চলে যেতে চায় এইসব ছাড়িয়ে অন্য কোথাও। যেখানে মেঘের মধ্যে দিয়ে হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়ি চালাতে হয়। পায়ের নিচে মেঘ থাকে। আকাশ থাকে সেখানে।

তবু এতক্ষণ সমীরের কাছাকাছি থেকেও ও কথাটা বলতে পারল না। সমীর বলে, 'একটা কাজ কর। ওই গাছটা চিনিস?' ও হাত দিয়ে ইট দিয়ে ঘেরা একটা গাছ দেখায়। তার পাতাগুলো ঝিরিঝিরি হাওয়ায় দোলে। ইটের ঘের ছাড়িয়ে হাতদুয়েক লম্বা হয়ে উঠেছে গাছটা। অশ্‌কা গাছটা চেনে, রোডের ধারে অমন কত আছে। লাল ফুল হয়। যখন ফুল ফোটে রাস্তার দুধার আলো করে থাকে। ফুলগুলো ঝরেও যায় তাড়াতাড়ি। সেই ফুলের গর্ভদণ্ডগুলো বের করে প্যাঁচ প্যাঁচ খেলেছে ও ছুটোবেলিতে। কিন্তু ও গাছটার নাম জানে না। ও পলাশ, মাদারি, শাল মহুল অর্জুন চেনে, বনবিভাগের দৌলতে গামা ইউক্যালিপটাসও চেনে, কিন্তু চিনলেও এই গাছটার নাম জানে না। তাই সমীরের প্রশ্নের জবাবে লাজুক হেসে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ে।

'ওরে ভূত কৃষ্ণচূড়ার দেশে থাকিস আর নাম জানিস না? নে, আর চিনতে হবে না। ইটগুলো সরা, সরিয়ে পাঁচিলের ধারে রাখ। গাছটা বড় হয়ে গেছে আর বেড়ার দরকার নেই।'

অশ্‌কা একটা একটা করে ইট নাবায়। আর একটু একটু করে ক্রমে গাছটার সবটাই দেখা যায়। শেষ ইটটা রেখে ও গাছের নিচে দাঁড়ায়। সমীর না বললেও গাছের গোড়া পরিষ্কার করে। গাছটার ছড়ানো পাতাগুলো একটা সবুজ ছাতার মত ওর মাথার ওপরে থাকে।

'কিরে ওখানেই সেঁটে গেলি নাকি? আয় এদিকে।' সমীরের ডাকে ও পায়ে পায়ে এদিকে আসে। সমীর পকেট থেকে দুটো পঞ্চাশ পয়সা বের করে ওকে দেয়। ও একটু দ্বিধা করে। সমীর ধমকায়, 'মাগনা কাজ করাব নাকি? নে, চা খাস।'

অশ্‌কা হাত পেতে—উদাসীন না অভিমানী বোঝা যায় না, টাকাটা নেয়। তারপর হাঁটতে হাঁটতে সেই মহুয়াতলায় আসে যেখানে ওকে, ছোট্টটি, পাশে বসিয়ে ওর বাবা বনমালী গামছা বিছিয়ে ঘুমত।

মহুয়া গাছটা তেমনি আছে। তাকে জড়ানো অশ্বত্থ গাছটাও। দূরে তেমনিই গরু চরছে। বাগাল ছেলেরা গরুমোষ ছেড়ে দিয়ে খেলছে নয়ত বসে আছে। এখান থেকে বাবুর বাঁধ খানিকটা দেখা যায়। ওখানেই ওর বাপ বনমালী আছে। জোবাদিদি আছে। বাবু বল্যাছিল পঢ়ালিখা শিখাবেক। দিদিরাও বইলথ। অশ্‌কা কিছু শেখে নি। কিছু লয়। কিছু লয়। তাকে কেউ অশককুমার বলে না। বলে অশ্‌কা। শুধুই অশ্‌কা। তবে কি ওকে বাগালী করতে হবে উতার পারা? পলা ত এখনো বাসন মাজে, কাপ প্লেট ধোয়—বিজয় পালের দোকানে! তবে কি ভ্যান চালাবে ও? রিকশা চালাবে? নাকি ললিতার পারা কাগজ, টিন, লোহা, ঠঙ্ কুড়াবে?

কেন যে ললিতার কথা মনে হল ওর। মাথা নুইয়ে শার্টের হাতায় চোখের জল মুছতে গিয়ে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলে অশ্‌কা। অশোককুমার বাউরি।

চুয়াল্লিশ

অজয় ও অশ্‌কা

দুদিন ঘর থেকে প্রায় বেরয় নি অশ্‌কা। ঘাস কাটতে গিয়ে কদিন আগে ভাঙা কাচে ওর বুড়ো আঙুলটা কেটে যায়। ঘাসের মধ্যেই ছিল টুকরোটা। সে বাড়ির বাবু ভাল লোক—নিজে কাচের টুকরোটা তুলে লাল ওষুধ দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিলে বারণ করা সত্ত্বেও ও বাকি কাজ সম্পূর্ণ করে। এই এক স্বভাব ওর। যখন যে কাজটি করবে সেটি সম্পূর্ণ ও নিখুঁত করে করা চাই। ফাঁকি দিতে শেখে নি ও। ফলে আজকাল চেনা বাড়িতে ওর জন্য কাজটা রেখে দেওয়া হয়। কাজেই দুদিন ঘরে থাকলেও ওর পেট ভরা আছে।

সুখী গেছে ধান বইতে। এবারে দেদার ফলন। বৃষ্টি ঠিকমত হওয়াতে যেসব জমিতে বেশ কয়েক বছর রোয়া হয় না সেসবও ভরতি। কোনো খেতে ফসল উঠে গেছে। কোনো খেত সোনালি রঙের আভায় চকচক করছে। কোনোটায় গাঢ় সবুজ সবে রঙ ধরেছে। অশ্‌কা ধান কাটতে গেলে সুখী খুশি হত কিন্তু এত ডাগর ছেলেটি ওর ধান রুইতে শেখে নি ত কাইটত্যে পাইরবেক? পারির শরীর ভাল না সে তবু কাজ করতে যায়। মিঠুন যায় সঙ্গে, মার হাতে হাতে কাজ করে। অশ্‌কা বলেছে আগের বছর ওকে ইশকুলে দেবে। এখন ইশকুলে পাঁচিল হয়েছে। ইশকুলের জমির ওপর দিয়ে শ্যামাপদর বাড়ির ময়লা জল যাবার নর্দমাটা সেইজন্য পাকা করে ঢেকে দিতে হয়। বাউরি মেয়ে মরদরা পাঁচিল ঘেরা বলে অন্য মাঠে না গিয়ে ইশকুলের টিপকলের ধারে পায়খানা করে বলে আজকাল দিদিমণিরা গেটে তালা লাগিয়ে তবে বাড়ি যান। তাতে বউদের ঠেকানো গেলেও বাচ্চা আর কিছু মরদমানুষকে ঠেকানো গেল না। গেট ডিঙিয়ে বাচ্চাগুলো ভেতরে ঢোকে। সিগারেটের প্যাকেট দিয়ে তাস খেলে আর শরীরের নানান ভঙ্গিমায় ভিডিওতে দেখা হিন্দি ফিল্মের নকল করে। পাঁচিলের ওপরে উঠে কেউ কোমর দুলিয়ে গেয়ে ওঠে 'আই লাভ ইউ', নিচে কোনো বাচ্চা কোমরটাকে সামনে-পেছনে দুলিয়ে বলে 'টুকু টুকু টুকু টুকু প্যার হো গয়া।' বাকিরা হেসে ওঠে। মিঠুন মাঝে মাঝে ভিড়ে যায় এই দলে। হিন্দি গানের সঙ্গে চোখের ভঙ্গিতে সে নায়িকার কটাক্ষ হানে এই আট বছর বয়সেই—ছেলেরা ওকে পছন্দ করে। সাহস করে একদিন ও বিড়ি চায়। বড় ছেলেরা দেয় না। বলে, 'অখোওনি ঝদি বিড়ি খাস ত ডাগর হবার আগে মদ খাওয়াই দিব্য?' মিঠুন দমবার ছেলে নয়, একটা বিড়ি সে হাত সাফাই করে ফেলে। সেটা ধরিয়ে টানার সময় ধরাও পড়ে। 'শালা চোর ব্যাটে।' কেউ বলে ওঠে। মিঠুন বিড়িটা ফেলে দেয়—ধরা পড়ার লজ্জায় নয়, খারাপ লাগছিল বলে। এবারে চোখমুখ ঘুরিয়ে ও বলে ওঠে, 'সব শালাই চোর ব্যাটে। কেউ বড় চোর কেউ ছুটো চোর।'

অশ্‌কাকে এসব বলে মিঠুন। 'মামা তুই চুরি কইরবি না। চুরি করা ভাল লয়। বিড়ি খাত্যে খারাপ। বিসকুট ভাল। বিসকুট আইনবি।'

মা আসবে সন্ধ্যাবেলায়, পারিরও আজ সারাদিনের কাজ। বাবুঘরে কুটুম এসেছে তাই। অশ্‌কা ভাত খেতে বসল। কাল রাতে রান্না করা ভাত। খানিকটা সুখী খেয়ে গেছে, বাকিটা বড় জামে রেখে ছেলেকে বলে যায়, 'দুপরে খাস ঝদি জল দিয়্যা দিস। সোকালে অমোওনি খাস। কাজে যাস ঝদি উনান ধরাস না। আমি রেতের বেলিতে রাঁইধব।'

ভাত আর রুই মাছের টকঝাল মাখো মাখো তরকারি। বাটি চেটে চেটে শেষকণাটুকুও খেয়ে ফেলে অশ্‌কা। বাটি মেজে, মেঝেয় গোবর ন্যাতা বুলিয়ে দেয়। শিকল তুলে দেয় ঘরের।

আজ অশ্‌কার বড় উদাস লাগে। প্যান্টের ওপরে গামছাটা বাঁধে। গেঞ্জিটা নামিয়ে দেয়। এখন ও তৈরি নিজের পশরা নিয়ে। ওর মূলধন বলতে ত শ্রম—ওর ষোল বছরের শরীরের শক্তি বা কাজ করার ক্ষমতা, এই মূলধন তার নিজস্ব, এখনো পর্যন্ত সে এটাকে নিজের খুশিমত ব্যবহার করতে পারে—কারো কাছে বিকিয়ে না দিয়ে। তবু আজ আর ওর দাঁড়াতে ইচ্ছে করল না। সামডি রোড ধরে, অন্যমনস্ক, ও হাঁটে।

'আরে? এ্যাই অশ্‌কা, ব্যাটা ভূত কী করছিস এখানে?'

একটা লরি আচমকা ব্রেক কষে। ও দ্যাখে 'বাবাই'। জানলা দিয়ে মুখ বের করে সমীর বলে, যাবি নাকি বালি উঠাতে?'

লরিতে কয়েকজন মজুর, কামিন। ড্রাইভারের কেবিনের গায়ে সার দেয়া বেলচা, কোদাল দাঁড় করানো। কয়েকজন সেখানে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে।

সমীরের পাশে বসে অশ্‌কা জিগ্যেস করে, 'ইদিকে?' চাবি ঘোরালে 'বাবাই' গরগর শব্দে জানিয়ে দেয় সে চলতে চায়। গিয়ার দিয়ে, সামনে চোখ রেখে সমীর বলে, 'আর বলিস না, অনেকদিনই ভাবি ওদিকে যাব ত চিনুটা দিল বেগড়বাই করে। কলকাতা থেকে ফিরে বাবু বাপের সুপুত্তুর হয়েছে। মেকানিক ফ্রেন্ডকে আর পাত্তা দিচ্ছে না। চল তোকে একটা নতুন জায়গায় নিয়ে যাব। একা একা কি মজাক হয়? আজ তোকে অজয় দেখাব।'

অশ্‌কা চুপ করে থাকে। শুধু মুখটা আনন্দে ভরে যায়।

আগে এ রাস্তা দিয়ে মুক্তাইচণ্ডী পর্যন্ত এসেছে অশ্‌কা এখন লরিটা সেদিকে না গিয়ে বাঁ দিকের রাস্তাটা ধরলে ওর মজা লাগে। কিছুটা যাবার পর ইউক্যালিপটাসের দীর্ঘ সারি। স্বাভাবিক অরণ্য নয়, বনবিভাগের লাগানো গাছ, কিন্তু কেমন যেন প্রকৃতিজ হয়ে গেছে গাছগুলো। ফলে অরণ্যের স্বভাব পায়। রূপনারায়ণপুরে, ব্রিজের ঢালে যে গাছ লাগানো হয়েছে তা প্রকৃতিতে এমন একাত্ম হয় নি। সেগুলো যত সুন্দরই হোক আর যত ক্ষণিক বিভ্রমই আনুক তাতে যে কৃত্রিমতা আছে সেটা বোঝা যায়। এখানে, এই ঘনিয়ে ওঠা নির্জনতায় এই অরণ্য যেন প্রকৃতির চিররহস্যময়তা পায়। মনে হয় বনের এদিক দিয়ে ঢুকলে ওদিক দিয়ে বেরনো যাবে না, অথচ অরণ্য তত দুর্ভেদ্য নয়। তত গহন নয়। তবু

সেই গহনতায় গা ছমছম করে। এই সকালবেলার রোদেও করে। গাছগুলোর তলায় দীর্ঘ, তীর্যক ছায়া। নানা জ্যামিতিক নকশার আলো যেন সেই রহস্যময়তারই অংশ।

'এখানে খুব ছিনতাই হয়, বুঝলি? খুব খতরনক প্লেস এটা।' সমীর বলে।

অশ্‌কা চোখ বড় বড় করে বলে, 'কেনে?'

'কেনে?' সমীর অকারণেই হা হা করে হেসে নেয় তারপর গলা নামিয়ে বলে, 'এটা পেরলেই ডাকাতের গাঁ। ফাবড়া ছুঁড়ে সাইকেল ফেলে দেয়। শালা পরিবেশ বাঁচাতে গাছ লাগাল ত মানুষের পাপ বাড়ল। এ কি ভদ্দরলোকের জায়গা?'

অশ্‌কা ভাল করে জানে সে বাউরি তাই চুপ করে থাকে। গাড়ি চালাতে চালাতে সমীর বলে, 'বুঝলি এখানে থাকব না। মুশকিল কি জানিস টাকা চাই—বহুত টাকা। আমি শালা ভদ্রলোকের ছেলে, মদ খাই না, জুয়া খেলি না, কোনো জালি কারবারে পাবি না আমাকে—আমার পয়সা হবে কোত্থেকে? একটা ট্যাক্সি কিনলে হত। সেন্টুটা জোর কামাচ্ছে—শালাকে দেখলে বুঝা যায় না—ছুপা রুস্তম।'

'সেন্টুদার টেসকি আচে?'

'আছেই ত। তাও নিজে চালায় না, ড্রাইভার আছে। আমার মত লরিআলা নয়।'

'একটা জঙ্গলের কাছে লরিটা থামায় সমীর। 'এটা হল সরিষাতলি ফরেস্ট। আয় একটু চা খাই। সকালে নাস্তা করা হয় নি।'

এ বনে অনেক গাছ। অনেক রকমের। শাল, পলাশ, কেঁদ, অর্জুন, মহুল, গামা, হরীতকী। অশ্‌কা হরীতকী কুড়িয়ে আনে। বলে, 'ইটো কী ফল ব্যটে?'

'হরীতকী। বুড়োবা খায়। তুই কী করবি? নে মুড়ি নে।' শালপাতার ঠোঙায় মুড়িতে জল ছিটিয়ে চপ ভেঙে খায় ওরা। মজুর কামিনরাও খায়। স্থানীয় কিছু লোকও খায়। ট্রি দোকান থেকে দু গ্লাশ চা নেয় সমীর। খুব গরম, খুব মিষ্টি, আদা দেয়া গুঁড়ো চা বেশি করে দুধ দিয়ে খেতে খুব ভাল লাগে অশ্‌কার। একটা ছোট কোআর্টার। তালাবন্ধ। টলটলে জলের কুয়ো।

'বেশ ফাইন জায়গাটা, নারে?' গাড়িতে উঠে সমীর বলে, 'চিনুটা এলে বেশ হত। বুঝলি নকশাল ত, হেভি পড়াশুনো আছে ওর। যা কবিতা বলে—শালা মানে বুঝি না তবু ভাল লাগে। এখানে এলে ঠিক গান গাইত—'আকাশভরা সূর্যতারা'—রবীন্দ্রসংগীত। একটু আনমনা হয়ে যায় ও। রেকর্ডারটা চালু করে। ক্যাসেটের গানের সঙ্গে ও-ও গায়—'ইয়ে জিন্দেগী হ্যায় এক সফর সুহানা/ য়ঁহা কল কেয়া হোগা কিসনে জানা।'

রসুনপুরের ঘাটে অজয় অনেক সরে গেছে। এখন হাঁটু অবদি জল। লুঙি, কাপড় বা প্যান্ট গুটিয়ে মানুষজন পারাপার করে। নদীর তীর বলতে বিস্তীর্ণ বালুকাভূমি। ধু-ধু। যেন বালির চাদর বিছানো এক অনন্ত শয্যা। নদীতীর শ্মশানভূমিও—তাই এখানে-ওখানে ছড়িয়ে থাকে মানুষের শরীরের কিছু অবশেষ। মানুষের প্রয়োজনীয়

জিনিশেরও কিছু অবশেষ।

মজুর কামিনরা বালি তোলে। বেলচা, কোদাল দিয়ে আংটাবিহীন লোহার কড়াইতে তোলে প্রথমে। কামিনরা গামছা পাকানো বিড়ের ওপরে চাপিয়ে নিয়ে যায় সেগুলো। লরির পেছনের রেলিং খুলে দেয়া হয়। দুজন ওপরে থাকে। কামিনের মাথা থেকে কড়াই নিয়ে লরিতে উপুড় করে দেয়।

অশ্‌কা বলে, 'লদীতে নামি সোমীরদা?'

'যা, তবে ওপারে যাস না একা।'

অশ্‌কা নদীর দিকে মুখ করে হাঁটে। রূপনারায়ণপুরে কোনো নদী নেই। অশ্‌কা মাইথনে নদী দেখেছে—বরাকর নদী। সে নদীকে ত মানুষ প্রয়োজনে বেঁধেছে। তার নিজের প্রয়োজনে। ড্যামের ওপর থেকে সে নদী দেখেছে অশ্‌কা। বর্ষায় যখন উপচে পড়া জলাধার থেকে জল ছাড়া হয় তখন তার প্রবল ধ্বনি আর ফেনোচ্ছ্বাসে ও বিস্মিত হয়েছে আর আজ এই শীর্ণনদী আর তার পটভূমি দেখে ওকে মুগ্ধতায় পায়। সেই বিহ্বলতায় ও বলে ওঠে, 'কী সোন্দর! তুমি ডাইনে ভালো—বালি, শুধুই বালি। তুমি বাঁয়ে ভালো—বালি ধু-ধু বালি! লদী দ্যাখায় কত ধুর! আর বালিতে মানুষের হস্তি!'

ও নিচু হয়ে আঁজলা ভরে বালি তোলে। শরীরটা অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরিয়ে নদীর দিকে পিঠ ঘোরায়, ছায়াটা ততটা লম্বা পড়ে না সূর্য মধ্য আকাশের দিকে আরো খানিকটা উঠে যাবার কারণে। ও দুহাতের দশ আঙুল আলগা করে—ঝুরঝুর বালি পড়ে। আঙুলের ফাঁকে শিরশির করে। ও আর এক আঁজলা বালি তুলে নদীর দিকে পিছন ফিরে নদীর দিকে ছোটে। ও গতি বাড়ায়, না আপনিই গতি বাড়ে বোঝার আগে ওর চলন এক নাচের ছন্দ পায়—এ ছন্দ শিক্ষার অপেক্ষা রাখে না—এক আদিম আনন্দের ফূর্তিতায় ওর শরীর বেয়ে, এই ছন্দ আসে। সেই ছন্দেই কখনো বালি ছড়াতে ছড়াতে, বালি ফুরলে নিচু হয়ে সেই ছন্দ অপরিবর্তিত রেখে আবার এক আঁজলা বালি তুলে নিয়ে, কখনো আকাশের দিকে মুখ তুলে দুচোখ আধবোজা, কেননা রৌদ্র এখন খর, ও ছোটে। ছুটতে ছুটতে চটির স্ট্র্যাপ ছেঁড়ে। ও 'ধুর্!' বলে এক পাটি, এক পাটি করে দুটোই ছুঁড়ে দেয়—শূন্যে উঠে আবার বালিতেই পড়ে চটিজোড়া, ছেঁড়া মাদুর, ফাটা বালিশ আর শিশুর করোটির পাশে আলগা, ময়লা, সবুজ স্ট্র্যাপের সোল খয়ে যাওয়া চটি দুপাটি, বেশ মানানসই, পড়ে থাকে। নদীর জলে পা পড়লে শব্দ হয় ছলাৎ—ওর শরীর শিরশির করে ওঠে জলকণা ছিটকে পায়ে, হাতে পড়লে। ও ঘুরে দাঁড়ায়—দূরে, ওপারে মানুষগুলোকে পুতুলের মত লাগে। আবার এদিকে ঘোরে—লরি আর মজুর কামিনদের কত ছোট ছোট লাগে। নদী, বিস্তীর্ণ বালির চড়া, আকাশের বিস্তার ওকে বিহ্বল করে। নিজেকে ওর মনে হয় বড়, অনেক বড়। ও দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে পাখির ডানার মত ঝটপটায় যেন উড়ে যাবে। দুই হাত যেন দুদিকে প্রসারিত হয়ে দিগন্ত ছুঁতে চায়। ও গেঞ্জি প্যান্ট খুলে শর্টস পরে হাঁটু জলে নেমে যায়। সেটাও খুলে গামছা এঁটে পরে। শরীর হালকা লাগে। জলে লাফায় খুশির জলকণা ছিটিয়ে। পদতল থেকে চুলের গোড়া

পর্যন্ত এক অজানা পুলক শিহর উঠে আসে। মাথা মুখ ভিজিয়ে ও টানটান দাঁড়ায় আকাশে মাথা তুলে যেন মেঘে ঠেকে যায় তা। যেন জলে নয়, আনন্দে অবগাহন হয় ওর—সেই অবগাহনে ওর বিষাদ ঝরে, বাঁধন খসে। জামাকাপড় পুঁটলি করে ও দৌড়তে দৌড়তে লরির কাছে চলে আসে।

ফেরার পথে সমীর বলে, 'এতদিনেও কাজ পেলি না কিছু? সেই জনমজুরি!'

'তাও রোজ পাচ্ছি কোথা?' আঙুল দিয়ে চুল আঁচড়ে নেয় অশ্‌কা আর ভাবে আর সবার মত পাকিটে এট্টা চিরুনি রাখবে এবার থেকে।

'কোন ঠিকাদারের কাছে ভিড়তে পারলি না? তাহলেই ত পার্মেন্টি লেবার হতিস। কাজের গ্যারান্টি থাকত।'

'ই কাজ আমার ভাল লাগে না।' এতক্ষণে, এতদিনে কথাটার আধখানা বলতে পারে অশোক। সমীর একটু ভাবে—'আমি এখানে থাকলে তোকে গ্যারেজে নিয়ে নিতাম। এখনো নিতে পারি। দুশ টাকা পাবি মাসে। কাজটাজ শিখলে তিন-চারশ হতে পারে। করবি? আমি অবশ্য বেশিদিন থাকব না।'

'কোথা যাবে? ঘর?'

'হ্যাঁ, নিজের ঘরই ভাল। এখানে আমার ভাল্লাগে না। ভদ্দরলোক থাকে না এখানে। তা করবি তুই? কাদেরশাহেবকে বলব?'

অশ্‌কা ঘাড় গোঁজ করে থাকে। অস্ফুটে বলে, 'সি ত গাড়ি ধুয়া, রঙ দিয়্যা ইসকল।'

'তা কী করবি তুই শুনি? কিসস্যু জানিস না গাড়ির।'

'শিখে লিব। তুমি আমাকে ডাইবারি শিখাই দাও—ঠিকেই পাইরব।'

সমীর জোরে হেসে ওঠে। অশ্‌কার পিঠে বাঁ হাতে একটা চাপড় মারে—'ওরে ব্যাটা ভূত—ড্রাইভার হবার শখ! সে ত এখুনি পারবি না। দাঁড়া। শোন, বিড্ডু ওর ট্রাকের জন্য খালাসি খুঁজছে। আমাকে বলেছে। এই তোর মত বয়সের ছেলে। ও আর মোহন যাচ্ছে দিল্লি হয়ে লুধিআনা। দিল্লিতে কিছু মাল খালাশ করবে আর লুধিআনা থেকে আনবে। ধর মাসখানেকের ব্যাপার। যা, ঘুরে আয়। ভাল না লাগলে কেটে পড়ার রাস্তা ত সব সময়েই আছে। দুনিয়াটা এইটুকু নয়রে অশ্‌কা, অনেক বড়। একবার বেরিয়ে পড়লে একজনের ভাত ভগবান ঠিকই জুটিয়ে দেবেন। কী রে যাবি?'

অশ্‌কা ওর মায়াময় চোখ দুটি সমীরের জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মেলায়। তারপর চোখ নামিয়ে ঘাড় কাত করে, 'ঝাব সোমীরদা।'

পঁয়তাল্লিশ

প্রস্তুতি

পারি ববিতার পিঠে হাত বুলিয়ে বলে, 'কেনে ঝাস? উয়ারা সরাক ব্যটে, আমরা বাউরি, মিলন হবার লয়। মিছাই মার খালি্য!' ববিতা দুহাঁটুর ওপর থুতনি রেখে চুপ করে

শোনে। তিন-চারদিন হল ও মায়ের কাছে আসে। এমনি আসে নি, অশকা গিয়েছিল ববিদির ঘরে তাতেই ও পারির শরীর খারাপ আর অশ্‌কার আসন্ন যাত্রার কথা জানে। তার দুই ননদ অনুমতি দেয়। শ্বশুর হ্যাঁ বলে তবেই সে আসে। গতকাল সন্ধ্যাবেলা সে মাজিবাবুদের বাড়ির এক ছেলের স্কুটারের পেছনে চেপে রঞ্জনে সিনেমা দেখতে যায় পাড়ার কেউ কেউ দেখে ফেলে। বাড়ির সামনে থেকে না উঠে সে ডাবরমোড় পেবিয়ে তবে স্কুটারে ওঠে। ফিরে এলে মাজিদের ছেলের গায়ে কেউ হাত দিতে সাহস পায় না, সুখীর ঘরের সামনে জড় হয়। ববিতাকে মারে প্রধানত সুখী। ভাদুমণি শুধু একটি চড় কষায় 'লষ্ট মাগী' বলে। সুখী অশ্‌কাকে বলে, 'সোকালেই জামাইকে খবর কর্‌বি লিযে ঝাক উয়াকে।' অশ্‌কা যায় নি। সে বলে, 'কাল ভুবে যাত্যে হবেক, আজ দেদার কাজ মা। টাইম নাই।' পারি অনেকক্ষণ বকে গেলে ববিতা বলে, 'ইসকল কতা আমি জানি দিদি। কী কর্‌য়্যাচি? উ বইল্লেক ভাল বই এইসচ্যে ঝাবি? ত গেলুম। দুটো চপ খালুম, চা খালুম, ঘরকে আলুম। গায়ে হাত দ্যায় নাই, ইয়াতে কী দষ?'

'না, কুনো দষ নাই? জামাই লিবেক তকে? ঘরে?' সুখী বলে আর হাঁফায়।

'না লিবে ত না লিবে। গতর আচে, খাট্যে খাব। কী আমার শ্বশুর ঘররে খাটালিতে জান যায়! ধান সিঁজাইচ্যি কুনদিন? গুয়াল কেড়্যাচি এগুতে? মর্‌য়্যা যাব মুকে রক্ত উঠ্যা। ঝাব না, আমিই ঝাব না।'

মাথাটা ভার তবু সুখী কাজে যায়। ধান পাছ্‌ড়াতে হবে। চাষাঘরে আগাম টাকা নিয়ে রেখেছে সেগুলো এভাবেই শোধ হবে। আমি না পাছড়ালে উয়াদের কি কামিনের অভাব? কিন্তুক তালে আমার ধার শধ হব্যাক নাই। আর বাউনঘরে ত বেগার খাটার শামিল। উঠন ঝাঁট ও বাসন মাজা বাবদ কত বছর ধরে সেই কুড়ি টাকাতেই থিতু হয়ে রয়েছে। সে টাকার বদলে কয়েক মাস হল একটা কাগজ পায়। সে বাড়ির হায়ার সেকেন্ডারিতে ইংরেজি, ইতিহাসে ব্যাক পাওয়া মেয়ে সোনালি সেই কুড়িটাকা ওর নামে পিয়ারলেসে জমা করে। 'এ-কটা টাকা খরচ করতে কিছু না, এখানে জমাও, পাঁচ বছর বাদে দু-হাজার টাকা পাবে।' সুখীর মনে হল টাকাটা কম বলেও বাড়াবার কথা বলল না সোনালি। ও ছোট্ট কাগজটা একটা আমূল স্প্রের কৌটোর ভেতরে গুছিয়ে রাখে। এসব না দেখালে নাকি টাকা পাওয়া যাবে না। পাঁচ বছর বাদে দু-হাজার টাকা। দু-হাজার টাকায় কতটি টাকা হয় সোনালি বলেছে। 'এই একটা একশ টাকার নোট, দেখেছ বউ?' 'হুঁ।' একশ টাকার নোট সুখী দেখেছে বৈকি। খরচও করেছে দু-চারবার। তবে সে ত ফি মাসে লয়। ফি বছরেও লয়। তা সেই একশ টাকার কুড়িখানা লোট মিলালে দু-হাজার টাকা। সেই টাকায় সুখী ঘরের চালাটায় নতুন টালি বসাবে। লাইলনের ফোল্ডিং খাট কিনবে। একটা মশারি কিনবে। বডডো মশা। পঞ্চায়েত পাকা নর্দমা করে দিয়েছে—রোডের বাবুরাও করে দিয়েছে মস্ত গভীর ডেরেন, রোডের ধারে মশার বাচ্চারা সেখান থেকে উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে। নালাগুলো তৈরি করার পর অমনিই আছে। সাফ হয় না।

কিন্তু এতসব কিনতে গেলে সুখীকে পাঁচ পাঁচটা বছর অপেক্ষা করতে হবে। এখন পাঁচ মাসও হয় নি। সবে তিনটে কাগজ জমেছে। সোনালি প্রতিমাসে হিশেব করে দেয়। সেই হিশেবে আরো একুশটা কাগজ জমলে তবেই পাঁচ হাজার টাকা!

কিন্তু এখন সুখী কী করবে? ছেলেটার এতদিনেও ঠিকমত কাজকামে মন নাই। আবার বাউরিঘরের ছিল্যাদেব পারা লয় যে সুখী বকাঝকা করবে। সিনমা, যাত্রা, ইসকল দেইখতে খুঁজে না। বাপের পারাও যে লয় সেটাও সুখী বোঝে। কাজকাম করলে দু-পাঁচ টাকা রেখে বাকিটা মাকেই দ্যায়। এখন বলছে খালাশি হয়্যা দিল্লি যাবে আরো কোথায় কোথায় কতদূরে না জানি যাবে। এদিকে পাবির আজকালের মধ্যেই প্রসব হবে, 'দু-চার দশ মাস পরে গেলে হয না নুনা?' ছেলেকে শুধয় ও। অশ্‌কা উত্তর দেবার আগেই ববিতা বলে ওঠে, 'ব্যাটাছেলে, ডাগর হইচ্যে কি ঘরকে থাইকতে? ইখানকে থাইকল্যো হয় বাগালী, লয় দকানে, লয় হাজরিতে কাজ। ছুটি নাই, বুনাস নাই, কুআর্টার নাই, ইগুলান কি চাকরি ব্যটে? নিজের জমিন নাই, পরের খেতে ধান রুয়া আর কাটাই সার। ধান ঠোঙানোই সার। কতটি ধান পাস তুই বচ্ছরে? পাঁচ কেজি চাল হয় তর ওই দশ কেজি ধানে। কদিন খাস? আর ইটতে পাঁচটা দেশ দেইখবেক—কুথাও ভাল চাকরি পাল্যে কইরবেক।'

সুখী এমনভাবে কথাগুলো শোনে যেন সে বাইরের কেউ। এ সংসারের কেউ নয়। অশ্‌কাকে যেন সে গর্ভে ধারণ করে নি। কিংবা গর্ভে ধারণই করেছে তাকে চেনে নি। সে এতসব জানে না, ভাবেও না। কবে তার বিয়ে হয়েছিল তারপর যে কবছর ওর মা বেঁচেছিল মায়ের কাছে যাওয়া আসা ছিল। মা মারা গেলে তার ত একবেলার জন্যও কোথাও যাবার জায়গা রইল না। মাসির ঘর, মামাঘর আছে ত বনমালী মরাব পর সে যায় নি। তারা আগে আসত—এখন আসে না বললেই হয়। সে গেলে, তারাও আসত। বিয়াশাদির নেমন্তন্নেও সে যায় নি। এই ছেলেমেয়ে ছাড়া তার আর কে আছে? মেয়ের কথা শুনে সে ছেলের জন্য এটাসেটা গুছতে বসে।

কী এমন আছে অশ্‌কার যে সুখী গুছবে? পারি একটা সাইড ব্যাগ এনেছিল—সেলাই খোলা—মোড়ের মাথায় বসা মুচিদের কাছে সেটা সেলাই করিয়ে আনে অশ্‌কা। বাবুঘর থেকে পারি একটা শার্ট আর দুটো নাইলনের গেঞ্জি এনে দ্যায়, একটা ফুলপ্যান্ট আর রঙজ্বলা পাজামাও একটা। অশ্‌কা নিজে কেবল একজোড়া হাওয়াই চপ্পল কিনেছে হাট থেকে—বেশ শক্তপোক্ত, তাও পনের টাকার নিচে নামল না। ববিতা ওর চাদরটা দিয়ে দেয় আর পাঁচটি টাকা। দিল্লিতে নাকি শীত খুব—মোহন বলেছে। পোঁটলা খুলে সুখী মৃত স্বামীর একটা মাফলার বের করে দ্যায়। সমীর একটা পুরনো পুলওভার দিয়েছে—ভুটিয়াদের কাছ থেকে কেনা। মিঠুন বলে, 'কোথা যাছিস? দিল্লি? বম্বে? কইলকাতা? আমি হেলিকপ্টারে যাব—বোঁ ও ও ও!' ও একপাক ঘুরে নেয়। থেমে আবার বলে, 'সিখানে গেদ্যে টিভি আছে? বিসকুট আইনবি আমার জন্য। লজেন আনবি। খেলাসিন আনবি।'

সুখী আস্তে বলে, 'পারির শরীলটো ঠিক নাই। অ নুনা, তর দিদির ডেলিবারি হলো যাথিস।' ববিতা বলে, 'উ কী কইরবেক? আমি ত রইচ্যি!' 'উয়াদের অত টাইম নাই। উয়াদের সব জাগা জাগায় টাইম ফিস্ করা আচে, যেদিন বইলবে ওই দিনই যাত্যে হব্যাক, নইলে লস।' অশ্‌কার ভেতরটা ভাতের মত ফোটে। লরম হয়। সিজে। উথলায়। উত্তেজনায় সারারাত ওর ঘুম হয় না। একটু ঘুমায় আর খুটখাট শব্দে উঠে বাইরে গিয়ে দেখে আসে ভোর হল কিনা। সাড়ে চারটের সময় গাড়ি রওনা দেবে মোহন বলেছে। তার আগেই ওকে উঠতে হবে। পারিদি বলেছে ডেকে দেবে। এটা পারি পারে—দিনমানেও পারে, রাতেও পারে। ঠিক বলে দেবে কটা বেজেছে। তা পারিদি না ডাকা পর্যন্ত অশ্‌কা ছটফট করে।

ছেচল্লিশ

যাত্রা

শেষ রাতে ট্রাক ছাড়ে। সমীর হাসিমুখে পিঠ থাবড়ে দেয় অশ্‌কার। বলে, 'গাড়ি মাল লোড হলেই ব্যাক করবে। কীরে ভূত মন খারাপ হচ্ছে?' অশ্‌কা লাজুক হেসে মাথা নাড়ে। তার মন খারাপ হয় নি ঠিকই কিন্তু বুকের ভিতর ধড়ফড়াইচ্যে কেনে ও বুঝতে পারছে না। গলা শুকিয়ে আসছে, এখনো তেমন ঠাণ্ডা না পড়লেও ভোরে ত গায়ে মোটা চাদর টানতে হয়, নইলে পাতলা কাঁথা। এই মিহি ঠাণ্ডায় এমন জলতেষ্টা পায় কেন ওর? আবার কতক্ষণে যাবে এই অস্থিরতাও আছে।

সমীর বিড্ডুকে বলে, 'এ ফাস্টাইম যাচ্ছে খেয়াল রেখো।' বিড্ডু বলে, 'ঠিক হ্যায়, ফীকর মৎ করো ইয়ার।' বিড্ডু, মোহন দুজনেই একটা হাফ সোয়েটারের ওপরে মাথা ঢেকে মাফলার জড়িয়েছে। ওরা ট্রাকে ওঠার পর সমীর চেঁচিয়ে বলে, 'আমিও আজ যাব। একটু পরেই বেরব। অশ্‌কা ঠিকমত থাকিস।'

এইসব ট্রাকে ড্রাইভারের কেবিনটা বেশ বড়। সামনে সিট ছাড়া পেছনে একটা লম্বা সিট আছে। বিড্ডু বলে, 'তু নিদ গেলে পিছা বৈঠ।' 'আমার নিদ লাগ্যে নাই,' বললে বিড্ডু পেছনে শুয়ে পড়ে, শরীরের আধখানা বোধহয় বাইরেই থাকে ওব।

ব্রিজ পর্যন্ত ট্রাকটা আস্তেই চলে। তার আগে গ্রামের মুখটাতে এলে অশ্‌কা গলা বাড়িয়ে দেয় জানলা দিয়ে। আন্দাজে ও ববিতাকে বলে রেখেছিল রাস্তা পেরিয়ে ওদিকটায় দাঁড়াতে। তা দেখে ববিতার পাশে পারি আর সুখীও দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদের আলোয়, মেঘশূন্য আকাশের নিচে ওদের স্পষ্ট অবয়ব দেখা যায়। কালকে ব্যাগে ঠিকমত সব নেওয়া হয়েছে কিনা দেখার জন্য খুলেও দেখে একটা কৌটোয় চাল আর ছোলা ভাজা। 'চাল কলাই দিছিস কেন? বিড্ডুদা চা পাঁরুটি খাওয়াবেক দকানে।' 'ইঃ', পারি ধমকায়, 'বিড্ডুদা খাওয়াবেক! যা খাওয়াবেক বেতন থিক্যা কাট্যে লিবে ঠিকেই। ঠঙটো ভর—ব্যাগে ভর উটো!'

ট্রাকের জানলা দিয়ে অশ্‌কার বাড়ানো হাতটি যতক্ষণ দেখা যায় তিনজনে দেখে। শেষরাতের চাঁদের আলোয় সব কেমন অন্যরকম মনে হয়—এই রাস্তা, এই যেমন তেমন করে বানানো ঘর, অশ্‌কাকে নিয়ে চলা ভারী দূরপাল্লার ট্রাক আর তিন রমণীর গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়ানো ছায়া ছায়া মূর্তি যেন মহাকালের বুকে এক ছবি। কিংবা অনেক ছবি জুড়ে জুড়ে যে সব ঘটনা ঘটে এসেছে, ঘটছে বা ঘটে থাকে তারই এক অংশ। এইসব নানা ছবি জুড়ে জুড়েই ত সমগ্র। এমন একটি ছবি ত অনন্তের দিকে প্রসারিত জীবনের ভগ্নাংশমাত্র। কিন্তু ভগ্নাংশ হয়েও তা যেন স্বয়ংসম্পূর্ণতা পেয়ে যায় তার ব্যঞ্জনায় ও রহস্যময়তায়। জীবনের খণ্ডিত অংশ হয়েও তা সমগ্রতার প্রতিফলন হয়ে ওঠে। তেমনি এই ক্ষণিক দৃশ্যটির উদ্‌ভাস।

চাঁদ দেখতে পাচ্ছে না অশ্‌কা কিন্তু জ্যোৎস্নায় থইথই আকাশ আর মাঠ, ঘরবাড়ি দেখতে পায়। ব্রিজের ওপর থেকে ও গলা বাড়িয়ে শেষবারের মত দেখে নেয় দূরের ঘরবাড়ি, ধানখেত, রেললাইন, বন্ধ হওয়া ঠক্করের কেমিক্যালসের কালো চিমনি আর দীর্ঘ দীর্ঘ ইউক্যালিপট্যাস, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, শাল, মহুয়ার গাছ—বাতাসে ভেসে আসা রূপনারায়ণপুরের গন্ধের অবশেষটুকু।

ভাল করে সকাল ফুটে ওঠার আগে একে একে চেনা জায়গাগুলো পেরিয়ে যায়—আল্লাডির সিধুকানু মোড়, দেন্দুয়া, কালীতলা-সালানপুর, নিমতলা, চলবলপুর। ওর চোখ থেকে চেনা দৃশ্যগুলো সরে সরে যায় আর সেই দৃশ্যের সবটুকু ও শুষে নিতে চায় বলে ওর পলক ফেলতেও অনীহা—চোখ জ্বালা করে।

নিউ রোডের মোড় পর্যন্ত কেউ কথা বলে না। মোড়ে ট্রাকটা থামায় মোহন আর বিড্ডু উঠে পড়ে। একটা বাস ওদের ট্রাকটার পাশ দিয়ে হুশ্‌ করে বেরিয়ে যায়। দরজা খুলে বিড্ডু আগে নামে। অশ্‌কা লাফিয়ে নামে ওর পরে। ও পরে আছে গেঞ্জি আর কালো ফুলপ্যান্ট। ওদের দেখাদেখি মাফলার মাথায় জড়ায়। মোহন ওদিকের দরজা খুলে নামে। এখানে খড়ের চালার নিচে সারি সারি চারপাই পাতা। ধোঁয়া বেরচ্ছে এমন একটা উনুনের তলায় একটা বাচ্চা ছেলে হাওয়া দেয়। অশ্‌কার মনে পড়ে 'হারামীর বাচ্চা।' অনেকগুলো ট্রাক লরি চাঁদের আলো মেখে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের ড্রাইভার খালাশিরা খাটিয়াতে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুময়। কয়েক জন, অশ্‌কাদেরই মত এখুনি রওনা হবে বলে চায়ের অপেক্ষায় বসে আছে। দাউ দাউ কাঁচা কয়লার ওপরেই মস্ত সসপ্যানে দুধ চিনি মেশানো জল চাপায় ছেলেটা। একটা ঢ্যাঙামত লোক অশ্‌কাকে চোখের ঈশারায় দেখিয়ে বিড্ডুকে বলে, 'নয়া আদমী?'

'লেডকা' নয় 'আদমী' শুনে অশ্‌কার ভয় ভয় অস্বস্তিটা কেটে যায়। কবজিতে একটা ঘড়ি থাকলে ও টাইম দেখত। চাঁদের আলোয় আকাশে তারা দেখা যায় না। ও চায়ের গ্লাশ হাতে উঠে রাস্তার ধারে আসে। আকাশে গাড়ির আলো নেই।

জিটি রোডে উঠে মোহন স্টিয়ারিং ঘোরায়। গিয়ার মারে। অশ্‌কা তখনো জানলা দিয়ে তাকিয়েছিল। বিড্ডু উঠে জানলাটা বন্ধ করে বলে, 'বহুত হাওয়া চলেগী ইসকে

বাদ। পিছে বৈঠ।' স্পীডো মিটারের চক্‌চকে কাঁটা একের পর এক ঘর পেরয়। স্থির হয়। চোখ বুজেই অশ্‌কা টের পায়, দেখতে না পেলেও বুঝতে পারে দুধারের ঘরবাড়ি, গাছগাছালি, মাঠ-প্রান্তর দ্রুত সরে যাচ্ছে। এ রাস্তায় আরো গাড়ি যাওয়া-আসা করছে সেটা বোঝা যায় উইন্ড স্ক্রীনের ওপর হঠাৎ হঠাৎ আলো এসে পড়লে বা পেছনে হর্ন শুনলে। গাড়িগুলো সচরাচর এক সারিতে পেছন পেছন যায়, এখন ভোর হবার ঠিক আগে এই সময়টায় তত গাড়ি না থাকায় কখনো কখনো পেছনের গাড়ি এগিয়ে যেতে চায়। এক একটা গাড়িকে হাত দিয়ে ইশারা করে মোহন পাশ দেয়। পেছনের লম্বা সিটে হেলান দিয়ে অশ্‌কার ঘুম আসে। এখন শুধু চলা—সে চলায় আনন্দ না বেদনা এ প্রশ্ন ওর মনে জাগে না। ও আবার ফিরবে কিনা বা ফিরলে এই 'অশ্‌কা'ই থাকবে, নাকি হয়ে উঠবে অশোক, অশোককুমার বাউরি—এও জানে না। বাবা বনমালীর 'কিষ্টোবেটা' থেকে বিজয় পালের 'হারামীর বাচ্চা', শিবু দাসের 'নেমকহারাম'—আবার তা থেকে শুধু 'অশ্‌কা' হয়ে উঠতে তার শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের অনেকখানিই কেটে গেল। এরপর 'অশোককুমার বাউরি' পর্যন্ত সত্যি সত্যি ও পৌঁছবে কিনা অশ্‌কা জানে না। স্রেফ 'অশ্‌কা' হতে ও চায় না এটাই ও জানে। ও হতে চায় অশোককুমার বাউরি—ড্রাইভার—অন্ধকারের মধ্য দিয়ে, হিম হিম মেঘকে নিচে ফেলে, আরো, আরো উঁচু মেঘের ভিতর দিয়ে হেডলাইট জ্বালিয়ে যার গাড়ি পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে সেই স্বপ্নের দেশে যাবে যেখানে নিজের এই হয়ে ওঠার সুখ আছে। সে দেশ কোথায় ও জানে না, সেখানে পৌঁছবে কিনা সেটাও জানে না, শুধু এই কিশোর—এক মানবসন্তান তার মনুষ্য পরিচয় পাবে এই খোঁজেই তার যাত্রা শুরু করে।